উপন্যাসের কথা

দেবীপদ ভট্টাচার্য

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ছয়

ঘোষণা প্রথম প্রকাশ :
২৫ বৈশাখ ১৩৬৮। মে ১৯৬১

বর্ণলিপি : খালেদ চৌ

প্রকাশক : কৃষ্ণলাল ঘোষ
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রায়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক : কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওআর্কস
৬ চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মোহন প্রেস

বাঁধাই : নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডার্স

দাম—ছয় টাকা

স্বর্গত পিতৃদেব

৺কেশবলাল ভট্টাচার্যের

স্মরণে

উপন্যাসের জন্ম

গল্পশোনার আকাঙ্ক্ষা মানবসভ্যতার আদিম কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি চলে এসেছে। গল্পবলার লোকেরও কোনো দিন অভাব ঘটে নি কোনো দেশে বা কোনো সমাজে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটি 'কথা' নামে পরিচিত। 'বৃহৎকথা' ও 'কথাসরিৎসাগর' বই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। 'কথা' শব্দটি মূলত প্রশ্নবোধক। মানবমনের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল শব্দটির মধ্যে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বক্তা গল্প বলছেন, শ্রোতা শুনতে শুনতে বললেন: কথা, অর্থাৎ কেমন করে? বা কোন্ উপায়ে? বক্তা শ্রোতার প্রশ্নের জবাব দিলেন, গল্প এগিয়ে চলল। 'And then, and then' প্রশ্ন গল্পশ্রোতার থাকবেই। আর ঐ প্রশ্নবিধৃত কৌতূহল, বিস্ময় নিয়েই কথাসাহিত্যের জন্ম।

জন্মলগ্নের সেই ইতিহাস দেশকালনিরপেক্ষ। কিন্তু নভেল বা উপন্যাস বলতে যা বুঝি, সেই শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণভাবেই একালের। একাল বলতে বোঝায় আধুনিক কাল। মধ্যযুগীয়তার গণ্ডী থেকে মানুষের মুক্তির সূচনাই আধুনিকতার জয়তিলক। খ্রীষ্টপর চতুর্দশ শতকের ইতালীয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁস সেকালের ইউরোপে মানুষের চিত্তবিকাশের, আত্মস্বাতন্ত্র্যের ও বিদ্রোহের বার্তা বহন করে এনেছিল। হিউম্যানিজম বা মানবিকতা রেনেসাঁসের মহৎ দান। ফরাসী দেশ ইতালীয়-ফরাসী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই নবজাগরণের বাণী শোনে। মধ্যযুগ থেকে নবযুগে রূপান্তরের এই বিপর্যয়যুগে র‍্যাবলে-র (Rabelais) জন্ম। এই সময়েই নিউ ওয়ার্লড বা আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন যুগ দেখা দিয়েছে।

নবজাগরণের যুগের শক্তিকে নিজের মধ্যে বহুল পরিমাণে ধরতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল Gargantua and

Pantagruel রচনা করা। র‍্যাবলে ১৪৯৪-এ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে জন্মেছেন। প্রথম জীবনে ধর্মযাজক হিসেবে জীবন শুরু করলেও চিকিৎসক, সম্পাদক, অধ্যাপক ও শেষে লেখক রূপে আমরা র‍্যাবলেকে পেয়েছি। র‍্যাবলে মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে সব্যসাচীর মতো দাঁড়িয়ে শরবর্ষণ করেছেন। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা—কোনো ব্যবস্থাই তাঁর বিদ্রূপবাণ থেকে রেহাই পায় নি। অভিজাততন্ত্র এবং যাজকতন্ত্র উভয়েই সেদিন সন্ত্রস্ত হয়েছিল তাঁর রচনার আঘাতে। প্রটেস্টাণ্ট ক্যালভিন এবং রোমান ক্যাথলিকেরা সমভাবে র‍্যাবলের নিন্দা করেছেন—'evil book like those of infamous Rabelais.'

কাল্পনিক দৈত্যদের নিয়ে গল্পের এই বই আকারে বৃহৎ। পাঁচটি খণ্ডে বিস্তৃত এই বইয়ে যে-সব রোমাঞ্চকর ও হাস্যউদ্রেকী গল্প আছে সেগুলিকে নিছক গল্প বা tale বলা ঠিক নয়। দৈত্যদের কাহিনীর মধ্যে র‍্যাবলে সমকালীন যুগকে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। রহস্য ও রোমাঞ্চ প্রচুর পরিমাণে থাকলেও এ গল্প একালের অর্থাৎ নবজাগ্রত যুগের গল্প।

একদিকে বিবিধ বিষয় অধ্যয়ন ও বিচিত্র বৃত্তি অবলম্বন তিনি করেছেন, ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়েছে এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা বেড়েছে। অন্যদিকে তিনি তাঁর ত্যুরেন অঞ্চলের চাষীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি বোধ করেছেন। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের এই সমন্বয়ই তাঁকে হিউম্যানিস্ট পর্যায়ে এনেছে। তিনি যে-মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রতিবন্ধক সকল শক্তিকেই তিনি আক্রমণ করেছেন। র‍্যাবলে তাই রিয়ালিস্ট, হিউম্যানিস্ট। পরিণত বয়সে দীর্ঘকাল তিনি বাস করেছিলেন লিওঁ (Lyons) শহরে। সে সময় ফরাসী দেশের জ্ঞানী-গুণীরা ঐ শহরে থাকতেন। শুধু বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে নয়, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের দিক থেকে লিওঁ-র তখন খুব খ্যাতি। কাজেই র‍্যাবলের যুগ বিচিত্র জীবনস্রোতের যুগ আর সেই জীবনস্রোতকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। সন্ন্যাসের

কৃচ্ছ্রসাধন বা নিবৃত্তিমার্গকে তিনি আমল দেন নি, দেহবাদকে নিন্দা করেন নি, রেনেসাঁস-অনুগামীর মতো তাঁর জীবনপিপাসা প্রকাশ করেছেন। নতুন যুগের শক্তিকে ধারণ করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি যুগপৎ চিত্তমুক্তির প্রতিবন্ধক রাষ্ট্র, ধর্ম, বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পেরেছেন। এই ব্যঙ্গধর্মিতা আধুনিক যুগের শিল্পীরই যোগ্য।

তিনি তাঁর বইয়ের গোড়ায় লিখেছেন :

My pages bring no virus or infection
Across the thresholds of your virtuous homes.
True they can teach you only scant perfection
Save laughter's joys—

*   *   *

Better to write of laughter than of tears
For laughter is the essence of mankind.
Live Happy !

মহৎশিল্পীজনোচিত তাঁর এই বক্তব্য।

১৫৩৩-এ র‍্যাবলের মৃত্যু হয়। তার অর্ধশতাব্দী পরে দেখা দিলেন সার্‌ভেন্‌টিস্ (১৫৪৭-১৬১৬)। স্পেনীয় সাহিত্যে নবযুগের হাওয়া তিনি প্রবাহিত করলেন। ১৬০৫-এ যখন 'ডন কুইকজোট'-এর প্রথম খণ্ড বার হল তখনি আধুনিক উপন্যাসের পূর্বভূমিকা আরও প্রসারিত হল বলতে পারি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইউরোপের সমাজে নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণী (class) ও নতুন শক্তি (force) দেখা দিয়েছে, ফিউদাল বা সামন্ততন্ত্রকে আক্রমণ ক'রে। ফিউদাল যুগের সঙ্গে যে রোমান্‌স্‌কাহিনী অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সার্‌ভেন্‌টিস্ তার বিরুদ্ধে শস্ত্রপাণি। মধ্যযুগীয়তার জীর্ণ কাঠামোকেই যে তিনি শুধু আক্রমণ করেছেন তা নয়, নবযুগের শক্তিকে তিনি আত্মস্থ করেছেন। মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামো এবং তারই অনুগত 'আদর্শ'গুলিকে সার্‌ভেন্‌টিস্ ব্যঙ্গের কুঠার হেনেছেন।

তাঁর জীবন বিস্ময়কর উত্থান-পতন ও বিপর্যয়ের ইতিহাস।

শাস্ত্র অধ্যয়ন, যুদ্ধে যোগদান, বন্দীদশা, পলায়ন যেমন ঘটেছে তাঁর জীবনে, তেমনি দারিদ্র্য, ক্রীতদাসত্ব ভোগও তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি ডন কুইকজোট, ডালসিনিয়া এবং সাংকো-পাঞ্জাকে নিয়ে যে সুদীর্ঘ কাহিনী রচনা করেছেন সে কাহিনী নবোত্থিত শ্রেণীর মনোভাব বহুলভাবে প্রকাশ করেছে। সার্ভেন্টিসের এই বইয়ে সমাজের সর্বস্তরের নরনারীর জীবনের খণ্ড অথচ বিশ্বস্ত রূপ ফুটে উঠেছে। অভিজাত সমাজের নোবল, নাইট, কবি, পুরোহিত, বণিক-ব্যবসায়ী, ক্ষৌরকার, দাগী আসামী, চাষী প্রভৃতির চিত্র যেমন আছে, তেমনি রয়েছে অভিজাত সমাজের মহিলা থেকে সরল গ্রামীণা পর্যন্ত কত পর্যায়ের মেয়েদের ছবি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মানবিক সহানুভূতিই তাঁর মূল্যবান পাথেয়। বাস্তবধর্মিতা ও ব্যক্তিচরিত্রসৃষ্টি উপন্যাসের যে-দুটি প্রধান লক্ষণ—সার্ভেন্টিস্ তার অন্যতম পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "সাংকোপাঞ্জা ডনকুইকজোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না—তখন হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। ডনকুইকজোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ : এ পর্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলেব জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ।"

'ডন কুইকজোট' বইয়ের শুরুতে লেখকের নিবেদন অংশে তিনি লিখেছেন : (যেন কোনও বন্ধু তাঁকে বলছেন)

> For your subject being a Satire on knight-errantry is so absolutly new, that neither Aristotle, St. Basil nor Cicero, ever dreamt or heard of it. Those fabulous extravagances have nothing to do with the impartial punctuality of true history; ···Nothing but pure nature is your business; here you must

consult and closer you can imitate your picture is the better. And since the writing of your's aim at no more than to destroy the authority and acceptance the books of chivalry have had in the world···keeping your eye still fixed on the principal end of your project, the fall and destruction of that monstrous heap of ill-contrived romances, which though abhorred by many have so strangely infatuated the greater part of mankind. Mind this and your business is done.

বন্ধুর উপদেশের বকলমে সার্ভেন্টিস্ তাঁর পূর্বের ও সমকালের তথাকথিত 'রোমান্স্‌কাহিনী'র বিরোধী বক্তব্য দৃঢ়কণ্ঠে ধ্বনিত করেছেন। 'Nothing but pure nature is your business' —অর্থাৎ কোনও কাল্পনিক-বিলাস নয়—পৃথিবীর বাস্তব তথ্য উপন্যাসে প্রতিফলিত হোক—এই ঘোষণা দ্বারা সার্ভেন্টিস্ উপন্যাসের ভিত্তি সুপ্রোথিত করেছেন। বইয়ের শেষে তিনি পাঠকদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে লিখেছেন :

As for me, I must esteem myself happy, to have been the first that render'd those fabulous, nonsensical stories of Knight-Errantry, the object of the public Aversion. They are already going down and I do not doubt but they will drop and fall altogether in good earnest never to rise again. Adieu!

মধ্যযুগীয়তা ও মধ্যযুগীয় রোমান্স্-এর ধারাকে যে সার্ভেন্টিস্ বহন করলেন না, তার কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাদের অন্তঃসারশূন্যতা। এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর সমকালীন রূপান্তরিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশ থেকে। ফিউদাল সমাজের বুর্জোয়া শক্তির আবির্ভাবের বিরুদ্ধে ব্যর্থ আন্দোলন 'ডন কুইকজোট' উপন্যাসে রূপকার্থ লাভ করেছে। তাই 'ডন কুইকজোট' নতুন সমাজের নতুন উপন্যাস। গদ্যে লেখা অগণিত চরিত্র ও ঘটনায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস নতুন শিল্পরূপ

বা Art-form-এর সম্ভাবনা সফলপ্রায় করে তুলল। নতুন যুগের আলোকসুধা র‍্যাবলে ও সার্‌ভেন্‌টিস্ পান করেছিলেন, সেজন্যই উপন্যাসের 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' খুলবার প্রয়াস তাঁদের মধ্যে দেখা দিল। তাঁরা ব্যালাড, এপিক বা নভেলা লিখলেন না। সার্‌ভেন্‌টিস্ ঠিক স্পেনীয় সাহিত্যের 'পিকারো'-বর্গের উপন্যাসও অক্ষরে অক্ষরে লেখেন নি। এই গ্রহণ-বর্জনই নবযুগের অভিজ্ঞানবহ।

উপন্যাস একটি নতুন শিল্পরূপ বা Art-form। ফিউদাল সমাজ বা রাজতন্ত্রী অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সাহিত্য জন্মলাভ করে নি। আবার একেবারে নিরক্ষর মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যও উপন্যাস জন্মলাভ করে নি। ফিউদাল সমাজের পরিবর্তে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানই উপন্যাসের জন্ম সম্ভব করেছে। মুদ্রাযন্ত্র এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। মুদ্রাযন্ত্রের মধ্য দিয়ে পত্র, পত্রিকা, পুস্তিকা, বই প্রকাশের ফলে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন পাঠকসমাজের সীমা ক্রমবর্ধিত হতে থাকে। তখন ব্যক্তি-বিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের অনুগ্রহের উপর আর কেউ নির্ভরশীল থাকে না। সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্র নয়, বুর্জোয়াতন্ত্রই ক্রমশ সমাজে নেতৃস্থান অধিকার কবে নিয়েছে। শহরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা তারই প্রমাণ। এই মধ্যবিত্ত সমাজই উপন্যাসের লেখক ও পাঠক। কাজেই উপন্যাসকে ব্যালাড, এপিক, নভেলা বা 'তথাকথিত' রোমান্সের কালানুক্রমিক পরিণতি বলা সঙ্গত নয়। বরং উপন্যাস নতুন সৃষ্টি, নতুন সমাজমানসের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে পদ্য নয়—গদ্যই এই রূপান্তরিত নাগরিক সমাজের, বুর্জোয়া সমাজের, মধ্যবিত্ত সমাজের বক্তব্য প্রকাশের অনিবার্য বাহন। সমাজ এখন জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পড়েছে, নগরকেন্দ্রিক মেহনতী ও চাকুরিজীবী মানুষের দল গড়ে উঠেছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে, কাজেই সাহিত্যের বাহন এখন আর পদ্যবদ্ধ নয়—এখন গদ্যই সম্রাট। অবশ্য এই পর্যালোচনা ইংরেজী উপন্যাসের পটভূমিকায় সাধারণত করা হবে তার কারণ,

উপন্যাসের ক্ষেত্রে রুষ ও ফরাসী উপন্যাসের স্থান খুব উঁচুতে হলেও ঐতিহাসিক ক্রমের দিক থেকে ইংরেজী উপন্যাসই অগ্রজের দাবি জানাতে পারে। কেননা রুষ উপন্যাস গড়ে উঠেছিল বহুলাংশে ইংরেজী ও ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদের মধ্য দিয়ে উনিশের শতকে। আর ফরাসী উপন্যাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বোধ করি ভল্‌তেয়রের 'কঁদিদ' (Candide) উপন্যাসে। ভল্‌তেয়রের 'কঁদিদ' ১৭৫৯-এ বার হয়। কিন্তু তার পূর্বেই 'গালিভার্স ট্র্যাভল্‌স্‌' (Gulliver's Travels) এবং রবিনসন ক্রুশো (Robinson Crusoe) বার হয়েছে। এ কথাও সত্য যে র‍্যাবলে ও সার্‌ভেন্‌টিস্‌-এর প্রভাব হয়তো ইংরেজী উপন্যাসের প্রথম পর্বে সুইফট্‌, ডেফো, ফিলডিং-এর রচনায় আছে। কিন্তু সার্‌ভেন্‌টিসের 'ডন কুইকজোট' এবং ডেফোর 'রবিনসন ক্রুশো' এক নয়। এবং এ কথাও মেনে নিতে হবে যে সার্‌ভেন্‌টিসের বই না থাকলেও 'রবিনসন ক্রুশো' অবশ্যই রচিত হত।

এই প্রসঙ্গে আঠারোর শতকের ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির রূপান্তরের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। কেননা এই রূপান্তরিত সমাজের সঙ্গে সমকালীন শিল্প ও শিল্পীমনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আমরা দেখতে পাই বিষয়-বস্তু ও রূপগঠনে কি ভাবে আঠারোর শতকের গদ্যরচিত এই উপন্যাস পূর্বরচনাগুলি থেকে কতদূর সরে এসেছে। নগরকেন্দ্রিক সমাজ যখন দ্রুত রূপ গ্রহণ করতে থাকে তখন মধ্যবিত্ত স্তরেরও সম্প্রসারণ ঘটে। আমরা দেখি নগরকেন্দ্রিক এই সমাজে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রাদির প্রসার ক্রমশ বেড়েছে। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক পত্র The Daily Courant বার হয়। ১৭০৯-এ স্টীল্‌-এর পরিচালনায় বার হয় Tatler। এই পত্রিকা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হত। ১৭১১-এ অ্যাডিসন ও স্টীল্‌-এর যৌথ প্রচেষ্টায় দেখা দিল Spectator —দৈনিক পত্রিকা। তারপর ১৭৩১-এ Gentleman's Magazine মাসিক-সাময়িক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আঠারোর শতকের দ্বিতীয়ার্ধে Chronicle, Post, Times প্রভৃতি পত্রিকা

প্রকাশিত হয়। পত্র, পত্রিকা, পুস্তিকা, গ্রন্থপ্রকাশ সাক্ষ্য দেয় পঠনক্ষম জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান ইতিহাসের। এই যে 'reading public', এরাই নতুন যুগের সাহিত্যের, বিশেষত সংবাদপত্র ও উপন্যাসের, পৃষ্ঠপোষক। আগের জনসাধারণ ছিল হয় দর্শক, নয় শ্রোতা। এবার এল পড়ুয়া জনসাধারণ—তারা নগরের, শহরের, শিল্প-অঞ্চলের লোক। জনৈক বিশেষজ্ঞ লিখেছেন ১৭২৪-এ লণ্ডন শহরে ৭০টি মুদ্রাযন্ত্র ছিল কিন্তু ১৭৫৭-এ এই সংখ্যা বেড়ে দেড়শো থেকে দুশোয় পরিণত হয়েছিল। মুদ্রাযন্ত্রের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্যই ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে জনসন ঘোষণা করেছিলেন 'a nation of readers'। জনসন এ কথা বললেও আসলে সেকালে ইংলণ্ডে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কমই ছিল। গরিব লোকরা লেখাপড়া শিখতে খুব আগ্রহ দেখাত না। বালক বা কিশোর বয়স থেকেই বাবা-মা ছেলেদের কাজে লাগিয়ে দিতেন, ভাবতেন লেখাপড়া বেশি শিখে আর কি হবে। সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো ছিল না। তারা দৈনন্দিন প্রয়োজনের ন্যূনতম খোরাকও যোগাড় করতে পারত না। গ্রেগরি কিং ১৬৯৬-এ লিখেছিলেন যে সাধারণত দরিদ্র পরিবারগুলির গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ৬ পাউণ্ড থেকে ২০ পাউণ্ডের মধ্যে। কাজেই এই শ্রেণীর মধ্যে reading public বাড়ে নি। তা ছাড়া উপন্যাসের দামও ছিল বেশি ; তার চেয়ে এক পেনি খরচ করলে গ্লোব থিয়েটারের এক কোণে দাঁড়ানো চলত। খবরের কাগজের দাম কম ছিল, সেজন্য অনেকেই পড়তে পেত। এই সূত্রে বলা দরকার যে 'রবিনসন ক্রুশো' সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে বই বিলির গ্রন্থাগারও দেখা দেয়। ১৭৫০ থেকে এই Circulating Library-র কর্মক্ষেত্রও বাড়তে থাকে। এই সব গ্রন্থাগারের চাঁদা খুব বেশি ছিল না, লোকের সাধ্যায়ত্ত ছিল। এই সব গ্রন্থাগারের সাহায্যেও পড়ুয়া জনসাধারণের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল।

নগরকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে নগরে শহরে শিল্পাঞ্চলে অসংখ্য কফি-হাউস আর ক্লাব গড়ে উঠল। এই শহরাঞ্চলের কফি-হাউস ও ক্লাবগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চলের এতদিনকার অপরিচিত বিচিত্রবৃত্তিধারী মানুষ মিলতে লাগল। নগরকেন্দ্রিক সমাজের মূলে বণিকতন্ত্রই প্রধান। ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক, গৃহভৃত্য, শিক্ষানবীশ, কেরানী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীরও ভিড় বাড়তে থাকল। এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর দাবিই উপন্যাসের জন্ম সম্ভব করে তুলল। মহিলাদের দাবিও কম ছিল না। তাঁরা অবসর সময়ে গল্প-উপন্যাস পড়বার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কাজেই তাঁরাও পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর একটি বিশেষ অংশ। কাজেই দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের জন্ম উচ্চস্তরের মানুষের চিত্তভৃপ্তির জন্য নয়, সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই।

এই আঠারোর শতকের ইংরেজী উপন্যাসের পিছনে রাজতন্ত্রের কোনো ভূমিকাই ছিল না। অভিজাততন্ত্রের সঙ্গেও তার যোগ ছিন্ন। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন প্রকাশক ও গ্রন্থবিক্রেতারা। সেদিনকার মুদ্রাযন্ত্র, পত্রিকা, গ্রন্থপ্রকাশ সবই একশ্রেণীর পুস্তক-প্রকাশকের আয়ত্তে এসে পড়েছিল। গ্রন্থপ্রকাশের একচেটিয়া মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদের উপরও মালিকানাস্বত্ব যেন এসে গিয়েছিল। ডেফো তাই ১৭২৫-এ লিখেছিলেন—

"Writing···is become a very considerable Branch of English Commerce."

প্রকাশকেরা জানতেন পদ্যগ্রন্থ বা কাব্যের চেয়ে গদ্যগ্রন্থের চাহিদা এই যুগের হঠাৎ-বেড়ে-ওঠা পড়ুয়া জনসাধারণের মধ্যে খুব বেশি। আরও জানতেন ভালো কাব্যগ্রন্থ লিখবার লোকও কম, তার চেয়ে গদ্য লেখা অনেক সহজ, গদ্যে লেখা গল্পকাহিনী অনেক বেশি জনপ্রিয়। এই নতুন যুগের পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর প্রভাবে নতুন ধরনের সাহিত্য অর্থাৎ নভেলের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে লাগল। নাগরিক ও বণিকতন্ত্রী সমাজে যেখানে অর্থনীতির ও ব্যবসায়নীতির

প্রতিষ্ঠাই অধিক সেখানে মানুষও অনেক স্বতন্ত্র, অনেক স্বাধীন। তাই দেখি ফরাসী দেশে এই যুগে সাহিত্য রাজতন্ত্র অর্থাৎ Court-এর বন্ধন কাটাতে পারে নি, কিন্তু ডেফো বা রিচার্ডসন বা ফিলডিং-এর সেই বন্ধন বা দায় কিছুই ছিল না। সেদিন লেখকদের যেমন নিজেদের স্বাধীনতা ছিল তেমনি সাধারণ মানুষও জনসন বা তাঁর Literary Circle কি বলছেন তার জন্য মাথা ঘামাত না। সমাজ-সম্পর্কহীন নির্জলা রোমান্‌স্‌ বা পিকারেস্‌ক্‌ উপন্যাসও তাদের তৃপ্ত করতে পারল না। তারা 'ব্যক্তি' বা individual মানুষকে দেখতে চেয়েছে—নিছক 'রোমান্‌স্‌'-এর নায়ককে নয়।

'ব্যক্তি' বা individual-এর বিকাশ তখনই ঘটে যখন সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়। আমরা দেখেছি সমাজে বণিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, ধনতন্ত্রবাদের প্রসার, নগর-শহর ও শিল্পাঞ্চলের ক্রমবৃদ্ধি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আঠারোর শতকের ইংলণ্ডের অর্থ নৈতিক তথা সামাজিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর দেখা দিয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের ফলে সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোয় যে নব শ্রেণীবিন্যাস ঘটল তার মধ্য দিয়েই 'ব্যক্তি'স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা দেখা দিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সমকালীন চিন্তাধারায় দার্শনিক লকের প্রভাবও লক্ষণীয়। লকের পূর্বে দেকার্তের Discourse of Method (১৬৩৭) রচনার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লক, নিউটন, গিবন, জনসন প্রভৃতি মনীষী এই যুগের ইংলণ্ডের চিন্তাজগৎকে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চায় সমৃদ্ধ করলেন। এই মননচর্চা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আরেকটি দিককে প্রকাশ করেছে।

বণিকতন্ত্র বা বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রসার এবং দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রকাশ ছাড়াও Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় প্রটেস্টাণ্ট মতের, বিশেষত ক্যালভিন পন্থার, প্রভাবও স্মরণীয়।

ধরা যাক বানিয়নের 'দ্য পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রোগ্রেস'-এর কথা। ধর্মচেতনার যে বলিষ্ঠতা বানিয়নের ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে উক্ত

বইয়ে। বানিয়ন রত্রের সন্তান। 'রিফরমেশন'-এর শক্তিতে তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল। সেজন্যই তিনি তাঁর মত পরিত্যাগ করেন নি, মাথা নীচু করেন নি ক্ষমতাধিষ্ঠিত যাজক বা রাজতন্ত্রের কাছে। তার ফলে তাঁকে বেডফোর্ড জেলে বহু বৎসর কাটাতে হয়েছে। জেলে থাকতে তাঁর মনে পড়ত অন্ধ মেয়েটির কথা, দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারের কথা। জেলে বসে তিনি জুতোর ফিতে তৈরি করতেন পরিবারের অভাব মোচনের ভরসায়। এই কারাজীবনে তিনি রচনা করেন 'দ্য পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস'। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখেছেন :

"As I walked through the wilderness of this world I lighted on a certain place where was a den and laid me down in the place to sleep ; and as I slept I dreamed a dream."—

এই বর্ণনা দিয়ে তাঁর কাহিনী শুরু এবং দশটি পর্যায়ে সমাপ্ত। বানিয়নের রচনা 'রূপক' বা Allegory। লেখক তাকে 'স্বপ্ন' বলেছেন। এ কথা সত্য যে তাঁর বইয়ে Mr. Worldly Wiseman, Ignorance, Piety, Demas, Talkative, Faithful প্রভৃতি চরিত্র ছায়াকল্প, রক্তহীন বা নিষ্প্রাণ নয়, তারা সবাই জীবন্ত। সেজন্য আলোচ্য বইখানি মধ্যযুগের রূপকাশ্রিত সাহিত্যের গড়নকে অঙ্গীকার করলেও সমকালীন ইংলণ্ডের পিউরিটান মনের জিজ্ঞাসায় ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ। যুগের জিজ্ঞাসাকে তিনি বহুল পরিমাণে ধারণ করেছেন, রচনাকে গদ্যে—সাধারণ কথ্য গদ্যে—প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনা 'Dream' আখ্যাত হলেও সেকালের 'Romance of the Rose' হয় নি—সমকালীন যুগজিজ্ঞাসায় নতুন পথে পা ফেলেছে। বানিয়নের এই বইয়ে ভালো-মন্দ, স্বর্গ-নরক, বন্ধন-মুক্তি, আশা-নৈরাশ্য যুগপৎ সংঘাতময় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, সামাজিক জীবনবিশ্লেষণী দৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি বানিয়নের ছিল। কিন্তু তবুও বানিয়ান ডেফো থেকে অনেক দূরে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষ বাস্তবদৃষ্টি

এবং সমাজের অর্থনৈতিক রূপান্তর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বানিয়নের নেই। অথচ ঐ লক্ষণ দুটিই ডেফোর উপন্যাসে দেখতে পাই। তবুও উপন্যাসের পথ রচনায় বানিয়নের দান বিস্মৃত হবার নয়।

এই আঠারোর শতকের অন্যতম শক্তিশালী লেখক সুইফট্। তিনি যে 'গালিভার্স্ ট্র্যাভল্স্' লিখেছিলেন, আজ সে বই বালকপাঠ্য; কিন্তু সুইফট্ কি শিশুদের কথা স্মরণে রেখে এ বই লিখেছিলেন? আদৌ নয়। তবে ছোটরা যে এই বই পড়ে আনন্দ পাচ্ছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

'গালিভার্স্ ট্র্যাভল্স্'-এর রচয়িতা সাংবাদিক সুইফট্ দরিদ্র আইরিশ পরিবারের ছেলে, জন্মের আগেই পিতাকে হারিয়েছিলেন। তিনি জীবনের প্রথম পর্বে সমাজের কাছ থেকে যে তিক্ত ও অবমাননাকর ব্যবহার পেয়েছিলেন তারই প্রতিশোধ তিনি নিয়েছেন তাঁর অসংখ্য ব্যঙ্গধর্মী রচনায়। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজের ভণ্ডামির আবরণ তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। আহতমনা সুইফট্ মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। মহিলাদের সম্পর্কেও তাঁর কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। এই 'ট্র্যাভল'গুলির মধ্যে দিয়ে সুইফট্ তাঁর সময়ের হুইগ-টোরির দ্বন্দ্ব, সমাজে মননের ও রুচির নীচতা প্রভৃতির সম্বন্ধে যেমন কঠোর ব্যঙ্গ করেছেন তেমনি দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। লিলিপুট বামনদের (Lilliput) রূপকে সুইফট্ সমকালীন নীচুমনের মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন। একটি ডিমের কোন্ দিকটা ভাঙা হবে তাই নিয়ে গৃহযুদ্ধের (civil war) বর্ণনা সমকালীন রাজনীতিতে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রূপকমাত্র। Honyhnhnms-এর দেশে নরদেহধারী অধম জীব yahoos-দের বর্ণনায় সুইফটের cynicism বা নরবিদ্বেষের চরম রূপ দেখা দিয়েছে। প্রতীতিহীন মনের এই বিদ্রূপ, ঈর্ষা ও আত্মাভিমানে দগ্ধ মনের এই প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও রানী অ্যানের যুগের সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কে তাঁর জীবনবোধ ও বাস্তবচেতনা

সকল পাঠককেই চমকিত করে। এই জীবনীশক্তি বা vitality সুইফটের রচনার প্রাণ। এ কথা সত্য যে মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কোনও শিল্পীই মহৎ সংজ্ঞা লাভের যোগ্য নন। এবং সেদিক থেকে সুইফট্ মহৎ শিল্পী নন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ সামাজিক পর্যবেক্ষণশক্তিতে তিনি দেখেছিলেন—সমাজের নীচতা, হীনতা, উপরের স্তরের মানুষদের কদর্য রূপ, সেই 'what man has made of man.'

সুইফটের 'গালিভার্স্ ট্র্যাভল্স্'কেও রূপকাশ্রিত (Allegorial) রচনা বলা যায়। বাইবেলের গল্পে, মধ্যযুগের 'মর‍্যালিটি' নাটকে এর সূচনা ও প্রতিষ্ঠা, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী 'moral fable' মধ্যযুগের 'মরালিটি' নাটকের অনুবৃত্তি নয়। সেজন্যই বানিয়নের 'দ্য পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' (The Pilgrim's Progress) আর সুইফটের 'গালিভার্স্ ট্র্যাভল্স্' মননে ও দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পৃথকধর্মী হলেও গড়নে মিল আছে। বানিয়নের পিউরিটান নীতিবোধের সঙ্গে সুইফটের তিক্ত ব্যঙ্গধর্মিতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকলেও দুজনের হাতেই মধ্যযুগের রূপকাশ্রিত শিল্পরূপ অষ্টাদশ শতকের জীবনসংঘাতের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় নব তেজ লাভ করেছে।

ডেফোর (১৬৬০-১৭৩১) 'রবিনসন ক্রুশো' সুইফট্-এর (১৬৬৭-১৭৪৫) 'গালিভার্স্ ট্র্যাভল্স্'-এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল (যদিও কিছু আগে রচিত)। ডেফোর বই বার হয় ১৭১৯-এ আর সুইফট্-এর বই ১৭২৬-এ। দুজনে সমকালীন হলেও তাঁদের রচনার দৃষ্টি পৃথক। সাধারণভাবে বললে বলা যায় যে সুইফট্ যদিও মানুষকে ভালোবাসতে পারেন নি তবু তাঁর সমাজসচেতনতা, ব্যঙ্গধর্মিতা, বিদ্রোহবাদ র‍্যাবলের কথাই স্মরণ করায়। ডেফো তুলনায় কল্পনাশ্রয়ী, কিন্তু তাঁর রচনায়ই প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের, ধনিকতন্ত্রী ইংলণ্ডের, জীবনপ্রবাহ ধরা পড়েছে। যে যুগে ইংরেজের বাণিজ্যতরী ও রণতরী প্রাচ্যদেশের ঘাটে-ঘাটে ঘুরে অর্থনৈতিক

সাম্রাজ্য বিস্তারের পটভূমিকা বচনা কবেছে সেই যুগেই 'রবিনসন ক্রুশো'ব আবির্ভাব সম্ভব। নিম্নবিত্ত পবিবারের সন্তান ছিলেন ডেফো। সাংবাদিকতা থেকে জেল-খাটা অবধি জীবনের বিস্ময়কব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ কবেছিলেন :

No man has tasted differing fortunes more
And thirteen times I have been rich and poor.

সাংবাদিকতা থেকেই ঝবঝবে বর্ণনাব বীতি ও ভাষা তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন।

ববিনসন ক্রুশো যে পিতাব নিষেধ শেষ পর্যন্ত না মেনে বেবিয়ে পড়েছিলেন সে ঐ যুগের মধ্যবিত্ত ইংবেজেরই মনের বাসনা। ক্রুশোর পিতা মধ্যবিত্ত জীবনেব স্তুতিগান কবতে গিয়ে বুঝিয়েছিলেন মধ্যবিত্তেব জীবনই সবচেয়ে নিবাপদ—

That the calamities of life were shared among the upper and the lower part of mankind , but that the middle station had the fewest disasters, and was not exposed to so many vicissitudes as the higher and lower parts of mankind ;

কিন্তু এই নিবাপত্তাব স্বাদ ক্রুশোকে আকর্ষণ কবল না। তখন চতুব বণিকবৃত্তিব বহির্বাণিজ্যেব সম্প্রসাবণেব যুগ। তাই ক্রুশোব মুখে শুনি :

Here my partner and I found a good sale for our goods, as well as those of China as the Sables etc. of Siberia , and dividing the produce, my share amounted three thousand four hundred and seventy-five pounds seventeen shillings and three pence, including about six hundred pounds' worth of diamonds which I purchased in Bengal !

সতেবো শিলিং তিন পেনিব কথা উল্লেখ কবতেও ডেফো ভোলেননি।

আর একটি দিক 'রবিনসন ক্রুশো' সম্পর্কে আলোচ্য। অডিসির সঙ্গে তুলনায় সেই দিকটি ধবা পড়বে। দীর্ঘকালব্যাপী ট্রয়যুদ্ধের পর অডিসিউস ফিরে চলেছিলেন তাঁর রাজ্য ইথাকায় তাঁর পত্নী

পেনিলোপের কাছে। পথে কত বাধা-বিপত্তি। তিনি দেবতাদের প্রসাদ ভিক্ষা করে বীতবিঘ্ন হলেন। সে যুগের সমাজে ও জীবনে দৈবানুগ্রহ সত্য ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রবিনসন ক্রুশো যুদ্ধ থেকে ঘরে আসে নি। ঘর থেকে যুদ্ধে বার হয়েছে। সমুদ্রের বিরুদ্ধে, ঝড়ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ নিজের আত্মপ্রত্যয় ও শক্তিতে দাঁড়িয়েছে, হার মানে নি। এই প্রতীকধর্মিতা 'রবিনসন ক্রুশো'য় স্বয়ম্প্রভ। হোমারের যুগ ও ডেফোর যুগ পৃথক বলেই ব্যক্তি-মানুষের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এই যুগে।

বানিয়ন বা সুইফট্ কারো রচনাতেই উপন্যাস বচনার সামগ্রিক দৃষ্টি নেই। সেটা আছে ডেফোর রচনায়। ডেফো পুরোনো কাহিনী বা traditional plot-কে গ্রহণ করেন নি, তাব গল্পও সম্পূর্ণ নতুন, রবিনসন ক্রুশো বা মল্ ফ্লান্ডার্স নামগুলিও সমকালীন মানুষেব নাম, Proper name। পূর্বে লিখেছি অডিসিউসের কথা। অডিসিউস চেয়েছিলেন ইথাকার শান্তি, রাজ্য ও পত্নীব সপ্রেম সাহচর্য। ক্রুশো চেয়েছিল দ্বীপেব মালিকানা, কর্মকর ক্রীতদাস এবং একচেটিয়া প্রভুত্ব। সে যখন বিচার করে দেখেছে যে তার আর্থিক সঙ্গতি প্রচুব ও ব্যবসা-বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত—তখনই সে বিবাহ কবেছে। মনে রাখতে হবে ভাঙা জাহাজের চোরাই-করা যন্ত্রপাতি নিয়েই ডেফোর উন্নতির সূচনা। লেনদেনী বণিকযুগের প্রতিনিধি ববিনসন। তাই যখন অন্যান্য লোকেরা তাব অধিকৃত দ্বীপে এসেছে সে তাদের দিয়ে তার প্রভুত্ব স্বীকারের চুক্তিনামা সই করিয়ে নিয়েছে। কোনও মৌখিক বন্দোবস্ত নয়—একেবাবে লিখিত চুক্তিনামা! আর্থিক মুনাফা ছাড়া রবিনসন অন্য কিছু ভাবে নি—এই ভাবনা আঠারোব শতকের ইংলণ্ডেব বাস্তব জীবনের সৃষ্টি।

ডেফো সম্ভবত The Voyages and Travels of Albert de Mandelslo বইখানি পড়েছিলেন কিন্তু মর্মগতভাবে 'রবিনসন ক্রুশো' তো কোনও রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনী নয়—

এ উপন্যাস আঠারোর শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী অর্থনৈতিক মুনাফাকামী মানুষের জীবনকাহিনী। সে জীবনে পারিবারিক বা গোত্রবন্ধন প্রাধান্য পায় না—সেখানে পরিবার-ও গোত্র-বন্ধনছিন্ন ব্যক্তিমানুষের ইতিহাস।

তাই দেখি একদিন নরনারী যৌথ-কর্ষণার জীবনে যে নৃত্য-গীত-কাহিনীর ত্রিবেণীসঙ্গম রচনা করেছিল সে যৌথজীবন পরবর্তী কালের সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের ফলে লুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে 'ব্যালাড' বা গীতিকা লুপ্ত হয় নি। তবে 'ব্যালাড' মাঝে মাঝে ছুদণ্ডের অবসরে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজকে ক্ষণতৃপ্তি দিলেও নাগরিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী আর সে রসে তৃপ্ত রইল না। তেমনি 'এপিক' মিলটন লিখলেন, সে 'এপিক' হোমারের এপিকের মতো নয়, তার মধ্যেও যুগের জিজ্ঞাসা শয়তানের দৃপ্তবিদ্রোহে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু লোকে তার চেয়ে অনেক বেশি পড়েছে ডেফোর, সুইফটের বই, পড়েছে 'ট্যাটলার', 'স্পেক্টেটর'। এই নবোত্থিত শিক্ষিত নগরবাসী মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী ও বুর্জোয়া সমাজই উপন্যাসের প্রকৃত জন্মদাতা। 'ব্যক্তি'চেতনা, সমাজবোধ, বাস্তবধর্মিতা, ব্যঙ্গ—সবই সমাজের ক্রমবিকাশের লক্ষণ। তাই উপন্যাসের জন্ম এই যুগেই হয়েছে—তাকে সফল করছে মুদ্রাযন্ত্র ও গদ্য॥

উপন্যাসের বিকাশ

॥ ইংরেজী সাহিত্যে ॥

যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রবিনসন ক্রুশোয় দেখা গেল, তার ভিত্তি সমকালীন ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের মধ্যে ছিল। প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম, ক্যালভিনবাদ এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশে সহায়তা করেছিল। এ-সব প্রসঙ্গ এবং হবস্ ও লকের মতবাদের প্রভাবও এই সূত্রে আলোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য কিভাবে 'রবিনসন ক্রুশো'য় ছায়াপাত করেছে তা আমরা দেখেছি। ডেফোর 'মল্ ফ্লানডার্স' এই বক্তব্যকে যেন আরও স্পষ্টভাবে ধরেছে। 'রবিনসন ক্রুশো'র মতো এখানেও "I"-এর অর্থাৎ "আমি"-র প্রকাশ। এর নায়িকা এক চোর-রমণী। আঠারোর শতকের ইংলণ্ডের নগর-সমাজের ছবি এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। ডেফো নিজে 'আইন-আদালত'-এর রিপোর্টার ছিলেন। 'মল ফ্লান্ডার্স' লেখার আগে তিনি আঠারো মাস 'নিউগেট'-এ কাটিয়েছিলেন। দাগী আসামী, চোর-বদমাশ, গণিকা প্রভৃতির যে চিত্র তাঁর উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তারা সবাই 'আত্মসম্মান' রক্ষায় ব্যস্ত। তারা বরং চুরি করবে, ভাগ্যের বিরুদ্ধে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, কিন্তু ভিক্ষা করবে না। এদের জীবনযাত্রা ডেফোর আদৌ অপরিচিত ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, শুধুমাত্র ১৭১৭ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'ওল্ড বেইলি' থেকে উত্তর-আমেরিকায় চালান হয়েছিল প্রায় দশ হাজার ইংরেজ কয়েদী। ডেফোর নায়িকা 'মল্' দুটি ব্রকেড সিল্কের টুকরো চুরির জন্য মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিল যদিও পরে তার দ্বীপান্তরদণ্ড হয়। 'মল্'-এর মায়েরও একই সাজা হয়েছিল সামান্য চুরির অপরাধে। এদের নিয়েই ডেফো লিখলেন তাঁর উপন্যাস 'মল্ ফ্লান্ডার্স'।

কিন্তু 'মল্'-এর চৌর্যবৃত্তি, বহুপুরুষসঙ্গ প্রভৃতি যেমন ডেফো বর্ণনা করেছেন তেমনি তার চরিত্রের দু-একটি ভালো দিকও দেখিয়েছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি ও 'মল্'-জাতীয় চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি ডেফোর বৈশিষ্ট্য। ফর্স্টর-এর মতে 'মল্ ফ্লানডার্স' যথার্থই 'চরিত্র' (character)-প্রধান প্রথম নভেল। ডেফো প্রচলিত সমাজবিধি ও পিউরিটান নীতিবোধ থেকে শিল্পী হিসেবে (ব্যক্তি হিসেবে নয়) নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে 'লেডি রোক্সনা' বা 'কর্নেল জ্যাক' লেখা সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়ে নরনারীর প্রেম, মিলন, বিবাহ, অ-সামাজিক প্রেম বা স্বাধীন প্রেমকে কি চোখে দেখা হত এ সময়ের উপন্যাসগুলিতে তার পরিচয় আছে। রোমান্স্গুলিতে 'স্বাধীন' এমন কি অবৈধ প্রেম চললেও বাস্তব সমাজে কড়াকড়ি ছিল। তাই ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দেও দেখি ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। সেজন্যই পিউরিটান মতবাদের প্রভাবে বিবাহের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছিল, যদিও বিবাহ সেকালে অত সহজ ছিল না। ফ্রান্সে আঠারোর শতকের প্রথম ভাগে বাবা মা যুবতী মেয়েদের যুবকদের থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতেন যতদিন না তাদের মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হত। এ সময়ে জর্মানি বা ইতালিতেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিশেষ ছিল না। বরং ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগ থেকে কিছু স্বাধীনতা মেয়েরা ভোগ করছিল। নাগরিক ও বণিকসেবী সমাজ গড়ে ওঠায় গ্রামের বৃহৎ বা যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট শহুরে-পরিবার এ সময়ে গড়ে উঠেছে। লক বলতেন, 'leave a man at his own free disposal'—এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তখন সমাজে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তবুও মেয়েদের অবস্থা ভালো ছিল না। সমাজে মেয়েদের আইনগত সুবিধাও বিশেষ ছিল না। কেননা শুধুমাত্র স্বামীরাই বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারী ছিল, মেয়েদের সে অধিকার ছিল না। সেকালে বিয়ে হওয়া অর্থের ব্যাপার ছিল—অর্থাৎ টাকা না হলে মেয়েদের বিয়ে হওয়া কঠিন ছিল। তাই সমাজে 'ওল্ড মেড'-দের সংখ্যা বেড়েছিল, অবৈধ

সন্তানের সংখ্যাও কম ছিল না। সেজন্যই পিউরিটানরা সমাজে অবিবাহিত থাকার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সত্যিই মেয়েদের সম্মান বেশি ছিল না। তাই সেকালের ইংরেজ সমাজে বহু বালিকার বিয়ে হত প্রৌঢ়ের সঙ্গে। এমন কি সামান্য টাকায় 'কন্যাবিক্রয়' হত। এই যুগেই রিচাডসন (১৬৮৯-১৭৬১) লেখেন তাঁর পত্রোপন্যাস 'পামেলা' (১৭৪০)। অবশ্য 'পামেলা'র মধ্যে রিচার্ডসন সমাজের এই তিক্ত দিকটিকে দেখান নি। 'পামেলা' পরিচারিকা পর্যায়ের মেয়ে হয়েও তার মনিবকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারল—যদিও বাস্তবে এ ঘটনা বেশি ঘটত না। তবুও প্রচলিত পারিবারিক ও শ্রেণীগত ঐতিহ্য, স্বার্থ বা মর্যাদার উপরে প্রেম ও বিবাহ জয়ী হল—এই সমাপ্তি রিচার্ডসন দেখালেন। ফিল্ডিং 'শামেলা' লিখে 'পামেলা'-কে বিদ্রূপ করতে চেয়েছেন তবু এ কথা বলতেই হবে যে এ রোমান্স্ ঠিক মধ্যযুগের রাজারাজড়ার রোমান্স্ নয়, বরং ধনী ও দরিদ্রের ভেদ ভেঙে দিয়ে রিচার্ডসন ঈষৎ সাহসিক কাজই করেছেন। তবে রিচার্ডসন তাঁর 'পামেলা'-র অপর নাম দিয়েছেন Virtue Rewarded। পিউরিটান যুগের morality বা নীতিবাদকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও মানতে হবে 'পামেলা'-য় সমকালীন বাস্তব জীবনের, দরিদ্র মেয়ের প্রকৃত সমস্যা ও যন্ত্রণা রূপায়িত হয় নি। তার তুলনায় রিচার্ডসনের 'ক্লারিশা' উন্নততর সৃষ্টি। ক্লারিশার জীবনের ট্র্যাজেডি রিচার্ডসন বাস্তবধর্মী ঔপন্যাসিকের চোখেই দেখেছেন। গ্রামের সরলা পবিত্রচেতা মেয়ে নাগরিক জীবনের শঠতা ও প্রতারণায় কিভাবে নির্যাতিতা হয়ে শেষে নিজের গ্রামেই ফিরে গেল তার মাটিতে সমাধিস্থা হবার জন্য, তার বাস্তব-করুণ কাহিনী রিচার্ডসন নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাজের এই বাস্তব রূপ, তার নিষ্ঠুর পাপাচারের প্রত্যক্ষ রূপ তাঁর 'পামেলা'-য় প্রকাশিত হয় নি (তার কারণও ছিল না)। রিচার্ডসন যেন বলতে চেয়েছিলেন : এমন শুভ্র নির্মল হৃদয় সমকালীন শহরের পাপবায়ুতে বাঁচে না।

'ক্লারিশা' পড়তে পড়তে হার্ডির 'টেস্' বা 'জুড দি অবস্‌কিওর' বার বার মনে পড়ে। রিচার্ডসন 'পামেলা'-য় পারেন নি কিন্তু 'ক্লারিশা'য় নারী-ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ দেখিয়েছেন। একদিকে ব্যক্তিমন অপর-দিকে প্রচলিত সামাজিক বিধি, নিয়ম, সংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ। ক্লারিশাকে লডাই করতে হয়েছে পরিবারেব বিরুদ্ধে, পরিবেশের বিরুদ্ধে, বর্বর-প্রেমিক লাভলেস্-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু সমাজ এত সহজে সে লডাই মেনে নেয় নি। সে কেডে নিযেছে তার যা কিছু মূল্যবান, তার নাবীত্ব, সতীত্ব। কিন্তু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কবে গেছে ক্লারিশা—"The man who has been the villain to me that you have been shall never make me his wife"। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বাস্তবধর্মিতা ও শিল্পীজনোচিত সহানুভূতি—এই তিনটি গুণে 'ক্লারিশা' সমৃদ্ধ। 'পামেলা'-য বিচার্ডসন রোমান্টিক, কিন্তু 'ক্লাবিশা'-য় তিনি রিয়ালিস্ট। ক্লাবিশার দীপ্যমান চবিত্রেব প্রতি বিচার্ডসনের চিত্ত শ্রদ্ধাসন্নত, তাব করুণ ভাগ্যহত জীবনের প্রতি তিনি সহবেদনামগ্ন। রিচার্ডসনেব পত্রোপন্যাস দুখানিতে যে বীতি অনুসৃত হয়েছে তার মূল সে যুগেব পটভূমিতে নিহিত। মুদ্রাযন্ত্রেব প্রসাব, গদ্যেব প্রচাব, সংবাদপত্রেব বিস্তাব, পঠনক্ষম মেহনতী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজেব সম্প্রসারণ, সমাজেব অর্থনৈতিক রূপান্তব ঘটেছিল। তার সঙ্গে ইতিহাস, চবিত, আত্মচবিত, স্মৃতিকথা, ডাযেবি, জর্নাল, চিঠিপত্র প্রভৃতি রচনার প্রাচুর্য এসেছিল। এ-সব পডবাব আগ্রহও সেদিন পড়ুযা সাধাবণের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। আব প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যচর্চার ও পরিবেশনেব পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন গ্রন্থ-ব্যবসায়ীরা। এই ধরনের দুজন ব্যবসায়ী চার্লস্ বেভিংটন এবং জন ওস্‌বোর্ন রিচার্ডসনকে "Familiar Letters" একখণ্ড লিখতে বললেন। এই চিঠির বই সাধাবণ অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতদেব জন্য লিখতে হবে। বিশেষ করে মেয়েরা যারা ঘবের বাইবে গিয়ে চাকরি করতে বাধ্য হয় তাবা কিভাবে কোন্ পথে চললে লাঞ্ছনা ও প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচতে পারে, নিজেদের ধর্ম রক্ষা করতে

পারে—চিঠিগুলি সেই ধরনে লিখে দেবার কথা ছিল। সেই চিঠি লিখতে গিয়ে রিচার্ডসন ঔপন্যাসিক হয়ে পড়লেন।

যার হল Pamela ; or Virtue Rewarded. "In a series of Familiar Letters from a beautiful young damsel to her parents. Now first published in order to cultivate the principles of virtue and religion in the minds of the youth of both sex"। এই চিঠিগুলির মধ্যে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মনোজগৎ, তাদের বাসনা, কামনা, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দাহ ও দৃঢ়তা,—সবই আশ্চর্য বিশ্লেষণমণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ডেফোর যুগ থেকে এখানে রিচার্ডসন উপন্যাসকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এলেন মনস্তাত্ত্বিক জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করে। নাটকীয়ঘটনাগর্ভ পরিবেশগুলিও অপূর্ব তথ্য-নির্ভর রূপে রচিত হয়েছে—এমন কি ক্লারিশার উপর লাভলেস্-এর পাশবিক অত্যাচারও তার থেকে বাদ যায় নি। ডেফোর উপন্যাসে প্লট-নির্মিতি নেই। রিচার্ডসনের রচনাই সে অভাব কিয়দংশে দূর করল।

পত্র-রীতি সম্পর্কে জনসনের প্রশংসা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। জনসন লিখেছিলেন : "A man's letters are only the mirror of his breast, what passes within him is shown undisguised in its natural process"। রিচার্ডসনও অনুরূপ প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই চরিত্রগুলির মনোজগতের গতিপ্রবাহ পত্রমাধ্যমে আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিজীবনে বা রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে 'টোরি'পন্থী রিচার্ডসন শ্রেণীদ্বেষ আনবার বিরোধী ছিলেন তাঁর রচনায়। 'পামেলা' ও 'ক্লারিশা' উপন্যাস দুখানিতে তিনি নীতি ও ন্যায়ধর্মের জয় চেয়েছিলেন। পিউরিটান নীতিধর্ম রিচার্ডসন মেনেছিলেন। কিন্তু নীতিবিদ হিসেবে তাঁকে কেউ মনে রাখে নি—রেখেছে

ঔপন্যাসিক হিসেবে। পিউরিটান-নীতিবাদ-শাসিত সমাজে রিচার্ডসন যৌনজীবনের চিত্র আঁকলেন, যা সেদিনকার পক্ষে সাহসের কাজ (সে কালেই ফরাসী মনীষী দিদেরো, রুশো প্রশংসা করেছিলেন রিচার্ডসনের)।

রিচার্ডসনের সমকালীন ফিলডিং (১৭০৭-১৭৫৪) রিচার্ডসনের ধারা গ্রহণ করেন নি। তাঁর প্রথম বই 'জোসেফ অ্যান্ড্রুস্' ১৭৪২-এ প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ 'পামেলা' বার হবার ঠিক দু বছর পর, তাকে ব্যঙ্গ (parody) করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বিচিত্র জীবন ফিল্ডিং-এর। তিনি রিচার্ডসনের মতো 'সাধারণ' স্তর থেকে আসেন নি, সমাজের উচ্চস্তর থেকে এসেছিলেন। সাংবাদিকতা, আইনব্যবসায় ছাড়াও তিনি বহু ব্যঙ্গনাট্য লিখেছিলেন। এবং তিনিও রিচার্ডসনের মতো অনেকটা আকস্মিকভাবে ঔপন্যাসিক হয়েছিলেন। ১৭৩৭-এ নাট্য রচনার পর 'সেন্সর' প্রথা চালু হল এবং তার ফলেই ফিলডিং-এর নাট্যরচনায় ছেদ পড়ল। তবে তাঁর ব্যঙ্গনাট্যরচনার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসরচনায় প্রভূত সাহায্য করেছে। 'জোসেফ অ্যান্ড্রুস্', 'জোনাথন্ ওয়াইল্ড্', 'টম্ জোনস্' আর 'অ্যামেলিয়া'—এই চারখানি উপন্যাস রচনা করে ফিলডিং ইংরেজী উপন্যাস তথা পৃথিবীর কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রিয়ালিজম-এর পথ প্রশস্ত করলেন। প্লট, চরিত্র, বাস্তবতা সবদিক থেকেই উপন্যাসের গতি ফিল্ডিং-এর কলমে অনেকদূর এগিয়ে গেল। ফিল্ডিং-এর 'জোসেফ অ্যানড্রুস্'-এর আসল নাম The History of the Adventures of Joseph Andrews and his friend Mr. Abraham Adams। বইখানি আরম্ভ করা হয়েছিল রিচার্ডসন-এর 'পামেলা'কে ব্যঙ্গ করবার জন্য কিন্তু তারপর শিল্পী ফিল্ডিং জেগে উঠলেন। তিনি ব্যঙ্গশর নিক্ষেপ করবার জন্য পামেলার এক ভাইয়ের কল্পনা করলেন যে সং ভৃত্য, তার মনিবানী লেডি বুবি-র কামনার আগুনে সে দাহ্যবস্তু হতে চায় নি। তাই জোসেফের চাকরি গেল। সে বাড়ির পথে, তার প্রিয়া ফ্যানির কাছে যাত্রা

করল। পথে দেখা হল অ্যাডামস্‌-এর সঙ্গে। তার পর দুজনের রোমাঞ্চকর পরিক্রমা বর্ণনা। সে পরিক্রমায় সরাইখানা থেকে দাগী আসামী অবধি অসংখ্য বিচিত্র চরিত্রের নরনারীর বর্ণনা ফিল্‌ডিং করেছেন। তাঁর সময়ের সমাজের ছবি চলচ্চিত্রের মতো ধরা পড়েছে। এই বইয়ের নামপত্রে ফিল্‌ডিং লিখেছিলেন যে তিনি সার্‌ভেন্‌টিস্‌-এর 'ডন কুইকজোট'-এর অনুকরণে 'জোসেফ অ্যান্‌ড্রুস্‌' লিখেছেন। তাই এই বই 'পামেলা'র ব্যঙ্গ দিয়ে শুরু, 'ডন কুইক-জোটে'র ভঙ্গি নিয়ে লেখা (এবং অডিসিউস-এর বহু বিপদঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে পেনিলোপের কাছে যাওয়ার মতো জোসেফ বহু দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছে ফ্যানির কাছে)। কিন্তু এর মধ্যেই ফিল্‌ডিং-এর বস্তুধর্মিতা ও সমাজচেতনার পরিচয় মেলে। এই প্রত্যক্ষ বস্তুধর্মিতা, নিখুঁত সমাজচিত্র অঙ্কন এবং সহজ কৌতুকরস সঞ্চার ফিল্‌ডিং-এর বিশেষ কৃতিত্ব। 'জোসেফ অ্যান্‌ড্রুস্‌' চরিত্রপ্রধান উপন্যাসও বটে, কিন্তু ফিল্‌ডিং-এর যশ মুখ্যত 'টম্‌ জোন্‌স্‌'কে কেন্দ্র করে। 'টম্‌ জোনস্‌'-এ ফিলডিং দক্ষতর শিল্পী। এখানে ডন কুইকজোট-এর পিকারেস্‌ক্‌ নভেলের রীতি থেকে যেন মহাকাব্যের রীতিকে তিনি বরণ করলেন। তাই ফিল্‌ডিং 'টম্‌ জোন্‌স্‌'-এর আখ্যা দিয়েছিলেন—"a heroic, historical, prosaic poem"। তবে এ রীতি তাঁর নিজের ভাষায় : "My romance belongs to this comic branch of the heroic tradition"।

রিচার্ডসনের তুলনায় ফিল্‌ডিং ঠিক ঠিক আঁকলেন আঠারোর শতকের ইংলণ্ডের সামগ্রিক পটভূমি ও মানুষ। তাই সমালোচক বলেছেন : "Tom Jones is the England of the time"। নভেল বা উপন্যাস সম্পর্কে ফিলডিং-এর ধারণা ছিল যে নভেলে "true to life" অর্থাৎ যেমনটি জীবনে ও সমাজে ঘটে তেমনটি ফুটিয়ে তুলতে হবে—তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়।

'টম্‌ জোন্‌স্‌' ইতিবৃত্ত বা চরিতগ্রন্থের মতো সমকালীন সমাজের ও সর্বস্তরের নরনারীর বিশ্বস্ত চিত্রবহ। মার্কস 'টম্‌ জোন্‌স্‌'-এর

উচ্চ প্রশংসা করেছেন। সমকালীন সামাজিক পটভূমিকা বিস্তৃত রূপে অঙ্কিত হয়েছে এবং সেই দীর্ঘ পটভূমিকায় টম্ স্থাপিত হয়েছে। তবে ফিল্‌ডিং বাস্তবধর্মী হলেও তাঁর দৃষ্টি মার্কসের নয়, যেন মলিয়র-এর। তিনি শেষ পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার জীবনে সুখী সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তার মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জনের কথা নেই বা সমাজের নিষ্ঠুর যূপকাষ্ঠে কারও জীবন বলি দেবার ইঙ্গিত নেই।

The History of the life of the late Mr. Jonathan Wild the Great বা সংক্ষেপে 'জোনাথন্ ওয়াইল্‌ড' ১৭৪৩-এ অর্থাৎ 'জোসেফ অ্যান্‌ড্রুস্' বার হবার এক বছর পর বার হয়েছিল। এবং 'মল্ ফ্লান্‌ডার্স' বার হবার একুশ বছর পর। এই বইয়ের পুরো নাম থেকেই ফিল্‌ডিং-এর বাস্তবধর্মী ও মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে। ফিল্‌ডিং দীর্ঘকাল ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, কাজেই চোর, খুনী, প্রভৃতি নানা ধরনের অপরাধীর নাড়িনক্ষত্র তিনি জানতেন। পেনাল্ কোডের ধারা তাঁর নখাগ্রে ছিল। কাজেই নাগরিক সমাজের নীচের মহলের অপরাধ ও অপরাধীর ইতিহাস তিনি কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন এবং শিল্পীজীবনে তাকে রূপ দিয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন ১৭২৫-এ একজন ডাকাতের ফাঁসি হয় এবং ফিল্‌ডিং তারই জীবনের ঘটনাকে বহুলাংশে গ্রহণ করেছেন তাঁর 'জোনাথন্ ওয়াইল্‌ড'-এ। এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করবার নয়। কিন্তু শুধু কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় তো উপন্যাস সৃষ্টি হয় না, তার সঙ্গে বাস্তবধর্মী দৃষ্টি ও শিল্পীর সহানুভূতি প্রয়োজন। ফিল্‌ডিং-এর মধ্যে তার অভাব ছিল না। এ উপন্যাস চরিত্রপ্রধান নয়, আঠারোর শতকের ইংলণ্ডের সমাজের চরিত্র উদ্‌ঘাটনই এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য। সেকালের বুর্জোয়া সমাজের বহু দিক ফিল্‌ডিংএর এই বইয়ে কটাক্ষের বিষয় হয়েছে। সেখানে তিনি যেন সুইফট্-এর দৃষ্টির অংশভাক্। 'Greatness' বা মহত্ত্ব সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাকে ফিল্‌ডিং এখানে বিদ্রূপ করেছেন। 'Greatness' আর 'goodness' এই দুটি বিপরীতমুখী

দিক যথাক্রমে জোনাথন্ ওয়াইল্ড এবং হার্টফ্রি-র মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। 'Great' তারাই যারা সমাজে ছলে-বলে-কৌশলে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভ করেছে—যেমন রবার্ট ওয়ালপোলেরা। রাহাজানির সর্দার ওয়াইল্ড যেন তাদেরই প্রতীক।

ফিল্ডিং থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাস্তবধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী কালে সর্বদেশে উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর রচনার প্রভাব অনুভূত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ফিল্ডিং-এর উপন্যাসে মহাকাব্যোচিত ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। কেননা ডেফোর উপন্যাসে সমাজসচেতনতা, যুগধর্ম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক তাৎপর্য সক্রিয় হলেও উপন্যাসের সামগ্রিক শিল্পরূপ তাদের মধ্যে নেই। রিচার্ডসন পত্রোপন্যাসের অবয়বে হৃদয়জগতের কথা, রোমান্টিকতা আনলেও, উপন্যাসের শিল্পরূপেব দিক থেকে তিনি শিথিলবন্ধ। একটি বিশ্বাস্য কাহিনী, পরিচিত নরনারী, সমাজের বাস্তব সমস্যা, এব' মানুষের হৃদয়-বেদনা যখন একটি সুগঠন লাভ করে তখনই আমরা বলি উপন্যাস। ফিল্ডিং-এর হাতে এই শিল্পরূপেব প্রতিষ্ঠা। মহাকাব্য সম্পর্কে বলা যায়, মহাকাব্য প্রাচীনকালেব বহুজনমিলিত মৌখিক-কাব্য, পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক বীরচরিত্রই যার আশ্রয়। আর উপন্যাস নাগরিক সমাজের, গদ্যেব, মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি। মর্ত্যের বাস্তব, পরিচিত, এবং সাধারণ হয়েও অ-সাধারণ যে-নরনারী তারাই তার আশ্রয়। তাই ফিল্ডিং-এর 'the comic epic in prose' রীতিকে স্বাগত জানাতে হয়। হেগেল আধুনিক কালের নব সৃষ্টি উপন্যাসের মধ্যে এপিকের বা মহাকাব্যেব রূপকেই দেখেছিলেন। ফিল্ডিং-এর মন একদিকে ক্লাসিক সাহিত্য অপরদিকে সমকালীন সমাজবাস্তবতা উভয়কেই ধারণ করে ছিল। তাই তিনি নিজের ব্যক্তিগত ও বুদ্ধিগত অভিজ্ঞতায় ও অনুসন্ধানে সমাজের জীবনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর অবধি মানুষকে জেনেছিলেন। নিজে রিচার্ডসনের বিরোধী 'হুইগ' অর্থাৎ প্রগতিপন্থী ছিলেন। আঠারোর

শতকের ইতিহাসবোধ, ব্যঙ্গধর্মিতা, নীতিবোধ ও শিক্ষাদান— সবই তাঁব মধ্যে ছিল। তাবই ফলে তিনি 'টম্ জোন্স্'-এর ইতিহাস বা আখ্যান রচনা করতে গিয়ে এপিকের মতোই সমকালীন সমাজ ও মানুষের দিগন্তবিস্তৃত বিচিত্র চিত্রলিপি অঙ্কন করলেন। সমাজ ও নবনারীর এই ব্যাপক চিত্রায়ণ মহাকাব্যের ভূমিকা বই কি।

'টম্ জোন্স্-এর টম্ ও সোফিয়া একদিক থেকে এপিকের নায়ক নায়িকা। কেননা সোফিয়াব আবেদনেব উত্তবে যেখানে টম্ বলেছে: 'For by this dear hand I would sacrifice my life to oblige you'—এ যেন মধ্যযুগের নাইটেব কথা, যে তার প্রিয়তমার জন্য জীবনপণ করেছে। এব বহু দুর্যোগ, বাধা, বিপত্তি জয় করে শেষে প্রিয়তমাকে লাভ কবেছে। কিন্তু সোফিয়া যেখানে টম্‌কে চিঠিতে জানিয়েছে সে ব্লিফিলকে বিবাহ কবতে কিছুতেই বাধ্য হবে না কিংবা সোফিয়া বাপেব বাড়ি থেকে পালিয়ে দূরের সরাইখানায় এসে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে আধুনিক যুগের নারীহৃদয় উদ্‌বাবিত হয়েছে :

> Sir,—It is impossible to express what I have felt since I saw you. Your submitting on my account, to such cruel insults from my father, lays me under an obligation I shall ever own. As you know his temper, I beg you will, for my sake, avoid him. I wish I had any comfort to send you, but believe this that nothing but the last violence shall ever give my hand or heart where you would be sorry to see them bestowed.

টম্ ও সোফিয়া সমাজেব প্রচলিত বিধি-নিষেধ-নির্দেশকে মেনে নেয় নি। তারা লড়াই করেছে, জিতেছে। তাই সোফিয়ার পরিণতি ক্লারিশার মতো ট্র্যাজিক হয় নি। হিরো-ভিলেন দ্বন্দ্ব টম্ জোন্স্-এ দেখালেন ফিল্‌ডিং, টম্ এবং ব্লিফিল চরিত্রে এবং শেষ

পর্যন্ত ভিলেনের পরাজয় ঘটল। এই উপন্যাসে অলওয়ার্থি, স্কোয়াব ওয়েস্টার্ন, লেডি বেল্লাস্টন, লর্ড কেল্লামাব পারট্রিজ, মলি সিগ্রিম প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সমাজের আলোক ও অন্ধকারের দিকগুলিকে উদ্ভাসিত করেছে।

ফিল্ডিং-এর উপন্যাস যে শিল্পপথ রচনা করল পরবর্তী তারই পথিক ইংরেজী সাহিত্যের স্মলেট, ডিকেন্স্ ও থ্যাকারে।

এইভাবে ইংরেজী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা হল। আঠারোর শতকের নাগরিক সমাজ, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, প্রাটেসটান্ট ধর্মমত, পিউরিটানবাদ প্রভৃতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক চেতনা, মানবিকতা অনিবার্যভাবেই এসেছিল। এই নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ যে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেই অর্থনৈতিক কাঠামো এর পূর্বের শতকে মাথা তুলে দাঁড়ায় নি। সেজন্য উপন্যাস পূর্বে সম্ভব হয় নি।

॥ ফরাসী সাহিত্যে ॥

ফরাসী কথাসাহিত্য যে ইংরেজী কথাসাহিত্যের মতো স্বতন্ত্র ভাবে দেখা দেয় নি তার কারণ ইংলণ্ডে আঠারোর শতকের প্রথমেই যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে রূপান্তর ঘটেছে ফ্রান্সে সেই পর্যায় আরম্ভ হতে অপেক্ষাকৃতভাবে দেরি হয়েছে। ফরাসী উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে স্তাঁদাল এবং বালজাক-এর রচনাতেই শক্তি ও পূর্ণাঙ্গ অবয়ব লাভ করেছে। কিন্তু স্তাদাল ও বালজাক দুজনেই এসেছেন ১৭৮৯-এর রক্তক্ষয় বিপ্লবের পর। ইংলণ্ডের ১৬৮৮-র 'মহৎ বিপ্লবে'র (Glorious Revolution) পরই নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ ক্ষমতাশালী হতে থাকে। কিন্তু তার ঠিক এক শতাব্দী পরে অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হবার পরেই ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজ সমাজে যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্তাঁদাল এবং বালজাকের জীবন ও সাহিত্য তারই সাক্ষ্যবহ।

ফ্রাসোঁয়া র‍্যাবলে-র কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রেনেসাঁস-

এর জীবনসম্ভোগ, শক্তি ও মনীষা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তিনিই মধ্যযুগীয়তা থেকে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটান। আঠারোর শতকে ফরাসী কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম মারিভো (১৬৮৮-১৭৬৩)। যে অসম্পূর্ণ বইটি তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে তার নাম 'মারিয়ান'। মারিভো নাট্যকার হয়ে পরে উপন্যাসের পথে এসেছিলেন। তিনি সাংবাদিকও ছিলেন এবং তিনি অ্যাডিসন-এর 'স্পেকটেটর' পত্রিকার নাম ও রীতি অনুকরণ করেছিলেন তাঁর 'লে স্পেকটেটর' পত্রিকায় (১৭২২-২৩)। সাংবাদিক, ব্যঙ্গরসিক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, এই চতুরঙ্গ রূপসমন্বয় মারিভোকে সে যুগের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব দিয়েছে।

বাপ-মা-হারানো মেয়ে মারিয়ান পনেরো বছর বয়সে প্যারীতে এল তার কোনও সম্পন্ন আত্মীয়ের খোঁজে। যে মহিলার সঙ্গে সে প্যারীতে এসেছিল, তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। মেয়েটি আবার আশ্রয় হারাল। বন্ধুস্বজনহীন একটি সুন্দরী কিশোরী ফরাসী দেশের রাজধানীতে একেবারে একা। অকস্মাৎ একজন বৃদ্ধ ধনী উদারপ্রাণ ভদ্রলোকের সাহায্য সে পেল। তাঁর নাম মসিয়েঁ দ্য ক্লিমল। অবশ্য পরে জানা গেল তিনি উপকার করেন মুখ্যত সুন্দরী মেয়েদের। মারিয়ান শেষে একটি দোকানে কাজ পেল। সেখানে ক্লিমল লাগিয়ে দিলেন আড়কাঠি শ্রীমতী দ্যুতুরকে। শ্রীমতী দ্যুতুর মসিয়েঁ ক্লিমলের নানা উপহার এনে দিত মারিয়ানকে, জানাত এতে কোনও দোষ নেই বা দায় নেই। একদিন চার্চ থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে মারিয়ানের পায়ে আঘাত লাগল এবং এই সময়ে সেখানে আবির্ভাব ঘটল তরুণ ভ্যালভিল-এর। সে মসিয়েঁ ক্লিমল-এর ভাগিনেয়। শেষে বৃদ্ধ ও তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সব প্রলোভনময় প্রতিশ্রুতি মারিয়ান তুচ্ছ করল, ফিরিয়ে দিল সব উপহার, চলে গেল চার্চের শরণ নিয়ে। মৃত্যুকালে মসিয়েঁ ক্ষোভে অনুতাপে দোষ

স্বীকার করলেন, মারিয়ানের জন্য রেখে গেলেন কিছু সম্পদ। তখন মারিয়ানের সঙ্গে ভ্যালভিল-এর বিয়ের কোনো বাধা রইল না, কেননা তার মায়ের অমত ছিল না। তবে তার পরিবারের অন্যান্যদের মত ছিল না। কিন্তু আসলে ভ্যালভিল একটি ইংরেজ মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। তাব আর মারিয়ানের দিকে দৃষ্টি ছিল না।

এই মাবিয়ান চরিত্রে বিচার্ডসনের 'পামেলা'-'ক্লারিশা' ও টমাস হার্ডির 'টেস্'-এর পূর্বাভাস ফুটেছে।

মাবিভোব জন্ম প্যারী নগবে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘবে। তাঁদের বংশেব অনেকে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নাগবিকেব মন, মধ্যবিত্তের দৃষ্টি, সাংবাদিকেব বাস্তবতা এবং সংবেদনশীল শিল্পীব হৃদয়াবেগ মাবিভোর ছিল। প্যারীর বিভিন্ন সালোঁ-তে তিনি মহিলাদের সঙ্গে যে বৈঠক বসাতেন তার থেকে বোধ কবি নারীমনের রহস্য অনেক জেনেছিলেন।

ল্যসাজ (Lesage ১৬৬৮-১৭৪৭) এই সময়েব অন্যতম খ্যাতনামা কথাকাব। তাঁর 'জিল ব্লা' (Gil Blas de Santillane) সাবা পৃথিবীব লোক পড়েছে, এমনকি আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ নামটিব উল্লেখ কবে গেছেন। এই উপন্যাসটি যদিও স্পেনীয় পিকারেস্ক্ উপন্যাসের অর্থাৎ 'ডন কুইকজোট'-এর আদর্শে গড়া, তবুও বঙ্গে ও ব্যঙ্গে আঠাবোব শতকের ফবাসী জীবনের বাস্তব রূপ এর মধ্যে ফুটেছে। ল্যসাজ মধ্যবিত্ত পবিবাব থেকে এসেছিলেন এবং প্যারীতেই বাস কবেছেন, তবে শুধুমাত্র নিজের কলমের জোরেই জীবন ধাবণ কবেছেন। তাঁব শিল্পদৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টিই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনিও নাটক বচনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছেন।

প্রেভো (Prevost—১৬৯৭-১৭৬৩) মাবিভোর সমকালীন। তাঁর মানো লেস্কো (Manon Lescaut) সবচেয়ে বিখ্যাত বই। তাঁর জীবন বিচিত্র। তিনি জেসুইটদের দ্বারা পালিত হয়েছিলেন,

দারিদ্র্য ভোগ করেছিলেন। কিছুকাল পাদ্রির জীবন কাটিয়ে সৈনিক হয়ে যান। চার্চের ভয়ে শেষে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন ইংলণ্ডে, তারপর হল্যাণ্ডে। সাময়িক পত্রিকা পরিচালনাও করেছিলেন তিনি। রিচার্ডসনের 'পামেলা'-র অনুবাদ তিনি করেন ১৬৫২-এ, তারপর 'ক্লারিশা'র অনুবাদ তিনি করেছিলেন। মধ্যে তিনি জার্মেনি ও বেলজিয়মও ঘুরে আসেন। জীবনে বহু দেশ ভ্রমণ, স্বদেশে সমাজ ও চার্চের কাছ থেকে নানাবিধ নির্যাতন লাভ, সাংবাদিকতা বৃত্তি বরণ তাঁকে ঔপন্যাসিক হবার পক্ষে বহুলভাবে সহায়তা করেছে। তাঁর বাস্তবদৃষ্টি ও চরিত্র তাঁকে আজও মহনীয় কথাকার করে রেখেছে। তিনি ডেফো রিচার্ডসন অবশ্যই পড়েছিলেন, ফিলডিং-এর বইও তার অনধীত ছিল না।

কাজেই দেখা যায় এঁরা সকলেই নাট্যকার ছিলেন এবং সকলেই সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত এবং নাগরিক সমাজের লোক। 'মারিয়ান' যদি 'পামেলা' পর্যায়ের তাহলে 'জিল ব্লা' পড়বে 'রবিনসন ক্রুশো' বা 'জোসেফ অ্যানড্রুস'-এর পর্যায়ে। এই সময়েই দেখা দিলেন মনটেসকু, দিদেরো, ভলতেয়র, রুশো ফরাসী বিপ্লবের অমর চিন্তানায়কেরা। মনটেসকু (১৬৮৯-১৭৫৫) সমকালীন ফরাসী রাষ্ট্রের ও সমাজের অত্যাচারী ও শোষণকারী দিকগুলির বিরুদ্ধে খড়্গপাণি হয়ে মুক্তবুদ্ধি ও উন্নত রাষ্ট্রাদর্শের পক্ষে দাঁড়ালেন। ১৭১৫-এ মারা গেলেন চতুর্দশ লুই। আর ১৭৪৮এ বার হল মনটেসকুর যুগান্তকারী বিপ্লবী গ্রন্থ : The Spirit of the Laws। স্বৈরতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের নিপুণ বিচার তিনি করলেন—সমাজ ও মানুষের মধ্যের সম্বন্ধকে নতুন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলেন (এই ১৭৪৮-এর একশো বছর পরে আর-একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক লিখলেন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো')। ১৭৪৮-এর চল্লিশ বছর পরে ফরাসী বিপ্লবের বহ্নি জ্বলল, কিন্তু সেই বহ্নির মূল নিহিত ছিল মনটেসকুর

চিন্তাধারায়, তাঁর বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ ও মানবতাবাদী দৃষ্টিতে। রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র তাঁর কাছে প্রবল আঘাত পেয়েছে। সেই আঘাতই বুঝি আত্মপ্রকাশ করল বাস্‌তিল-এর পতনে। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে এনসাইক্লোপিডিস্টদের নাম। যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে, প্রচলিত ও প্রথাগত সংস্কার-মুক্তিতে এই বুদ্ধিজীবী বিপ্লবীদের দান অসামান্য। ভলতেয়র মনটেসকু, দিদেরো, তুর্গো, রুশো ও অন্যান্য মনীষীরা এনসাইক্লোপিডিয়া রচনায় ব্রতী হলেন। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও যাজকতন্ত্র সেদিন ক্রুদ্ধ সন্ত্রস্ত হল স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিবাদের প্রসারে—ধর্মমোহলোপের এই পদক্ষেপে।

ভলতেয়র (১৬৯৮-১৭৭৮) প্রকৃতপক্ষে ছদ্মনাম। তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, পড়েছিলেন পাদ্রিদের স্কুলে। যৌবনের স্বাধীন চিন্তা ও বিদ্রোহী মন একদা তাঁকে নিয়ে গেলে বাস্‌তিল-এর কারাগারে, অবশ্য স্বল্প কালের জন্য। তাঁর 'কঁদিদ' (Candide) বার হয় বার্ধক্যে, ১৭৫৯-এ। উপন্যাস হিসেবে এই বইখানিই ভলতেয়রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার ব্যঙ্গ এই উপন্যাসে ফেটে পড়ছে। যদিও শিল্পরূপের দিক থেকে প্রশংসার দাবি করতে পারে না।

ভলতেয়র 'কঁদিদ' (Candide) উপন্যাসকে সারভেন্টিস্‌-এর 'ডন কুইকজোট'-এর ছকে যেন বেঁধেছেন। নায়ক কঁদিদ, নায়িকা ক্যুনেগোঁদ এবং কঁদিদের শিক্ষক জর্মান দার্শনিক লিবনিজপন্থী পঁগ্লজ যেন ডন কুইকজোট, ডালসিনিয়া এবং সাঙ্গোপাঙ্গার প্রতিরূপ। 'ডন কুইকজোট'-এ মধ্যযুগীয়তা, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগীয় রোমান্‌স্‌-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক বিদ্রোহ আছে। 'কঁদিদ'-এ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে এই আখ্যানের পটভূমিকা রূপে দেখানো হয়েছে। রোমান্‌স্‌, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, শাসনতন্ত্র সবকিছু এই গ্রন্থে ব্যঙ্গশরবিদ্ধ হয়েছে। কঁদিদ, পঁগ্লজ ও ক্যুনেগোঁদের জীবনে বিপদের পর বিপদ এবং বিপদ থেকে উত্তীর্ণ

হওয়ার কাহিনী এই উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ। কিন্তু ‘কঁদিদ’ তো শুধু অ্যাডভেনচার-উপন্যাস নয়, বিদ্রূপের শরসজ্জিত সামাজিক উপন্যাস বা Social Satire। তাই ভলতেয়রের হাসিতে তীক্ষ্ণতা আছে, সহানুভূতির বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই।

দিদেরো এনসাইক্লোপিডিয়া সম্পাদন করেছিলেন কিন্তু ভলতেয়র ও রুশোর মতো উপন্যাসও লিখেছিলেন। তিনি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হলেও তাঁব বাবা ব্যাবসা কবতেন ছুবি-কাঁটা যন্ত্রপাতিব। তিনিও প্যারীতে লেখাপড়া শিখেছিলেন। নাগরিক, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল মনের প্রকাশ তাঁর রচনাব সর্বত্র। সনাতনী রক্ষণশীল চিন্তাধারাব মূলে তিনি কুঠাবাঘাত কবেছেন। তাঁব La Religens উপন্যাসটির কাহিনী আলোচনা কবা যাক। একটি সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছোট মেয়ে সুজান। বড হওযাব সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পাবে সে যেন এই সংসাবের আপদবিশেষ। কেননা তাব বোনেদেব সবার প্রচুর টাকাপযসা দিযে বিযে হল কিন্তু তাকে বলা হল যে তাকে নিতেই হবে উপাসিকার (Nun) জীবন। সে সজোবে অস্বীকাব করেছে এই মরুময় জীবন মেনে নিতে কিন্তু শেযে তাব মা স্বীকার করেছেন যে সুজান তাঁর অবৈধ সন্তান। ক্ষোভে, মর্মান্তিক বেদনায সুজান তখন মেনে নিযেছে উপাসিকাব জীবন। এই মঠ-জীবনে সে লাভ কবেছে মিথ্যা অপবাদ, নিষ্ঠুব লাঞ্ছনা। শেষ পর্যন্ত সে বহু চেষ্টায মঠান্তরে স্থানান্তবিত হবাব অনুমতি পেল। কিন্তু সেখানেও তার নিস্তাব ছিল না। অবশ্য শেযে তাব সবল পবিত্র মনেব জয় হয়েছে। যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে দিদেবোব ক্ষমাহীন আক্রমণ এবং ব্যক্তিমানুষেব প্রতি সহানুভূতি দিদেবোব রচনাকে মহান কবেছে। দিদেরো বেকন-লকের শিষ্য ছিলেন কিন্তু রিচার্ডসন ও স্টার্ন-এব প্রভাবও তাঁর উপন্যাসে লক্ষণীয।

রুশো (১৭১২-১৭৭৮) জাত ফরাসী নন ভলতেয়র বা দিদেরোর মতো। তিনি জেনেভার মানুষ। যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বোক্ত সহকর্মীদের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি রীতিগত বিদ্যালয়শিক্ষায়

শিক্ষিত হন নি। তাঁর পূর্বোক্ত সহকর্মিদ্বয় প্যারীর নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, বুদ্ধিজীবী সমাজের মানুষ। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র বা যাজকতন্ত্র—কোনো একটির অন্তর্ভূত না হলেও প্যারীর 'সালো'গুলিতে তাঁরা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৈঠক জমাতেন। কিন্তু রুশো অ-সামাজিক পোষ-না-মানা আরণ্য মানুষ হিসাবেই চিরকাল থেকে গেলেন।

আঠারোর শতকের সমকালীন যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের সর্বাত্মক প্রাধান্যের যুগে রুশো নাগরিক জীবনবোধ ও সামাজিক মূল্য-বোধের পরিবর্তে ঘোষণা করলেন তাঁর 'প্রকৃতিবাদ'। তাঁর কল্পিত প্রকৃতি-স্বর্গে অসাম্য নেই, শোষণ নেই, স্বৈরাচার নেই, নাগরিক ও 'ভদ্র' সমাজের পাপ নেই। আছে পবিত্র প্রকৃতি, সরল হৃদয়ভাব। কাজেই প্রদীপ্ত বুদ্ধিবাদের পরিবর্তে তিনি ঘোষণা করলেন মানুষের আদিম সরল প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির জয়গান। বিবাহের ক্ষেত্রেও তিনি সামাজিক ও প্রচলিত ধর্মপ্রথার বিরোধিতা করলেন। তাঁর 'লা নুভেল এলইজ' উপন্যাসে এই তত্ত্ব প্রচার করলেন। যেমন তাঁর প্রকৃতি-অনুগ শিক্ষাদর্শ প্রচার করলেন 'এমিল'-এ। রুশোর উপন্যাসের চেয়ে রুশোর 'কন্‌ফেশন্‌' বা আত্মচরিত সমগ্র পৃথিবীকে চকিত করেছে। তিনি তাঁর জীবনের পাপ ও পুণ্য উভয়কেই অনাবৃত রূপে প্রকাশ করেছেন। রুশোর প্রকৃতিবাদ ও ব্যক্তিহৃদয়ের নির্মোক উন্মোচন রোমান্টিকতার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছে। তাই রুশোর মধ্যে যেন বিংশ শতকের ডি. এইচ. লরেন্স-এর পূর্বাভাস। যে বাস্তবধর্মিতা, ব্যক্তিবিদ্রোহ, মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক রূপান্তরী সম্পর্ক, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সমাজসমীক্ষা এবং তার সঙ্গে হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ--যা আমরা উনবিংশ শতকের ফরাসী সাহিত্যে স্তাঁদাল, বালজাক, হুগো, ফ্লোব্যার প্রভৃতির রচনায় পাই—তার সূচনা ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কদের শুধু যুক্তিবাদী রচনায় নয়, তাঁদের উপন্যাসেও বিদ্যমান। ১৭৮৯-এ বিপ্লবের দাবানল জ্বলল। মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর এবং পড়ুয়া সমাজের যে গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণ প্রয়োজন ছিল উপন্যাসেব—বাস্তবধর্মী, সামাজিক ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যধর্মী উপন্যাসের—সেটা ঘটল বিপ্লবের পর থেকে। বিপ্লব-পূর্ব যুগে এই সম্প্রসারণ ঘটে নি।

উনিশের শতকে ফরাসী উপন্যাসে 'মনস্তাত্ত্বিক-বাস্তবতা'র প্রতিষ্ঠা করলেন স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪১)। তাঁব ছদ্মলেখক-নামেই শেষ পর্যন্ত তিনি পরিচিত হলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেন বিপ্লবের বহ্নিসঞ্জাত। তিনি ঐতিহ্যবাদকে পরিহাস করলেন, ক্লাসিক্‌স্‌কে উড়িয়ে দিলেন, বাঁধাধবা শিল্পরীতি মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। বস্তুহীন রোমান্তিকতা ও কঠোর ক্লাসিকাল্‌-দৃষ্টি—দুয়ের বিরুদ্ধেই তিনি ছিলেন, তাঁর সাহিত্যপথযাত্রার একমাত্র ধ্রুবতারা জীবনধর্মিতা। বইয়ের শুরুতেই তিনি উৎকলন কবেছেন: 'Truth—Truth in all her rugged harshness'। তাঁর বিদ্রোহী ও স্বাধীন দৃষ্টিব উদ্‌ভাসন তাঁর উপন্যাসে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব জীবনবস সঞ্চার করেছে। ১৮৩০-এ যখন তাঁর Le Rouge et le nair (ইংরেজী অনুবাদে নাম Scarlet and Black) বার হল তখন ফ্রান্সেব রাজনৈতিক ইতিহাসে বাজতন্ত্রী ও উদারমতপন্থীদের মধ্যে সংঘাত চলছে। যাজকতন্ত্র রাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। স্তাঁদাল প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ছিলেন, কাজেই তিনি রাজতন্ত্রেব বিপক্ষে এবং সাধারণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তাব চেয়েও বড়ো কথা, ঔপন্যাসিক হিসাবে কাহিনীবিন্যাসে ও চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি দক্ষ শিল্পী ছিলেন। সমকালীন ফরাসী রাষ্ট্র, চার্চ ও সমাজের ব্যাপক ও সত্যনিষ্ঠ রূপায়ণ তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরবর্তী কালের ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান, অষ্টাদশ লুইয়ের রাজ্যকালের ঐতিহাসিক সনদ, রাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রীদের দ্বন্দ্ব, দশম চার্লসের (১৮২৪-৩০) সরকারের সাহিত্য ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কড়া 'সেনসর' প্রথা জারি ও শাস্তিদান, রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন মহলের চক্রান্ত—সবই

স্তাঁদালের গ্রন্থের ভিত্তিভূমিতে স্থান পেয়েছে। দশম চার্লসের রাজত্বকালে চার্চ নিরীশ্বরবাদী প্রগতিপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল। তারা পুলিশের গুপ্তচর রূপে কাজ করত। জেস্যুইট পাদ্রীরা রাজতন্ত্রের মহিমায় জয়গান করে বেড়াত। জ্যানসেনিস্ট্‌রা কিন্তু ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিকে জড়িত করতে চায় নি, ব্যক্তিজীবনেও তারা পিউরিটান মতাদর্শকে বড়ো করে দেখেছিল। সেজন্য স্তাঁদাল যে দুটি সৎ যাজকের চিত্র এঁকেছেন তারা জ্যানসেনিস্ট্। কিন্তু এই তথ্যপুঞ্জ দুর্বহ ভারস্বরূপ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর উপন্যাসে রাজনীতি প্রভৃতির স্থান পাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, দেখতে হবে তারা 'জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে'। স্তাঁদাল-এর গ্রন্থে সমকালীন ইতিহাসেব স্রোত ও মানবজীবনধারার গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম ঘটেছে।

কিন্তু সমকালীন সমাজের রূপায়ণের জন্যই তিনি মহান শিল্পী নন। জীবনের যে-খরস্রোতা নদী বিচিত্র গতিতে পথরচনা করে চলে, হৃদয়ের যে উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলি কখনও সুপ্ত কখনও বা ঊর্ধ্বশিখ—'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে'র নিপুণ কথাকার স্তাঁদাল। জুলিয়েঁ সরেল, মাদাম রেনল এবং .মাতিল্‌দ্—এই তিনটি চরিত্রই মুখ্য আর তার সঙ্গে অসংখ্য চরিত্র এ ঘটনার স্রোতে বহে চলেছে। যে স্রোতের সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আমরা চকিত, বিস্মিত, কখনও শঙ্কিত, তৃপ্তও।

স্তাঁদাল তাঁর ঔপন্যাসিক-ধর্ম সম্পর্কে লিখেছেন :

"Why, my good sir, a novel is a mirror journeying down the high road. Sometimes it reflects to your view the azure blue of heaven, sometimes the mire in the puddles on the road below. And the man who carries the mirror in his back will be accused by you of being immoral. His mirror reflects the mire and you blame the mirror. Blame rather the high road on which the puddle

lies and still more the inspector of roads and highways who lets the water stand there and the puddle form.

(দ্বিতীয় খণ্ড, দি ইটালিয়ন অপেরা অধ্যায়)।

সূর্যস্নাত আকাশের নীল এবং কর্দমাক্ত পঙ্কিলতা—দুই-ই প্রতিবিম্বিত হবে শিল্পীর দর্পণে। মনোবিশ্লেষণসমৃদ্ধ জীবনধর্মিতার জন্যই Scarlet and Black কালজয়ী হয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনী একটি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত। জুলিয়েঁ-র মতো বের্তে নামে একটি কর্মকারের ছেলের জীবনে মাদাম রেনল এবং মাতিল্‌দ্-এর মতো দুটি সম্ভ্রান্ত নারী এসেছিল। সে গুলি করেছিল তাঁর পূর্ব মনিবের পত্নীকে চার্চে উপাসনার সময় এবং শেষে তার ফাঁসি হয়েছিল। স্তাঁদাল ঐ কাহিনীতে বুঝি দেখেছিলেন অভিজাত সমাজের হাতে সাধারণ সমাজের একটি মানুষের শিরশ্ছেদ। তারপর ঐ কাহিনীটির কাঠামোকে অবলম্বন করে রচনা করলেন জুলিয়েঁ সরেল-এর অপূর্ব আখ্যান। বের্তে জানিয়েছিল তাকে প্ররোচনা বা provocation দেওয়া হয়েছিল বলেই সে গুলি করেছিল। কিন্তু জুলিয়েঁ উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করেছে। তথ্যের গণ্ডী অতিক্রম করে স্তাঁদালের নায়ক শিল্পের 'সত্য' হয়ে উঠেছে। জুলিয়েঁ সরেল সমাজের নিম্নবিত্ত ঘর থেকে এসেছিল, তারই জীবনের দুটি অধ্যায় Scarlet and Black। তার জীবনের আদি পর্বে সন্তানবতী মাদাম রেনল ও অন্ত্য পর্বে কুমারী মাতিল্‌দ্। সমাজের সম্ভ্রান্ত স্তরের এই দুটি নারী তাকে তাদের বিষামৃতকামনার পাত্র করেছে, সে-ও আক্রোশবশে তাদের তার কামনার বহ্নিতে পুড়িয়েছে। এই কামনা-বহ্নির সুনিপুণ, অনাবৃত লেলিহান অথচ সংযত রূপ স্তাঁদাল এঁকেছেন। চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে স্তাঁদালের এই বইখানি সে যুগের পক্ষে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। স্তাঁদাল দেখিয়েছেন মাদাম রেনল তার গবেট স্বামীতে আর নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্য সংসারজীবনে তৃপ্ত ছিল না।

তাই জুলিয়েঁকে সে আকর্ষণ করেছিল। অন্যদিকে মাতিল্দ্ তার মায়ের ড্রইংরুমবিহারী যুবকদের মধ্যে পায় নি সেই 'বীর' মানুষকে যে তাকে সবলে ছিনিয়ে নিতে পারে দুর্দমনীয় শক্তিতে। মাতিল্দ্-এর বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে যে তীব্র জীবনপিপাসা ছিল জুলিয়েঁ সেই পিপাসাকে তৃপ্ত করেছে। জুলিয়েঁ-ও তার জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে, কাম্যপ্রতিষ্ঠাব সঙ্গে বাস্তবজীবনে কর্ম-জীবনে লব্ধ ব্যর্থতার মিল খুঁজে পায় নি। সেই অপমানে, ব্যর্থতায় ক্ষোভে গর্জে উঠে সে সম্ভ্রান্ত সমাজেব দুটি নারীর জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। স্তাঁদালের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গেও এই উপন্যাসের জুলিয়েঁর প্রণয়বৃত্তান্তের মিল আছে। তাই তিনি নিজেই বলতেন : Julien is myself। আর বলতেন তাঁর উপন্যাসের আদর হবে ১৮৮০-তে অর্থাৎ বইটি লেখার পঞ্চাশ বছর পরে। সে কথাও সত্য হয়েছিল।

স্তাঁদাল-এব সমকালীন বালজাক ও হুগোর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্তাঁদাল-এর Scarlet and Black বার হবার তিন-চার বছব পবে প্রকাশিত হল বালজাক-এর Eugenie Grandet এবং Old Goriot। বালজাকও (১৭৯৯-১৮৫০) এসেছিলেন 'বুর্জোয়া' স্তর থেকে। (শব্দটির মৌল অর্থ এখন বাঙলায় তলিয়ে গেছে, বুর্জোয়া বলতে লোকে ভুল করে কেবলমাত্র শোষক পুঁজিবাদী সমাজ বোঝে)। তিনি রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্রের কেউ নন, মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষ। তিনি জন্মেছিলেন তুরিন-এ—র‍্যাবলে-র জন্ম যেখানে। র‍্যাবলের মানবিকতা, জীবনসম্ভোগ যেন উত্তরাধিকাররূপে তাঁর জীবনে ও শিল্পে রূপায়িত। ছাত্রজীবনে আইন অধ্যয়ন এবং কর্মজীবনে ছাপাখানার ব্যাবসা, সলিসিটরের কেরানী-গিরিও তিনি করেছেন। কাজেই সমাজকে তিনি উপর থেকে দেখেন নি, ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতায় জেনেছেন। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে কল্পনাবিলাসী দৃষ্টি নিয়ে নয়, তীক্ষ্ণধী পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তিনি সমাজের সর্বস্তরকে দেখেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে

চিত্রিত সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্র এত জীবন্ত। বালজাকের রচনায় রোমান্তিকতা ও বাস্তবধর্মিতা মিশে গেছে। Eugenie Grandet-এর চরিত্রগুলির প্রত্যেকটির মধ্যের মৌলধর্মটি বালজাক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। কর্তা গ্রাদেঁ-র স্বর্ণসঞ্চয়-কামনা, মাদাম গ্রাদেঁর ঈশ্বরবিশ্বাস, ইউজেনের চার্লস্-এর প্রতি গভীর অনুরাগ, চার্লস্-এর অর্থোপার্জনের পথে সামাজিক মর্যাদার স্বপ্ন। এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ—নায়িকা ইউজেনের জীবনের ট্র্যাজেডি। বালজাক দেখেছিলেন তাঁর সমকালীন সমাজে অর্থকৌলীন্যই প্রধান কথা। টাকা থাকলে এবং ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে সেখানে যে-কোনো লোক যে-কোনো পদ পেতে পারত। ক্ষমতালোলুপতার দ্বন্দ্বে টাকাই ছিল একমাত্র নিয়ামক। ইউজেনের বাবা কিভাবে শুধু টাকা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, তাঁর একমাত্র মেয়ে তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ইউজেনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার জন্য প্রতিবেশী পরিবারদের মধ্যে হাস্যকর প্রতিযোগিতা। তারপর এলো প্যারী থেকে ইউজেনের কাকার একমাত্র ছেলে সুদর্শন ও ধনী-পুত্র। ইউজেনের বাবার নজর পড়ল। কিন্তু তাঁর ভাইয়ের চিঠি পড়ে জানলেন যে দেনার দায়ে সম্মান রক্ষার জন্য মাথায় গুলি মেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর ভাইপো চার্লস্ আর ধনী নয়, সম্ভ্রান্ত নয়, কপর্দকহীন মাত্র। সে এইবার যাবে ঈস্ট ইণ্ডিজে কাজ খুঁজতে। সে গেলও। কিন্তু যাবার আগের কয়েকটি দুঃখের রাত্রে পেল ইউজেনের প্রেম-স্নিগ্ধ নয়নের আলো, পেল সপ্রেম চুম্বন। ইউজেন তাকে দিল তার পিতার কাছ থেকে প্রতি জন্মদিনে পাওয়া দুর্মূল্য মোহর, দিল নবজীবনের পথযাত্রার পাথেয়। ইউজেন জেনেছিল চার্লস্ আনেৎ নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু তবুও সে চার্লস্-এর কথায়, প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করল—সে অপেক্ষা করে থাকবে। কিন্তু চার্লস্ তাকে ভুলে গেল। ঈস্ট ইণ্ডিজের উর্বর ক্ষেত্রে সে স্বর্ণ

আহরণ করতে লাগল। ভালো-মন্দ সৎ-অসৎ পথেব বিচারবোধ হাওয়ায় উড়ে গেল। ইউজেনের প্রেমস্নিগ্ধ নয়নেব আলো অস্ত গেল। সেখানে কৃষ্ণ শ্বেত পীত বর্ণের রমণীকুল তার দেহের ক্ষুধার পাত্র হল। স্বর্ণক্ষুধা আর তার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা লাভের স্বপ্ন চার্লস্‌কে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার কাছে তুচ্ছ হল একটি মেয়ের শিশিরশুভ্র হৃদয়। কিন্তু গ্রামের সেই মেয়েটি পথ চেয়ে বসে রইল। একদিন বলল তার পরিচারিকাকে: How can it be Nanon that he has not written to me once in seven years?" আর তাব পর তাব কৃপণ-ধনী বাবা একদিন জানল ইউজেনেব সোনাব মোহরগুলি হারিয়ে গেছে। পিতা-পুত্রীতে সংঘাত বাধল। ইউজেন পিতাব ছুরিকেও ভয় করল না, কেড়ে নিতে দিল না বাকসেব মোহর। জানিয়ে দিল চার্লস্‌কে তার সাহায্যেব কথা। তাবপর মা-বাবা মারা গেলেন। ইউজেন একা। চার্লস্ ঈস্ট ইণ্ডিজ থেকে ফেরার পথে প্যারীব সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হল, চোখ রাখল তাঁদের মেয়েটিব উপব। টাকাব জোর থাকায় তার বংশমর্যাদাব বাধা আর বইল না। চার্লস্ অস্বীকাব কবল মৃত পিতাব ঋণ, এমনকি নিজেদের বংশপদবী পবিত্যাগ করে অভিজাত শ্বশুরবংশের পদবী নিল। বিয়েতে বাধা না পড়লেও তবু একটু বাধা ছিল। দেউলিয়া মৃত পিতার ঋণেব ব্যাপার, দেনার দায়ে তাঁর আত্মহত্যার ঘটনা। ইউজেন ইতিমধ্যে চার্লস্-এর কাছ থেকে চিঠি পেল—জীবনের প্রথম চিঠি, জীবনের প্রথম প্রেমের কাছ থেকে। চার্লস্ লিখেছে। কিন্তু কি সম্বোধন—My dear cousin! লিখেছে:

> আমি কোনদিন ভুলি নি তোমাকে। বিচিত্র পথে ঘুরেছি কিন্তু মনে পড়েছে সেই ছোট্ট কাঠের বেঞ্চ—যেখানে বসে বলেছিলাম আমরা চিরকাল ভালোবাসব—কিন্তু এখন আমার বিবাহ স্থির হয়েছে, অভিজ্ঞতায় জেনেছি বিবাহের ক্ষেত্রে প্রেমের কথা স্বপ্ন মাত্র। তা ছাড়া সমাজের সব বিধিনির্দেশ মেনে নেওয়াই

ভালো।—আমরা দুজন দুভাবে মানুষ হয়েছি। দুজনের রুচি, মত পৃথক।—আমি বড়ো ঘরে বিয়ে করছি, সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য, আদৌ মেয়েটির জন্য নয়। আমার সন্তানদের ভাবী পদমর্যাদার কথাও ভাবতে হবে।—মনে হয় তুমিও দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে আমাদের সেই ছেলেমানুষি প্রেম ভুলে গেছ। আমি অবশ্য তোমার সহৃদয় দানের কথা ভুলি নি, তাই এই চেক পাঠাচ্ছি।

এই চিঠি ইউজেনের জীবনে চরম আঘাত হানল। সে বলল : 'My mother was right, one can only suffer and die'। তারপর নিল মহান প্রতিশোধ। শোধ করে দিল চার্লস্-এর পিতার দেনা। বিবাহ করল প্রতিবেশিপুত্র সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল : 'Swear to leave me free till end of my life and never to remind me of the rights which marriage would give you over me, and I am ready to marry you'। কিন্তু সে সুখও সইল না। তার স্বামীর নতুন পদোন্নতির এক সপ্তাহ পরে সে সহৃদয় স্বামীকে হারাল।—নিষ্প্রদীপ জীবনের বিষাদঘন অন্ধকারে সে দানে ও সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল। বৃদ্ধ গ্রাদেঁ, তার ভাই, চার্লস্ প্রভৃতির জীবনচিত্রণে সমকালীন অর্থনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব বালজাক দেখিয়েছেন, আর অন্যদিকে দেখিয়েছেন ফরাসী বিপ্লবের ফলে কি ভাবে আধা-শহুরে পারিবারিক জীবনের রূপান্তর ঘটেছে। পারিবারিক জীবনে পিতার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল বিপ্লব-পূর্বযুগে। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে শান্ত ইউজেনের বিদ্রোহ এই যুগের নারী-ব্যক্তিত্বের পরিচয়। বালজাক-এর এই উপন্যাসে সমকালীন সমাজ যেমন রূপায়িত তেমনি প্রেম ও প্রতারণা, স্বার্থ ও আত্মত্যাগ, লোভ ও মমতার বিচিত্র আলিম্পন লক্ষণীয়।

'ওলড গরিঅ' যেন শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়ার'-এর উনিশ-শতকীয় ফরাসী সংস্করণ। লীয়ারের মতোই কন্যাদের দ্বারা

প্রত্যাখ্যাত বৃদ্ধ গরিঅ। পিতৃস্নেহে তিনি বিলাসিনী নাগরিক কন্যাদ্বয়ের অন্যায় দাবি চোখ বুজে সহ্য করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন, প্রাণপণে অর্থসাহায্য করেছেন—শেষে মৃত্যুকে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু কবর দেবার সময় মেয়েরা আসবার সময় পায় নি। কয়েক মাসের ঘটনা নিয়ে বইখানি লেখা। ১৮১৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮২০-র ফেব্রুআরি অবধি। প্যারীতে মাদাম ডোকে-র বোর্ডিং হাউসকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের শুরু। মাদাম ডোকে-র বয়স হলেও তার নজর ছিল গরিঅ-র উপর। কারণ গরিঅ বহু অর্থের অধিকারী এই স্থির বিশ্বাস তার ছিল। গরিঅ যেই দামী ফ্ল্যাট থেকে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ার ফ্ল্যাটে ঘর বদল করতে লাগল ততই মাদাম ডোকে-র দৃষ্টির মোহ গেল ঘুচে। সে গরিঅকে প্রায় অপমানই করতে লাগল। এই বোর্ডিংএ ছিল ইউজেন দ্য রাসতীনাক, আইন ক্লাসের ছাত্র। তার চোখ দিয়েই বালজাক আমাদের দেখিয়েছেন প্যারীর অভিজাত সমাজের রূপ। দেখিয়েছেন টাকাই একমাত্র জাদুদণ্ড যার স্পর্শে কয়লা হীরা হতে পারে। গরিঅ-র দুই মেয়ে বাপের কাছ থেকে অহরহ টাকা চেয়েছে, বাপকে খুব ভালোবাসে এই ভান করেও টাকা নিয়েছে। গরিঅ মেয়েদের 'বাবা' ডাকটি শুনবার জন্য ব্যগ্র। সে তাদের সর্বস্ব দিয়েছে কিন্তু মেয়েরা গরিব বাপকে তাদের ছাদের তলায়ও দাঁড়াবার জায়গা দিতে রাজী হয় নি। বাপ তাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করে, তারা টাকার দরকার হলে মাদাম ডোকে-র বোর্ডিং-এ আসে, টাকাটি হস্তগত হলেই পালায়। দু বোনেরই টাকার দরকার,—তাদের বিলাসের, প্রমোদবিহারের, গোপন প্রণয়ের জন্য। সমাজের যুবকদের একের অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য। অবাধ জুয়াখেলার জন্য। তাই যখন প্রায় বিনা চিকিৎসায় গরিঅ মুমূর্ষু, সে ব্যাকুলভাবে দেখতে চাইল মেয়েদের। মেয়েদের খবর পাঠানো হল কিন্তু চাকর ফিরে এল, মেয়েরা এল না। গরিঅ বলল,

They are busy, they are sleeping, they will not come. I

knew it. You have to die to know what your children are. Ah ! my friend, do not marry, do not have children ! You give them life, they give you death in return. You bring them into the world and they push you from it Ah ! if I were rich, if I had kept my money, if I had not given it all to them, they would be here now, they would fawn on me and cover my cheeks with their kisses · But I have nothing. Money buys everything, even daughters. Oh my money ! Where has it gone ?

তবুও তার শুভকামনা বয়ে গেল মেয়েদের জন্য :

God would be unjust if he condemned them for their behaviour towards me.

গল্পাংশ এই। কিন্তু বোর্ডিং হাউসের অন্যান্য চরিত্রেরও ইতিহাস আছে আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল ভোতরিঁ (Vautrin)। সে একজন দাগী পুরোনো কয়েদী, সে পরিচয় গোপন করে আছে। তার কথাবার্তায় অ্যানার্কিস্ট বা নৈরাজ্যবাদী বৈপ্লবিক মতামত প্রকাশ পেয়েছে। তার মুখ দিয়ে বালজাক যেন সমাজ সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। সমাজের কৃত্রিম মুখোশ, ভদ্রতার আবরণের তলায় শিকার-সন্ধানের পালা, টাকার সর্বগ্রাসী প্রভুত্ব সবই ভোতরিঁ দেখেছে, জেনেছে, প্রকাশ করেছে। সে রাসতীন্যাককে বলেছে :

Paris you see is like a forest in the New World where a score of savage tribes, the Illinois, the Hurons struggle for existence : each group lives on what it can get by hunting throughout society. You are a hunter of millions : to capture them you employ snares, limed twigs, decoys. There are many ways of hunting. Some hunt heiresses, others catch their prey by shady financial transactions, some fish for souls, others sell their clients bound hand and foot.

The man who comes back with his game bag well-lined is welcomed, feted, received into good society.

বালজাক-এর যে দুখানি উপন্যাসের কথা বলা হল তারা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-সংকলন La Comedie humaine (The Human Comedy) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। স্যার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসের প্রভাব বালজাকের উপর অবশ্যই পড়েছিল কিন্তু স্কট ও বালজাকের জগৎ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক। স্কট লিখেছেন ঐতিহাসিক রোমান্স্, বালজাক লিখেছেন সমকালীন ইতিহাসের পটে বাস্তবধর্মী উপন্যাস (যদিও ফ্লোব্যার ও জোলার 'বাস্তবতা' থেকে বালজাকের বাস্তবধর্মিতা পৃথক)। স্তাঁদাল মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার দিক থেকে স্মরণীয় হয়েছেন কিন্তু বালজাকের দৃষ্টি মানুষের জীবনের ইতিহাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূত্র সন্ধান করেছে। বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ ও তথ্যনিপুণ উপস্থাপনা বালজাকের মানসভঙ্গিকেই প্রকাশ করেছে। এই বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বালজাকের পূর্বে আমরা দেখতে পাই না। তিনি উপন্যাসকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছেন, তার কারণ বালজাক ইতিহাসচর্চা, বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অভি-ব্যক্তিবাদের (Theory of Evolution) উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, সেজন্য ডারউইনের পূর্বসূরী লামার্ক-এর মতবাদ তাঁর ভালো লাগত। তাই তিনি তাঁর উপন্যাসের নরনারীকে যেন 'social species' রূপেই দেখেছেন। 'ওল্‌ড গরিঅ'-র প্রথম দিকে তিনি পাঠককে উদ্দেশ করে লিখেছেন—এই বই পড়তে পড়তে যখন বৃদ্ধ গরিঅ-র গোপন কথা জানবেন, আপনাদের খাওয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না বরং লেখককে অভিযুক্ত করবেন, কেননা লেখক তাঁর কল্পনাকে শূন্যে পাখা মেলতে দিয়েছেন। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, যে জীবননাট্য আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি তার কিছুই রোমান্স্ নয় বা মিথ্যাকল্পনা নয়। এখানে সবই সত্য —"All is true"—এত সত্য যে প্রত্যেক পরিবারই এই ট্যাজেডি

দেখতে পাওয়া যাবে, এই নাটকের সত্য প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যেই অনুভব করতে পারবেন। জীবনসত্যের প্রতি এই শিল্পনিষ্ঠাই বালজাক-এর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। শেক্‌স্‌পীয়ব লিখেছেন 'কিং লীয়াব'কে নিয়ে আর বালজাক লিখলেন একজন ব্যবসায়ীকে নিয়ে। বালজাক বলেছেন :

"My bourgeois novels are more tiagical than your tragic dramas"।

তাঁর এই দাবি অসঙ্গত নয়।

বালজাকেব উপন্যাস-সংকলন—La Comedie humaine পড়ে এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন মার্গারেট হার্কনেস্‌কে (এপ্রিল ১৮৮৮) : জোলা-ব চেয়ে বালজাক বাস্তবনিষ্ঠ শিল্পী হিসাবে অনেক বড়ো। ১৮১৫-র পব থেকে যে 'বুর্জোয়া' সমাজ নিজেকে ক্রমপ্রসাবিত কবে অভিজাততন্ত্রের উপব আঘাত দিয়েছে—সেই সময়কাব 'ফরাসী সমাজেব' ঐতিহাসিক বাস্তব ছবি তিনি একেব পব এক এঁকে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমাজে কি ভাবে হঠাৎ-ধনীদেব, সুদখোর মহাজনদেব প্রভাব বেড়েছে। তিনি আবও দেখিয়েছেন অভিজাত সমাজেব নাবীপুরুষেব ব্যভিচারী রূপ, দেখিয়েছেন সে সমাজে টাকা হলে সবকিছুই কেনা যায়। সমকালীন অর্থনৈতিক রূপান্তব এবং তাব খুঁটিনাটি বিষয়ও বালজাক পড়ে যত বেশি জানা যায়, ঐতিহাসিক বা অর্থনীতিবিদদেব বচনা পড়ে সে জ্ঞান হয় না। তিনি আবও লিখেছেন যে ব্যক্তিগত মতামতে বালজাক বিপাবলিকানদের সমর্থক ছিলেন না, তিনি ছিলেন লেজিটিমিস্ট বা নিয়মতন্ত্রী অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রেব বিবোধী। তাঁর সহানুভূতি ছিল সেই শ্রেণীব দিকে যার অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল এবং যাব পতন অনিবার্য। কিন্তু তবুও তিনি তাঁব বাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধীদের উজ্জ্বল কবে এঁকেছেন যাঁরা ঐ সময়ে (১৮৩০-৩৬) জনগণের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বালজাক দেখেছিলেন কাদের পতন আসন্ন, কাদের উত্থান অনিবার্য। সেখানে তিনি তাঁর শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে বাস্তবনিষ্ঠ শিল্পী।

১৭৮৯-এর মহান বিপ্লবের সময় ও পরে সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটল। অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা ছিল না মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই শক্তিকে অস্বীকার করবার। ১৮১৫-য় ওয়াটারলুতে নেপোলিয়নের পতনের কিছুকাল পরে অষ্টাদশ লুই-এর রাজতন্ত্রী সরকার ফিরে আসে। ১৮২৪-এ অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যু হয়। তার পর দশম চার্লস্-এর রাজত্বকালেই ঘটল ১৮৩০-এর দ্বিতীয় বিপ্লব। ছাত্র, মজুর সাংবাদিকেরাও এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। অন্যদিকে সমকালীন শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন ধরনের ধনী, ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিক ও শিল্পনিযুক্ত শ্রমিক দেখা দিল। জমিদারদের জায়গায় দেখা দিল মিলের ডিরেক্টর, চাষীর স্থলে এল মজুর। ১৭৮৯-এ জনতা বলতে চাষী ও কারিগর শ্রেণী বোঝাত কিন্তু ১৮১৫-১৮৪৮ কালপর্বে শিল্পবিপ্লবের ফলে 'সর্বহারা' শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। বাষ্পীয় এন্‌জিনের সংখ্যা এ সময়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজারে। শিল্পাঞ্চলে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ষাট লক্ষেরও বেশি। কিন্তু দৈনিক মজুরির আনুপাতিক গড়-পড়তা ছিল মাত্র ১.৭৮ ফ্রাঁ তেরো ঘণ্টা খাটুনির বিনিময়ে। শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার ছিল না, নোংরা অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে তারা মাথা গুঁজে থাকত। ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের দিন ভালো কাটলেও মজুরদের দিন গুজরান কঠিন ছিল। তাই ১৮৩০-এর বিপ্লবে শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণীর স্বপ্ন সফল হয় নি। তার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যাই হোক, এই সময়ে নগরকেন্দ্রিক শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিক সমাজ একদিকে পড়ুয়া সাধারণের (reading public) সংখ্যা বাড়াল, অন্য দিকে কথাসাহিত্যে তাদের জীবনচিত্র প্রকাশিত হতে লাগল। এ সময় সাধারণ শিক্ষার প্রসার হয়েছে, ছাপাখানা ও পত্র-পত্রিকারও প্রসার ঘটেছে। সমাজে উদারনীতি-ও বৈপ্লবিক চেতনা-সম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিককের প্রভাব ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উনিশের শতকের রোমান্তিক ভাবধারার কথাও বলা দরকার।

রোমান্তিকতার মধ্যে একটি বিদ্রোহের ধর্ম আছে। শেলি ও বায়রন উভয়ের মধ্যেই ফরাসী বিপ্লবের অনলশিখার স্পর্শ লেগেছিল। শেলির জীবনে বিদ্রোহের ভূমিকা সুস্পষ্ট : তিনি পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত নীতি ও ধারণাকে মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর ব্যক্তি প্রমিথিয়ুস যথার্থই—আনবাউণ্ড। শাসন- ও শোষণ-মুক্ত বিশ্বরাষ্ট্রের স্বপ্ন শেলির ছিল। বায়রনও স্বাধীনতার যজ্ঞের পুরোহিত —তিনি শেষ পর্যন্ত দুর্বল গ্রীসের পক্ষে যুদ্ধযাত্রার পথে ১৮২৪-এ আত্মদান করলেন। গ্যেটের রচনাবলী, তাঁর Sorrows of Werther এবং Faust রোমান্তিক মনোভঙ্গির প্রকাশক। ফ্রান্সে স্তাঁদাল, ভিক্তর হুগো, বালজাক এই বিদ্রোহী রোমান্তিক ভাবধারাকে স্বীকার করেছেন বিভিন্ন ভাবে। আঠারোর শতকের কঠোর যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবাদের পর উনিশের শতকের প্রথমার্ধে রোমান্তিক ভাবধারা বিচিত্র তরঙ্গে উদ্বেলিত হতে থাকে। ফলে দেখা দিল ব্যক্তিমানুষের বিদ্রোহ, মানুষের আত্মার উল্লাস। দেখা দিল সাধারণ মানুষের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি। ১৮১৫-র পর থেকে এই লক্ষণগুলি প্রবল হল। স্তাঁদাল রেসিন-এর চেয়ে শেক্স্পীয়রকেই উচ্চে তুলে ধরলেন। হুগোর মধ্যেও দেখা দিল ক্লাসিকাল ভাব, রীতি, ছন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। স্তাঁদাল তাঁর Scarlet and Black উপন্যাসে দেখালেন জুলিয়েঁ-র জীবনের ট্র্যাজেডি। দেখালেন সমাজের বৃত্তি ও অর্থগত স্তরের দিক থেকে নীচুঘরের ছেলে জুলিয়েঁ-র মনে নেপোলিয়নী স্বপ্ন ছিল (তার বাকসে নেপোলিয়নের ছবি ছিল)। এবং এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, স্তাঁদালও নেপোলিয়নের পক্ষভুক্ত ছিলেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের কালপর্বে সমাজের অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের আজ্ঞাবাহী যাজকতন্ত্র, এই দ্বৈতশক্তির আঘাতে শেষ পর্যন্ত সে ছিন্নশির হল। কিন্তু এখানেও দেখা গেল ব্যক্তির বিদ্রোহ আর তার সঙ্গে নারীহৃদয়ের রহস্যালোকের অপূর্ব বিশ্লেষণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্তিকতারই সাক্ষ্যবহ। কিন্তু এর সঙ্গে বাস্তবধর্মিতার বিরোধ নেই।

বালজাক-এর La Comedie humaine-কে (১৮৩১-৪৮) তিনি নিজেই উনিশের শতকের ফ্রান্সের ক্রনিক্‌ল্‌ বা ইতিবৃত্ত বলেছেন। গ্রাম ও নগরের সাধারণ মানুষ ও অভিজাত কর্মচারী, সরলা বালিকা ও নাগরী, চোর, ডাক্তার, বিচারক, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী—কেউ বাদ যায় নি বালজাক-এর তুলিতে। বালজাক দেখেছিলেন রাষ্ট্রে সমাজে সর্বত্র টাকার কাড়াকাড়ি, নৈতিক চরিত্রের ও সাধুতার দাস্যবৃত্তি কুবেরের পদে। অর্থের এই সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব অন্য কেউ বালজাক-এর মতো বিশ্লেষণ করেন নি। এই বাস্তবনিষ্ঠতায় তিনি স্তাঁদালের চেয়ে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক-ইতিহাস-সম্মত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে তিনি বালিকা ইউজেন গ্রাঁদের জীবনের বেদনাকে মমতাময় চোখে দেখেন, যখন তিনি অনুভব করেন বৃদ্ধ গরিঅ-র মধ্যে কিং লীয়রের বেদনা ও অশ্রু, সেখানে তিনি অবশ্যই রোমান্টিক। সাধারণের মধ্যে অ-সাধারণকে দেখা রোমান্টিকতারই ফল। রোমান্টিকতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হুগোর (১৮০৩-৮৫) মহৎ ও বৃহৎ উপন্যাস 'লে মিজারেবল্‌স্‌'। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আরও আসে ঐতিহাসিক কল্পনা, ফলে রচিত হতে থাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস। রোমান্টিকতার সঙ্গে রোমান্টিক দেশপ্রেম জড়িত। ওয়ালটার স্কটের ঐতিহাসিক রোমান্‌স্‌গুলি ফ্রান্সে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। হুগোর Notre Dame তারই প্রমাণ। বালজাকও স্কটের উপন্যাসের অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। স্কটের দ্বারা তিনিও প্রভাবিত হয়েছিলেন যদিও স্কটের বিষয়বস্তু বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি গ্রহণ করেন নি। তার পরিবর্তে সমকালীন ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় তিনি তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে উপস্থাপিত করলেন।

দ্যুমা (১৮০২-৭০) স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করে লেখেন তাঁর উপন্যাসগুলি। রোমাঞ্চকর গল্পরসই তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ।

১৮৩০-এর পর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি, পড়ুয়া সাধারণের প্রসার, শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিক শ্রেণীর বিস্তৃতি, ছাপাখানা ও পত্রিকার সম্প্রসারণ যেমন ঘটছিল তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছিল। সমকালীন সমাজ ও জীবনের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রভাবের ফল। আবার রোমান্টিকতার যে স্রোত এসেছিল তার ফলে ব্যক্তির বিদ্রোহবাদ, কল্পনাপ্রবণতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাও জেগেছিল। এ যুগের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। তাঁরা ফ্রান্সের ভাবী প্রগতিশীল সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে জর্জ সাঁদ-এর (১৮০৪-৭৪) নাম উল্লেখ করা চলে। তাঁর আসল নাম ওরর্ দ্যুপ্যাঁ (Aurore Dupin)। এই মহিলার জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি দুই রোমান্টিক। বিখ্যাত কবি ম্যুসে (Musset) ও সুরকার শপ্যাঁ-র (Chopin) সঙ্গে তাঁর প্রেমসম্পর্ক চির রহস্যময় হয়ে আছে। মনে রাখতে হবে এই যুগে সেন্ট সাইমন, প্রুধো ধনবণ্টনের বৈষম্য, সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর অধিকার, মানুষের অধিকার সম্পর্কে তাঁদের বৈপ্লবিক চিন্তা প্রচার করেন। তাঁদের রচনাই কার্ল মার্কসের রচনার পথিকৃৎ। সেন্ট সাইমন গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন একদিকে কোঁৎ-এর দর্শনে অন্যদিকে জর্জ সাঁদ-এর উপন্যাসে। তাই জর্জ সাঁদ বিপ্লবী জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন :

'Great and good people, thou art heroic by thy nature ·
Thou wilt rule, o People ; rule in brotherhood.'

ছদ্মনামেই তিনি প্রতিষ্ঠিতা হলেন। সে যুগের উচ্চ-বংশজাত হলেও তিনি নাগরিক বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পান নি। সমকালীন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন অপরিমিত ধনের অপব্যয়, দেখেছিলেন তারই পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দুঃখের বারমাস্যা।

তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন এই দরিদ্র শ্রমিক-চাষী সমাজ থেকেই নতুন ফ্রান্সের পরিত্রাতার আবির্ভাব হবে। সাঁদ নিয়ে এলেন তাঁর সাহিত্যে গ্রামের চাষী-জীবনের আনন্দবেদনা, গভীর মমতায় আঁকলেন তাদের জীবনের রূপচিত্র। বালজাক্‌কে তিনি লিখেছিলেন : "আপনি এঁকেছেন নাগরিক জীবনের ছবি আপনার La comedie humaine-এ আর আমি লিখছি গ্রামের সাধারণ চাষীজীবনের কথা।" এখানেও দেখা যায় রোমান্তিকতা ও বাস্তবতায় বিরোধ নেই। হ্যুগো যেমন সাহিত্যিক জীবনের দ্বিতীয় পর্বে সাধারণ মানুষের জয়গান করলেন, সাঁদও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের গীতিকবিপ্রবণতা পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় পর্বে, বিশেষত শেষ দশ বছরে, যথার্থ জনগণের 'জীবনের শরিক' হলেন। জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততা ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদপুষ্ট তার রচনা সেকালে বিরোধী পক্ষের তরুণ লেখক ফ্লোব্যার-এর প্রশংসা অর্জন করেছিল।

॥ উনিশের শতকের মধ্যপর্ব : বাস্তবধর্মিতার নবরূপ ॥

ফ্লোব্যার (১৮২১-১৮৮০) 'মাদাম বোভারি' উপন্যাস রচনা করে ফরাসী উপন্যাস তথা বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত। 'মাদাম বোভারি' ১৮৫৭-এ প্রকাশিত হয়। ফরাসী উপন্যাসে স্তাঁদাল এনেছিলেন 'মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা' (psychological realism), বালজাক এনেছিলেন 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা' (socio economic realism)। জর্জ সাঁদ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে এঁকেছিলেন তার শেষের দিকের রচনায় চাষীজীবনের কথা। ফ্লোব্যার তাঁর 'মাদাম বোভারি' উপন্যাসে মুখ্যত তুলে ধরলেন তার রোমান্তিকতাবিরোধী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর বাস্তবধর্মিতার ঐতিহাসিক মূল্য এই রোমান্তিক-বিরোধিতায়। স্তাঁদাল-এর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের

ধারা তিনি ঠিক বহন করেন নি। বালজাক্-এর মতো ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির নিপুণ বিচারও তিনি করেন নি অথবা ইউজেন বা গরিঅ-কে বালজাক্ যে গভীর মমতার দৃষ্টিতে দেখেছেন সে-দৃষ্টিতেও ফ্লোব্যার চার্লস বা এম্মাকে দেখতে চান নি। মহৎ ঔপন্যাসিকের মধ্যে যুগপৎ আমরা 'নিরাসক্তি' (detachment) ও সহানুভূতি (sympathy) লক্ষ্য করি। ফ্লোব্যার রোমান্তিকতাবিরোধী ও বাস্তবধর্মী নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সহবেদনার অশ্রু তাঁর নয়নে নেই। তাই জর্জ সাঁদ ফ্লোব্যার-এর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। ফ্লোব্যার আবার তাঁর পরবর্তী ঔপন্যাসিক জোলা থেকেও স্বতন্ত্র। জোলার প্রসঙ্গে গঁকুর (Goncourt) ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম উচ্চারিত হয়। অবশ্য তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। জোলার রচনাকে বলা হয় Naturalism বা বৈজ্ঞানিক বাস্তবধর্মিতার সাক্ষ্যবহ। সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে এবং সমাজবিপ্লবীর মন দিয়ে জোলা ব্যক্তি, সমাজ, জীবনকে দেখেছেন ও এঁকেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং 'আদর্শবাদ'-এর দিক থেকে তিনি ফ্লোব্যার-এর তুলনায় বরং বালজাক-এরই দূর সম্পর্কের সগোত্র বলা চলে।

পূর্বেই বলা হয়েছে রোমান্তিকতাবিরোধী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই ঐ যুগপর্বের উপন্যাস-সাহিত্যে ফ্লোব্যার খ্যাতনামা। সেদিক থেকে তাকে সার্ভেন্টিস-এর সঙ্গে তুলনা করা অসঙ্গত নয়। সার্ভেন্টিস তার 'ডন কুইকজোট'-এ মধ্যযুগীয় 'রোমান্স্'এর বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামো ও তার অনুগত 'আদর্শ'গুলির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের কুঠার হেনেছেন। তেমনি ফ্লোব্যারও রোমান্তিকতাবিরোধী বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। ফ্লোব্যার মানুষের ইতিহাসের তিনটি স্তরে বিশ্বাসী ছিলেন—'প্যাগান'ধর্মী, খ্রীষ্টধর্মী ও শূকরধর্মী। তাঁর সমকালীন যুগকে তিনি তৃতীয়-স্তরীয় বলেই জেনেছিলেন। সেজন্য ফ্লোব্যার তাঁর সময়ের সমাজের

মধ্যে কোনও আশাবাদী উজ্জ্বল রেখা দেখেন নি, ১৮৪৮-এর গণবিপ্লব প্রচেষ্টায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, সেকেণ্ড এম্পায়ার (১৮৫২) এ তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদ জানান নি, ভিক্তর হুগোর মতো বলতে পারেন নি—"Until the end I shall share freedom's exile, when she returns, I shall return."

তাঁর ঈষৎ-পূর্বজ ও সমকালীন রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বোদলের (১৮২১-১৮৬৭), গোতিয়ে (১৮১১-১৮৭২)। গোতিয়ে যে l' Art pouer l' Art অর্থাৎ 'Art for art's sake' ধারার প্রবক্তা, বোদলের সেই কলাকৈবল্যবাদের একনিষ্ঠ সাধক। তার Les Fleurs du Mal কাব্যসংকলন ১৮৫৭-এ বার হয়। ঐ কাব্যে দুর্নীতি প্রচারের অপরাধে তিনি অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন। (ফ্লোব্যার অবশ্য সতর্কিত হয়েই ছাড়া পেয়েছিলেন)। বোদলের প্রথাসিদ্ধ রোমাণ্টিকতা ও 'ভাববাদ'-এর বিরোধিতা করেছিলেন। সত্যই অভিনব তার সাঙ্কেতিক রূপসৃষ্টি, কিন্তু অবক্ষয়ের লক্ষণাক্রান্ত। গোতিয়ে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন অবয়ব নির্মাণের দিকেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন, কিন্তু তার 'মাদমোয়াজেল দা মোপিঁ' উপন্যাস হিসাবে অসার্থক। বোদলের-এর বক্তব্যে তিক্ত বিষাদ ও মরণকামনা, তাঁর বাহনে ক্লাসিসিজম্-এর ঋজুতা, সংহতি, ছন্দে ধ্বনিস্পন্দ ও মিলের নিখুঁত বিন্যাস। ফ্লোব্যারের 'মাদাম বোভারি'ও শুধু কাহিনীবিন্যাসের বা চরিত্রসৃষ্টির নিপুণতায় নয়, ত্রুটিহীন স্টাইলের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য রচনা। জনৈক সমালোচক লিখেছেন, এখানে story-craft এবং style craft নিবিড়ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে একাত্ম হয়েছে।

'মাদাম বোভারি'র গল্প ফ্লোব্যার অনেকের মতে তাঁর বন্ধু বুইয়ে-র কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ইউজেন দে লা মেয়ার নামে একটি ডাক্তারের স্ত্রী তার গোবেচারা স্বামীর আধা-শহুরে সংসারে কাম্য

আনন্দ খুঁজে পেল না। সেই নিরানন্দের রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে প্রণয়ীদের আশ্রয় করল, বিলাস-ব্যসনের খেয়াল মেটাতে বেদনায় ডুবল, শেষে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। ডাক্তার দে লা মেয়ারও নিজের জীবনে মৃত্যুর যবনিকা টেনে দিল।

বন্ধুর মুখ থেকে শোনা এই গল্পটিই ফ্লোব্যারের 'মাদাম বোভারি'র ভিত্তি। যাদের কথা ফ্লোব্যার লিখেছেন তাদের তিনি ঘৃণাই করতেন। জর্জ সাদ-কে একদা তিনি লিখেছিলেন: "Oh, how tired I am of the sordid worker, the inept bourgeois, the stupid peasant, and the odious churchmen"। কিন্তু যে সমাজ থেকে তিনি মুক্তি বা escape খুঁজছিলেন সেই সমাজকেই তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অবলম্বন করলেন, তাদের মধ্যেই তাকে নামতে হল। অনেকে আবার 'মাদাম বোভারি'র এম্মা চরিত্রের পরিবার ও পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আহত হবার মধ্যে ফ্লোব্যারের ব্যক্তিজীবনের স্পর্শ পেয়েছেন। কেননা ফ্লোব্যারও স্বাস্থ্যে, অর্থে, মর্যাদায় ও প্রেমে কোনও দিন তার কামালোক খুঁজে পান নি। তার প্রধান কারণ বোধকরি আকৈশোর তার মানববিমুখতা। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন: "I went to school when I was only ten and I very soon contracted a profound aversion to the human race." আর শেষ জীবনে লিখেছেন: "Human life is a sad show, undoubtedly; ugly, heavy and complex"—এই মানববিমুখতা 'মাদাম বোভারি'-তে সুস্পষ্ট। এম্মার মনে আকৈশোর রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন বর্ধিত হয়েছিল রোমান্টিক প্রণয়মূলক কাহিনী পাঠে। গ্রামের ডাক্তার চার্লস বোভারির সঙ্গে তার বিবাহের পর এম্মা তার স্বপ্নের জগৎ একে একে ভেঙে পড়তে দেখেছে। এমন কি তার একটি আশা ছিল তার ছেলে হবে, কিন্তু হল মেয়ে। ছেলের মধ্যে সে খুঁজে পেতে চেয়েছিল তার নিজের অতৃপ্ত জীবনের

প্রতিশোধ। কেননা, পুরুষ কারও অধীন হবে না, সবলে ছিনিয়ে নিয়ে ভোগ করতে পারবে, কিন্তু মেয়ে পরাধীন,—সমাজে, পরিবারে, সন্তানে। তাই মেয়ে হয়েছে শুনে এম্‌মা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। নিজের রোমান্তিক প্রণয়স্বপ্ন সফল করবার জন্য, মুক্তি খুঁজবার জন্য (পাপাচারের জন্য নয়), এম্‌মা লিও এবং রুডলফ-এর সঙ্গে প্রণয়ের খেলায় মেতেছিল। সুধী সমালোচক ঠিকই লিখেছেন—"She has a taste *for* them but none *in* them."

এই এম্‌মা বোভারি চরিত্রটি ফ্লোবার-এর এক স্মরণীয় সৃষ্টি। এ কথা সত্য যে 'অ্যানা কারেনিনা' উপন্যাসে তলস্তয়ের যে সহানুভূতি অ্যানাকে গড়েছে সেই সহানুভূতির স্বাক্ষর এম্‌মা বোভারিতে নেই। কিন্তু এম্‌মা আশ্চর্য জীবন্ত চরিত্র, পুরোপুরি 'রিয়াল' (real) চরিত্র। 'মাদাম বোভারি' ফরাসী উপন্যাসের গতিপথে নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক যাত্রাবদল—সে যাত্রা অকুণ্ঠ বাস্তবধর্মিতায়। কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, পরিমণ্ডল রচনা, সর্বক্ষেত্রে এই বাস্তবধর্মিতা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু স্তাঁদাল ও বালজাক-এর রচনার জীবনধর্মিতা ফ্লোব্যার-এর রচনায় নেই। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর ফরাসী লেখকেরা নেতিবাদী নিস্পৃহ দর্শকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাই ফ্লোব্যার ১৮৫০-এ লিখেছিলেন: "but we lack inner-life, the soul of things, the idea of the writer's subject."

ফরাসী উপন্যাসে ফ্লোব্যার-এর ঐতিহ্য তাঁর সমকালীন ও ঈষৎ-পরবর্তী গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় বহন করেছিলেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় 'ন্যাচারালিজম' (Naturalism)। গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের চেয়ে জোলার নামই অবশ্য এই প্রসঙ্গে বেশি উচ্চারিত হলেও ঐতিহাসিক ধারার দিক থেকে গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের স্থানও উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি 'রিয়ালিজম' বা 'বাস্তববাদ' প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল ফরাসী ঔপন্যাসিক সমাজে। রোমান্তিকতা

বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে ডারউইনী জীবতত্ত্ব এবং বস্তুতান্ত্রিক দর্শন মিলে 'ন্যাচারালিজম্'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজের নিচের তলাকার মানুষের ছবি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফোটোগ্রাফের মতো আঁকবার যে ব্যগ্র প্রবণতা গঁকুরদের রচনায় দেখা দিল তার পিছনে অবশ্য সামাজিক কোনও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। জনসাধারণের মৌলিক দাবি ও অধিকারকে তাঁরা কখনও তুলে ধরেন নি। অবক্ষয়ী অথচ শক্তিশালী দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষকে এঁকেছেন—জোর দিয়েছেন সমাজের 'বাস্তব' দিককে প্রামাণিক ভাবে, দলিলের মতো উপস্থাপিত করায়। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে ঔপন্যাসিকের কাজ হবে—"to adopt the serious, passionate, alive form of literary study and of a sociological enquiry to become the moral historian of his time by analysis and exact psychological investigation and to assume the duties and methods of scientific workmanship." দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেওয়া ঔপন্যাসিকের ধর্ম বলে মনে করেছিলেন। এই ধর্ম যথার্থ সার্থকতা লাভ করেছে জোলা-র রচনায়।

নিচের তলাকার মানুষের বাস্তব রূপ আঁকতে এডমনড (১৮২২-৯৬) গঁকুর গণিকা-জীবনকেও গ্রহণ করেছিলেন। তার 'লা ফিয়ে এলিজা' (La Fille Elisa)-র ইংরেজি অনুবাদে নাম হয়েছে 'Woman of Paris'। একে উপন্যাস বলা যায় না, বরং উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কালে ফ্রান্সের গণিকাজীবন ও কারাজীবনের প্রামাণিক দলিল-চিত্র বলা যায়। একটি ধাইয়ের মেয়ে কিভাবে একের পর এক গণিকালয়ে জীবনযাপন করেছে এবং শেষে জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে তার নিখুঁত বর্ণনা আছে। এই ধারার পরিণতি বিংশ শতকের ইতালীয় ঔপন্যাসিক মোরাভিয়া-র 'Women of Rome'-এ। এর সঙ্গে বক্তব্যের

সাদৃশ্যে সহজেই মনে আসে তলস্তয়ের 'রেসারেকশন'-এর কথা। সেখানে তলস্তয়ের বর্ণনায় আশ্চর্য বাস্তবধর্মিতা কিন্তু মাস্‌লোভা চরিত্রটির প্রতি তলস্তয়ের সহানুভূতি ও সৎ-শিল্পীজনোচিত মনো-বিশ্লেষণ রেসারেকশনকে শতবর্ষজয়ী করেছে। কিন্তু গঁকুরেরা গোতিয়ের মতো শিল্পের কল্যাণকামী আদর্শের বিরোধী। গঁকুরেরা নিশ্চয়ই 'বিদ্রোহী' কিন্তু তাঁদের এই নেতিমূলক বিদ্রোহ বহুস্থলে রুচিকে আঘাত করেছে। অবশ্য তাঁরা রুচি সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ছিলেন। এবং পুরনো ঐতিহ্যকে ভাঙবার উৎসাহী ছিলেন মাত্র। তাই যতই স্পষ্টতা (frankness) ও প্রামাণিকতা (documentation) তাঁদের লেখায় থাকুক তবু সেন্টস্‌ব্যেরির মতোই বলতে হয়—"You are an artist and you must do something with your materials—add something of yourself to them…"

জোলা-র (১৮৪০-১৯০২) উপন্যাসে 'ন্যাচারালিজম্‌' পূর্ণ পরিণতি লাভ করল। পরিবেশবাদ, বংশগতিতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ জোলার চিন্তালোকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জীববিজ্ঞান এবং অর্থনীতি উভয় বিষয়েই জোলা-র আকর্ষণ ছিল। তার ফলে তার উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতত্ত্বশাসিত দৃষ্টির অত্যন্ত বেশী ছাপ পড়েছে। এখানে বাল্‌জাক-এর সঙ্গে তাঁর কিছু মিল আছে। লামার্ক ও ডারউইনতত্ত্ব বাল্‌জাক জানতেন। 'Social spicies' রূপে তিনিও সমাজের নরনারীকে দেখেছেন। বাল্‌জাক যেমন 'দি হিউম্যান কমেডি' বহু খণ্ডে লিখেছিলেন জোলা-ও তাঁর 'রুগোঁ মাক্যার' (Rougon Macquart) কুড়ি খণ্ডে বার করেছিলেন। বাল্‌জাক-এর উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে ১৮১৫-এর পরবর্তী রাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের যুগ আর জোলা-র উপন্যাসে 'সেকেণ্ড এম্‌পায়ার' ও ১৮৭০-এ জর্মানির হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের যুগ। বাল্‌জাক-এর মতোই জোলা তাঁর 'রুগোঁ মাক্যার' সিরিজের পরিচয় দিয়েছেন—'natural history of a family during the Second Empire।'

তবে জোলা স্তাঁদাল ও বাল্‌জাক সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করলেও, তাঁদের বাস্তবতাসমৃদ্ধ দৃষ্টির উত্তরাধিকার স্বীকার করলেও, তাঁদের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন। তিনি স্তাঁদাল-বর্ণিত জুলিয়েঁ এবং মাতিল্‌দ্‌-এর প্রণয়কাহিনীকে 'মস্তিষ্কের ব্যায়াম' বলে ঠাট্টা করেছেন এবং দুটি চরিত্রকেই 'artificial' বা 'কৃত্রিম' বলে ঘোষণা করেছেন। বাল্‌জাক-এর রচনাতেও জোলা বাস্তবতার পূর্ণরূপ দেখতে পান নি। কিন্তু সে ত্রুটি জোলারই। নেপোলিয়নী-যুগ এবং 'রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান' যুগের নরনারীর 'শ্রেণী' (class) ও ব্যক্তিমানসের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বের যে বিশ্বস্ত রূপসৃষ্টি স্তাঁদাল ও বালজাক করেছেন তার গূঢ় তাৎপর্য জোলা ধরতে পারেন নি। সেজন্যই এঙ্গেলস্‌ বাল্‌জাক-কে জোলার চেয়ে বড়ো শিল্পী বলে ঘোষণা করেছিলেন। জোলা-র দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রয়োগানুগ হলেও স্তাঁদাল-বালজাক্‌-এর মতো জীবনানুগ হতে পারে নি।

'ন্যাচারালিজম্‌'-সম্মত উপন্যাস কিভাবে রচিত হবে সে সম্পর্কে জোলা নিজেই লিখেছেন: "ধরা যাক একজন 'ন্যাচারালিস্ট্‌' ঔপন্যাসিক রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করে একখানি উপন্যাস লিখবেন। 'চরিত্র' সম্পর্কে না ভেবে তাকে প্রথম নজর দিতে হবে সেই সব তথ্য সংগ্রহের দিকে, যে-তথ্যগুলি দরকারী হবে রচিতব্য উপন্যাসখানি সম্পর্কে। তাঁকে কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং কয়েকরাত্রি অভিনয় দেখতে হবে। তারপর তাঁকে ঐ বিষয়ে ওয়াকেফহাল ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাছাড়া তিনি বিবৃতি, প্রাসঙ্গিক টুকরো টুকরো গল্প, ছবি সব সংগ্রহ করবেন। কিন্তু এই সব নয়। তিনি ঐ প্রসঙ্গে লিখিত দলিল-পত্রাদিও দেখবেন। শেষে তিনি বর্ণনীয় স্থান পরিদর্শন করবেন, খুঁটিনাটি জানবার জন্য কয়েকরাত্রি থিয়েটার দেখবেন, নট-নটীদের পোশাক পরবার ঘরে অন্তত একটি রাত্রি কাটাবেন এবং ঐ আবহাওয়াকে যতটা সম্ভব নিজের মধ্যে নিয়ে নেবেন। যখন এই

সবগুলি ব্যাপার শেষ হবে তখনই উপন্যাসটি নিজেই রূপ নিতে শুরু করবে। ঔপন্যাসিকের কাজ হবে এই তথ্যপুঞ্জকে কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত করা।" তিনি তাঁর মন্তব্য শেষ করেছেন এই বলে যে—"Interest will no longer be focussed on the peculiarities of the story—on the contrary, the more general and commonplace the story is, the more typical it will be." কাজেই স্তাঁদাল ও বাল্‌জাক-এর সঙ্গে জোলা-র দৃষ্টিভঙ্গির ও চরিত্রসৃষ্টির পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু জোলা তার নিজের 'ফরমুলা'-র সঙ্গে নিজের শিল্পীসত্তাকে সর্বত্র মেলাতে পারেন নি বলেই 'জারমিনাল্'-এর মতো মহৎ উপন্যাস রচনা করতে পেরেছেন। তার কারণ জোলা-র মধ্যে সৎ শিল্পীর প্রেরণা ছিল, অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধ ছিল। বিখ্যাত "ড্রেফ্যুস"-বিচারে জোলা-র দৃপ্তকণ্ঠ তার প্রমাণ। ফ্লোব্যার এর কোনও কিছুতে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু জোলা-র ছিল মানবিক অধিকারে।

ফ্রান্সে কয়লাখনির রক্তাক্ত ধর্মঘটের পটভূমিকায় লেখা 'জারমিনাল' (১৮৮৫)। এ উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্যই জোলার কয়লাখনির অভ্যন্তরের নিখুঁত, বিশ্বস্ত, ব্যাপক চিত্র আঁকায়। কয়লা কাটা, তোলা, ধ্বস নামা, জল ঢোকা, শ্রমিকের প্রত্যেকটি মুহূর্তের কাজের বিস্ময়কর শক্তিশালী বর্ণনায় এ উপন্যাস আমাদের চোখের সামনে সমগ্র কয়লাখনির পাতাল-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। কিন্তু শুধু সে-জন্য 'জারমিনাল' কেউ পড়ে না। অথবা 'জারমিনাল'-এ রক্তাক্ত শ্রমিক ধর্মঘটের পূর্ণাঙ্গ রূপ আছে বলেই নয়, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে বলেও নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিগত রাজনৈতিক চেতনা, শিল্পীর প্রত্যক্ষতা (objectivity) ও মহৎ মনের সহানুভূতি—সবই জারমিনালে আছে। জোলা দেখিয়েছেন কয়লাখনির মজুরেরা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনিবার্য শোষণে কী

নিদারুণভাবে দলিত, পিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে দেখিয়েছেন মালিকেরাও বন্য পশু নয়, তারাও মানুষ, তাদের মধ্যেও 'মানুষের' সদগুণ থাকতে পারে—তবে শ্রেণী-স্বার্থে আঘাত লাগলেই তাদের রূপ বদলায়—"The miner must be shown crushed, starving, a victim of ignorance, suffering with his children in a hell on earth—but not persecuted, for the bosses are not deliberately vindictive—he is simply overwhelmed by the social situation as it exists." সমাজের উচ্চ-অভিজাত পরিবার এবং খনির অন্ধকারে মজুরশ্রেণীর জীবন অর্থনৈতিক আঘাতে ও প্রত্যাঘাতে কি ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে সেই 'totality' আছে বলেই 'জারমিনাল' স্মরণীয় সৃষ্টি।

'জারমিনাল' উপন্যাসে মানবতার শিল্পী জোলা-র আত্মপ্রকাশ। 'জারমিনাল'-এর কাহিনী শ্লথগতি নয়, চরিত্রগুলি অসংখ্য হলেও স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। একদিকে অভিজাত সমাজের নেগ্রেল, হেনেবিউ, মাদাম হেনেবিউ, সেসিল; অন্যদিকে মজুর সমাজের এতিয়েন, কাতরিন মেহোদ, মুকেত, লাভাক—প্রভৃতি সব চরিত্রই জীবন্ত। এ-বই তাই কয়লাখনির সার্থক এপিক বা মহাকাব্য। 'জারমিনাল'-এর শেষ অংশে যেখানে খাদে জল ঢুকেছে এবং এতিয়েন কাতরিনকে বকে নিয়ে খনির অতল গর্ভ থেকে মরণপণ লড়াই করে উঠে আসছে, ক্রমাগত উঠে আসছে—সেই শ্বাসরোধী বর্ণনা অথবা ধর্মঘটী বুভুক্ষু শীর্ণ শ্রমিকদের মিছিলের বীভৎস ভয়াল রূপ পড়তে পড়তে বার বার জোলাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। কাতরিন শেষ পর্যন্ত এতিয়েন-এর বুকেই মারা গেল। আর বহু জীবন কয়লাখনির করাল অন্ধকারে হারিয়ে গেল। জোলা মানুষের উজ্জ্বল ভাবী ইতিহাসে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই এতিয়েন কান পেতে শুনেছে: "Life was springing from her fertile womb, buds were bursting into leaf and the fields

were swelling and lengthening, cracking open the plain in their upward thrust for warmth and light. The sap was rising in abundance with whispering voices, the germs of life were opening with a kiss....Men were springing up, a black avenging host was slowly germinating in the furrows, thrusting upwards for the harvests of future ages. And very soon their germination world crack the earth asunder."—সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে জীবনের নব অঙ্কুরোদ্‌গমের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে জোলার এই উপন্যাস চিরকালের। 'জারমিনাল' তাই বাস্তবধর্মী উপন্যাসকে এক কদম এগিয়ে দিল সন্দেহ নেই।

॥ রুষ সাহিত্য ॥

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের সিংহাসন রুষের অধিকারে। এবং এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য যে রুষদেশের জাতি, ভাষা ও সাহিত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের, বিশেষত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বা পশ্চিমী ইউরোপ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। রুষ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য তার 'soul'-এ—যার সদৃশরূপ ইংরেজ লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে বা তাদের জাতীয় ভাবে দেখতে পান নি। 'দি কমন্ রীডার' গ্রন্থের 'The Russian point of view' প্রবন্ধে তিনি রুষজাতির হৃদয় ও প্রবৃত্তির অনন্য-স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিবেশের দিক থেকেও রুষদেশের গঠন ইংলণ্ড ফ্রান্স থেকে পৃথক। খ্রীষ্টপর ১৯১৭ র মহান বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুষিয়ায় রাজতন্ত্র অর্থাৎ জারতন্ত্র কঠোরভাবে বিদ্যমান ছিল। খ্রীস্টপর ১৬৮৮-র 'রক্তপাতহীন' বিপ্লবের পর থেকে ইংলণ্ডে বা ১৭৮৯-র বিপ্লবের পর ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত সমাজের যে নেতৃত্ব দেখা দিয়েছিল, বুদ্ধিজীবী সমাজের যে জাগরণ ঘটেছিল, রুষিয়ায় ঠিক

তা ঘটে নি। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে যে শিল্পবিপ্লব, গণতান্ত্রিক অর্থনীতি, মেহনতী কারিগর শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল রুষিয়ায় সেই পরিবর্তন ঘটতে অনেক দেরি হয়েছিল। কিন্তু তার 'জাতীয়' জীবনধর্মের, তার প্রবল প্রাণস্ফূর্তির বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটিয়ে রুষ কথাসাহিত্য বিশ্বজয়ী হল।

পূর্বেই বলেছি, মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িকপত্রিকা, সহজবোধ্য গদ্যরীতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ দেখা না দিলে উপন্যাস ঠিক গড়ে উঠতে পারে না।

রুষ কথাসাহিত্য সম্পর্কেও সে কথা সত্য। তবে ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে যুগপৎ নাগরিক জীবন, শিল্পবিপ্লব, বুর্জোয়াতন্ত্রের অভ্যুত্থান, গণতান্ত্রিক সংস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনা যেভাবে ও যে-কালে ঘটেছে রুষদেশে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় নি। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে ধনতন্ত্রী-বণিকতন্ত্রী আদর্শ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে স্বপ্রতিষ্ঠ মানুষের ভূমিকা রুষ উপন্যাসে প্রথমে দেখা দেয় নি। রুষ সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্রের অনুপস্থিতি ও গদ্যের অব্যবহার আঠারোশতক অবধি চলেছিল বললে অনৈতিহাসিক হয় না। লোককণ্ঠে গীত দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ গাথাকাব্য, 'ঈগর'-এর বীরবৃত্তান্ত দীর্ঘজীবিত ছিল। সাধারণ শিক্ষার প্রসার না থাকলেও মহাকাব্যের মতো, আমাদের দেশের রাজপুতনার চারণকবিদের কণ্ঠগত বীরকাব্যের মতো—রুষ গাথাকাব্য, বীরকাব্যগুলি লোকের মুখে মুখে ছড়ানো ছিল। আঠারোর শতকের মাঝামাঝি প্রথম চলতি (colloquial) রুষ ভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলিত হয়। লোমোনোসভ ১৭৫৭ এ (আমাদের পলাশী যুদ্ধের বছরে) এই দুরূহ কাজ করেন। আঠারোর শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের ফলেই গদ্যের প্রয়োজন খুব বড় হয়ে দেখা দিল। চার্চ-এর আওতা থেকে মুক্তি পেল রুষ গদ্য। লোমোনোসভের প্রচেষ্টা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। পিটার দি গ্রেট এর (১৬৭২-১৭২৫) সিংহাসনে আরোহণের পর

থেকে (১৬৮৯-১৭২৫) রুষ দেশ পশ্চিমী আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়। তিনি যৌবনে 'হিতবাদী' দর্শনে (utilitarianism) অনুরাগী হন; তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পের প্রসার না ঘটলে দেশের উন্নতি নেই। তাঁর শাসনের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ থেকে রুষজাতি প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন ছিল। পিটারই রুষিয়ার সঙ্গে 'আধুনিক' ইউরোপের মিলন ঘটালেন এবং তার ফলে রুষিয়ার সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন দেখা দিল। পিটার ছদ্মবেশে পশ্চিম ইউরোপে হাতে কলমে মজুরের কাজ করেছেন, ফ্রান্সের নৃত্যশালায় পশ্চিমী নাচ শিখেছেন, মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার, রাসায়নিক পরীক্ষাগারের উপযোগিতা সবই সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন—আর রুষিয়ায় নিয়ে এসেছেন দক্ষ শ্রমিক, কারিগর, কর্মচারী ইউরোপ থেকে। বহু ব্যক্তিকে তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থে পাঠিয়েছেন ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষা শিখে আসতে। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতাকে তিনি রুষিয়ার মাটিতে বপন করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। পোশাক-পরিচ্ছদও পশ্চিমী ছাঁচে তৈরী হতে লাগল, লম্বা গোঁফ দাড়ি রাখা চলল না। মেয়েদের 'হারেম'-পর্ব ঘুচতে লাগল, পরদা-আবরু খসা শুরু হল। পিতা ও স্বামীদের ওপর পিটার হুকুম জারি করলেন স্ত্রী ও কন্যাদের প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং বর্ণমালা সংস্কারেও পিটার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনলেন। এইভাবে পশ্চিমী ইউরোপের আদর্শে রুষিয়ার নব গঠনে পিটার রুষিয়াকে মধ্য-যুগীয়তা থেকে অনেক দূর সরিয়ে নিয়ে এলেন। (পরবর্তী কালে মুস্তাফা কামাল পাশা তুরস্কে এই ধরনের কাজ করেছিলেন)। এই নতুন সমাজবিন্যাস ও পশ্চিমী ইউরোপের পন্থানু-সরণের ফলে উপন্যাসের সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে উঠল এবং ১৭৬৩-তে প্রথম মৌলিক রুষ উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত হল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফরাসী প্রভাব ইউরোপে তখন সর্বত্র দৃশ্যমান। পিটারের পর রুষিয়ার উল্লেখযোগ্য রাজত্বকাল দ্বিতীয় ক্যাথরিন (১৭৬২ ১৭৯৬) এর। তাঁর সঙ্গে ফরাসী দেশের 'এন্‌সাইক্লোপিডিস্‌ট্‌'দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। তিনি ১৭৬৫-তে প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তানায়ক দিদেরোকে রুষিয়ায় আমন্ত্রণ করেন। ভলতেয়রের সঙ্গেও তার পত্রালাপ চলত। জর্মানবংশীয়া এই মহিলা রুষ সমাজজীবনে ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভাবধারা সঞ্চালনে অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিটার ও ক্যাথরিনের রাজত্বকালে অর্থাৎ আঠারোর শতকে রুষিয়া পূর্ব ইউরোপে মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্ররূপে গণ্য হল। ক্যাথরিনের সময়ে ফনবিজিন (১৭৪৫-৯২) যে কমেডিগুলি লেখেন সেগুলি মলিয়েরের এবং হলবার্গের কমেডির ছায়াবলম্বনে। ঝুকোভস্‌কি বায়রন ও হোমারের অনুবাদ করেন। রুষ শিশুসাহিত্যের জনক ক্রিলভ (১৭৬৮ ১৮৪৪) লা ফঁতেন্‌এর রচনার অনুসরণ করেন। কারামজিন্‌ যে Letters of a Russian Traveller লিখেছিলেন তার আদর্শ ছিল ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্টার্নের (১৭১৩-১৭৬৮) A Sentimental Journey। ফিল্‌ডিং-এর উপন্যাসের অনুবাদও হয়েছিল আঠারোর শতকের শেষ ভাগে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে সাহিত্যক্ষেত্রে ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ-অনুকরণ আঠারোর শতকের রুষ সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। পুশকিন্‌ (১৭৯৯-১৮৩৭) এলেন উনিশের শতককে সঙ্গে নিয়ে আর এই শতকে রচিত রুষ উপন্যাস কালজয়ী ও বিশ্বজয়ী হল। পুশকিনের আবির্ভাবকাল প্রথম আলেকজান্দারের সময়। আলেকজান্দার রাজত্ব করেছিলেন ১৮০১ থেকে ১৮২৫ অবধি।

যে-সমাজচেতনা ও বাস্তবধর্মিতা উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শিশুসাহিত্যের জনক ক্রিলভ এর রচনায় তার পূর্ণ পরিচয় আছে। এ কথা সত্য ক্রিলভ-এর রচনায় ফরাসী লেখক লা ফঁতেন-এর প্রভাব আছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, লা ফঁতেনও অনুকরণ

করেছিলেন ঈশপ-কে। কিন্তু ক্রিলভ-এর লেখা দুশোর বেশি আখ্যানে মাত্র আটত্রিশটি লা ফতেন-এর অনুকরণসঞ্জাত। দরিদ্র সামরিক কর্মচারীর ছেলে ক্রিলভ ১৭৮২তে পিটস্‌বার্গ এ আসেন। এই নতুন রাজধানী পিটার দি গ্রেট সৃষ্টি করেছিলেন। তখন ক্যাথরিনের রাজত্ব চলছে। ১৭৮৯-এ (ফরাসী বিপ্লবের বৎসর) তিনি The Ghostly Post Office নামে একখানি ব্যঙ্গাত্মক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন এবং তার দু বছর পরে কয়েকজন সহকর্মীর সংযোগে তিনি বার করলেন Spectator পত্রিকা। (আঠারোর শতকের প্রথমে ১৭১০-১১এ ইংলণ্ডে অ্যাডিসন স্টীল এই নামের কাগজ বার করেছিলেন, ফরাসীদেশে মারিভোঁ ঐ নামে পত্রিকা চালিয়েছিলেন)। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের লোক হওয়ায় এবং নাগরিক জীবনের ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় ক্রিলভ ব্যঙ্গাত্মক গদ্যরচনায় অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। কিন্তু সবার উপরে ছিল তার তীক্ষ্ণ সমাজচেতন মন। যে কোন সৎ শিল্পীর মতোই তিনি প্রতিবাদ করলেন সমাজে প্রচলিত ভূমিদাস প্রথার, ভূস্বামীদের শোষণ, অভিজাতবর্গের অত্যাচারের, অসাধু রাজ-কর্মচারীর অবিচারের। দাঁড়ালেন সাহিত্যে প্রবাহিত অতিরিক্ত কবিত্বময় ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে। তিনি 'রিয়ালিস্ট'—তাই তার আপাত শিশুমনোরঞ্জক কাহিনীর মধ্যে তিনি ভরে দিলেন তাঁর তীব্র প্রতিবাদের কণ্ঠ। ক্যাথরিন প্রথম দিকে ভলতেয়র-দিদেরোর বন্ধু ছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। তারই ফলে ১৭৯২-এ ক্যাথরিনের রাষ্ট্রের পুলিশ আক্রমণ করল ক্রিলভ এর ছাপাখানা, পত্রিকার আপিস। ক্রিলভ বাস্তুচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত হয়ে কখনো গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন—প্রগতিশীল লেখকেরা কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত হলেন, শেষে তিনিও হারিয়ে ফেললেন জীবনের প্রতি পূর্বের অটুট শ্রদ্ধা। তবুও তাঁর রচনার বাস্তবধর্মিতা এবং মানবিক বিদ্রোহ তাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি ঔপন্যাসিক নন কিন্তু গদ্য, সাময়িক

পত্র, বাস্তবমুখিতা, ব্যঙ্গধর্মিতা এগুলি উপন্যাসের জন্মের সঙ্গে জড়িত, তাই রুষ উপন্যাসের প্রসঙ্গে ক্রিলভ-এর আলোচনা বাঞ্ছিত।

উনিশের শতকে রুষিয়ায় ছিল একদিকে জার ও অভিজাততন্ত্র, অপরদিকে কোটি কোটি ভূমিদাস। 'নোবল' বা অভিজাততন্ত্র সৈন্যবাহিনীতে এবং রাষ্ট্রীয় শাসনপরিচালনায় সর্বত্র উচ্চ পদ-গুলিতে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা বহু ধরনের করদান থেকে মুক্ত ছিল এবং নানারকমের মালিকানা স্বত্ব ভোগ করত। ভূমিদাসদের উপর তাদের অবাধ অধিকার ছিল, ভূমিদাসদের বাঁচা-মরা তাদের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করত। ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ বা শিল্পাশ্রয়ী মেহনতী শ্রমিক সমাজ রুষদেশে ছিল না। ধনতন্ত্রবাদের প্রসারও সেদিন ঘটে নি। ভূমিকেন্দ্রিক কৃষিপ্রধান এই বিশাল দেশের শস্যউৎপাদনপদ্ধতিও সেকেলে প্রথায় চলছিল। ভূমিদাস নয় এমন চাষী সমাজের অবস্থাও খারাপ ছিল। তাদের মধ্যে গ্রামীণ যৌথজীবনাশ্রয়ী সমাজবাদের ভূমিকা কিছু থাকলেও তারা যেন সভ্যতার আদিম স্তর পার হয়ে এগিয়ে আসে নি বলেই মনে হত। নেপোলিয়নের পতনের পরও রুষিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুতর মৌলিক রূপান্তর ঘটে নি। এই ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে রুষিয়ার জার ছিলেন প্রথম আলেকজান্দার। পুশকিন প্রথম আলেকজান্দারের এবং প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালে তার সাহিত্য রচনা করেন। কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস—সাহিত্যচতুরঙ্গের সব্যসাচী লেখক ছিলেন পুশকিন। সেজন্য তাকে সুসঙ্গতভাবে জর্মানির মহান্ শিল্পী গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। পশ্চিমী সাহিত্যের বিচিত্র ভাবধারার তিনি স্বীকরণ ঘটান তার সাহিত্যে, আর রুষিয়ার সুপ্ত প্রাণসত্তা তাঁর রচনায় উদবারিত হল। জনৈক সমালোচক লিখেছেন, তিনি যেন রুষিয়ার 'one-man Golden Age'। পুশকিন্ উপন্যাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন। তাঁর The

captain's daughter' বা 'ক্যাপটেনের মেয়ে' স্যর ওয়ালটার স্কট্-এর ঐতিহাসিক রোমান্স-এর অনুসরণ। The Queen of Spades (ইস্কাপনের বিবি) ঠিক উপন্যাস নয়, বড়ো গল্প। ১৮৩০-এ লেখা Tales of Belkin-ও ভালো লেখা। ইভান্ বেলকিন্-এর ছদ্মনামে পুশকিন্ এই বাস্তবধর্মী গল্পগুলি লেখেন। রূষকথাসাহিত্যে তিনিই প্রথম মৌলিক রচয়িতা হলেও মনে হয় পুশকিন্-এর গাথা-কাব্য, গীতিকবিতাগুলি ও ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলিই চিরজীবিত। রূষভাষার বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য, বর্ণচ্ছটা ও সঙ্গীত ধর্ম সবই তার হাতে সমৃদ্ধ রূপ লাভ করেছে। কিন্তু বাস্তবধর্মী উপন্যাসের ক্ষেত্রে গোগলই বরণীয়।

বাস্তবধর্মী সমাজচেতন রূষ-উপন্যাসের স্রষ্টা গোগল (১৮০৯-১৮৫২) রুষিয়ার ডিকেন্স্ নামে খ্যাত। ডিকেন্স্-এর বাস্তবদৃষ্টি, সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, এবং তার হিউমার-এর সঙ্গে গোগল-এর মিল রয়েছে। গোগল-এর লেখা পড়ে পুশকিন্ তাকে লিখেছিলেন 'How sad a country our Russia is'। গোগল-এর চোখ দিয়েই পুশকিন দেখলেন রাশিয়ার বাস্তবরূপ। তরুণ মপাসা যেমন অভিনন্দন লাভ করেছিলেন ফ্লোবার-এর, তেমনি গোগল-ও পেয়েছিলেন পুশকিনের। Social Satire রচনার দিক থেকে তিনি রাবলে, সুইফট-এর উত্তরাধিকারী, তার পূর্বেই লিখেছি সামাজিক অসাম্য পীড়িত মানুষের বিশ্বস্ত জীবনশিল্পী হিসাবে তিনি ডিকেন্স্-এর সগোত্র এবং ম্যাকসিম গোর্কির পূর্বসূরী। তার অপূর্ব বাস্তবধর্মী ছোটগল্প The Over Coat (কোনো-কোনো অনুবাদে The New Cloak)। এক বেচারা কেরানী বহুদিনের ক্লান্ত প্রতীক্ষার পর একটি নতুন গরম কোট তৈরি করিয়ে একদিনমাত্র পরেই তাকে দুর্বৃত্তদের হাতে হারাল। (আমাদের মনে রাখতে হবে গোগল একদা মাসিক কুড়ি রুবল বেতনে সামান্য কেরানী ছিলেন)। তারই প্রেতাত্মা সাঁকো পারাপারের যাত্রীদের ওভার কোট খুলে নিত রাত্রির পর রাত্রি।

শুধু সাকোর পর নয়, সামাজিক পান-ভোজনোৎসবেও তার প্রেতাত্মা দেখা দিল। যে-সরকারী কর্মচারীর কাছ থেকে সে হৃদয়হীন ব্যবহার পেয়েছিল সেই কর্মচারীটি অকস্মাৎ অনুভব করল কে যেন পেছন থেকে তার কোটের কলার ধরে টানছে। তাকিয়ে দেখল—"a man of no great height in old, much worn frock coat, and, not without horror recognized in him Akaku Akauevich. The petty clerk's face was wan as snow and looked utterly like the face of a dead man. But the horror of the important person passed all bounds when he saw that the mouth of the man became twisted and horribly wafting upon him the odour of the grave, uttered the following speech : Ah, so there you are, now, at last! At last I have collared you, now! Your overcoat is just the one I need! You didn't put yourself out any about mine, and on top of that hauled me over the coals—so now let me have yours!"

এখানে পুলিশ এবং ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীন আচরণের এবং তথাকথিত সরকারী আইনের বিরুদ্ধে গোগল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শর নিক্ষেপ করেছেন। গোগল-এর বিখ্যাত উপন্যাস Dead Souls বা "মৃত আত্মা" রুশিয়ার ভূমিদাসপ্রথার ব্যঙ্গ-রূপক। তবে এই ব্যঙ্গের পিছনে গভীর বেদনার উৎস নিহিত। একদা সারভেন্টিস লিখেছিলেন 'ডন কুইকজোট্'। সেই পিকারেস্ক্ নভেল-এর ধারা সবদেশেই বহন করেছে। ডেফো-র Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, ফিল্ডিং এর The History of the Adventures of Joseph Andrews and of his Friend Mr. Abraham Adams, ভলতেয়র-এর Candide, ল্যসাজ-এর Gil Blas de Santillane এবং গোগল-এর

Dead Souls—সব ডন্ কুইকজোট্-এর ঠাটকে মেনে নিয়েছে। এখানেও দেখি এ উপন্যাসের Picaro' চিচিকোভ তার দুজন সঙ্গী সেলিফান্ এবং পেত্রুস্কাকে নিয়ে যাত্রা করেছে। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডই মাত্র পাওয়া গেছে। চিচিকোভ-এর বিচিত্র অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে রুষিয়ার, সামন্ততান্ত্রিক রুষিয়ার ভূমিদাসদের এবং সরকারী অকর্মণ্যতা, অসাধুতার ব্যঙ্গ-রূপক চিত্রিত। Dead Souls-এ 'soul' বোঝাতে সার্ফ বা ভূমিদাসদেরই বোঝানো হয়েছে মনে রাখতে হবে গোগল প্রথম নিকোলাস্-এর রাজত্বকালের (১৮২৫-১৮৫৫) শিল্পী। প্রথম আলেকজান্দারের চেয়ে প্রথম নিকোলাস্ অনেক বেশি কড়া শাসক ছিলেন। কঠোর 'সেন্সর প্রথা' এবং পশুকল্প পুলিশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অত্যাচারের চাপে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সেদিনের জীবন দুর্বহ হয়েছিল। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন যে-কোনও মুহূর্তে ঘটত। গোগল তার শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বে সেন্সর-এর দস্তুর তাড়া সহ্য করেছিলেন। কিন্তু সে দুর্যোগের দিনে তার লেখনী স্তব্ধ হয় নি। এই পর্বেই রচিত হয়েছে The Great Coat-এর মতো গল্প, The Inspector General-এর মতো নাটক এবং Dead Souls-এর মতো বাস্তবধর্মী উপন্যাস। তার শিল্পীজীবনে তিনি লাভ করেছিলেন পুশকিন্-এর অভিনন্দন এবং সমকালীন মহান বিপ্লবী চিন্তানায়ক বেলিন্স্কির (১৮১১-১৮৪৮) আদর্শবাদ। বেলিন্স্কি জোর দিয়ে বলেছিলেন উপন্যাসকে বাস্তবধর্মী হতেই হবে। তিনি বলেছিলেন 'True to Nature' হবে উপন্যাস। তার 'True to Nature' প্রকৃতপক্ষে 'True to Life' মতবাদ। ফরাসী Naturalism-এর আবির্ভাব তখনো হয় নি। গোগলের উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে বেলিন্স্কি-আখ্যাত বাস্তবধর্মিতার স্বাক্ষর আছে।

পিকারেস্ক উপন্যাসের ছাঁচে-গড়া এই উপন্যাসে যে শিল্পীমানস প্রতিভাত হয়েছে সে-মানস র‍্যাবলে, সুইফট্ ও ভলতেয়র-এর

ঐতিহ্যবাহী। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গোগল-এর রুষসমাজের ভূমিদাস থেকে রাজকর্মচারী পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সেকালে ভূমিদাসেরা ছিল ভূস্বামীদের দখলী সম্পত্তি। ভূমিদাসদের জন্য তাদের poll-tax বা কর জমা দিতে হত রাজকোষে। প্রতি দশবছর বাদে এই ভূমিদাসদের আদমসুমারি হত। এই সময়ের মধ্যে কোনো ভূদাস মারা গেলে বা নিরুদ্দেশ হলেও তার কর দিতে হত। কেননা দশবছরের মাঝামাঝি সময়ে ভূদাস-তালিকায় কোনোও রদবদল হত না। তাদের নাম সরকারী তালিকায় থেকেই যেত। এই উপন্যাসের নায়ক চিচিকোভ গরীব কেরানী হিসেবে জীবন শুরু করে। সে একদা জানতে পারল যে 'ট্রাসটি কমিটি' (Trustee Committee) অস্থাবর সম্পত্তি মর্টগেজ রাখবার মতো ভূদাসদেরও বাঁধা রাখছে। হঠাৎ কেরানীটির মাথায় খেলে গেল যে মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট ভূদাসদের নাম জোগাড় করে বা কিনে নিয়ে যদি তাদের জীবিত বলে চালিয়ে দিয়ে মর্টগেজ দেওয়া যায় তাহলে এ পন্থায় প্রচুর অর্থলাভ হয়। এই পরিকল্পনা নিয়ে সে যাত্রা করল। তার যাত্রাপথের ইতিহাস জগৎ রঙ্গ ও ব্যঙ্গের আখ্যান। চিচিকোভ 'dead souls' কিনেছিল ম্যানিলোফ এবং মাদাম কোরোবোচকিনা-র কাছ থেকে। সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সফল করতে দেরি হয়নি। পরিশেষে চিচিকোভ এক বিধবা নিঃসন্তান ধনী মহিলার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবার জন্য উইল জাল করল। কিন্তু সে ধরা পড়ে জেলে গেল। তবে তার উকিল শহরের ও সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাদের নানা কুৎসামূলক ঘটনা কৌশলে মামলার সঙ্গে জড়িয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কুৎসার ভয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহৃত হল এবং তাকে শহর থেকে বার করে দেওয়া হল। এখানেই 'Dead Souls'-এর প্রথম খণ্ড শেষ। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি গোগল নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, তৃতীয় খণ্ড রচিতই হয় নি। কাজেই তিনখণ্ডে বইখানি রচনার

যে আকাঙ্ক্ষা গোগল-এর ছিল তার পূর্ণতা ঘটে নি। এই প্রথম খণ্ডেই দেখা গেল ভূমিদাসেরা সাধারণ পণ্যমাত্র, দেখা গেল ঘুষের বিনিময়ে, অর্থের বিনিময়ে রাতকে দিন অর্থাৎ মরাকে বাঁচা বলে চালানো যায়। বাস্তবধর্মিতা ও ব্যঙ্গধর্মিতায় Dead Souls চিরকালের স্মরণীয় বই। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোগল জারের অত্যাচারের নিষ্পেষণ তুচ্ছ করে মাথা তুলে সারাজীবন দাঁড়াতে পারলেন না বেলিনস্কি-র মতো। শেষজীবনে তিনি তথাকথিত ধর্মের জয়গানে মুখর হলেন—(Choice Passages from Correspondence with Friends—1847) কিন্তু সে-ধর্মাদর্শ তলস্তয়ের উপলব্ধ ও আচরিত ধর্মাদর্শের মতো মানবিকতায় উজ্জ্বল নয়। তাই মৃত্যুপথযাত্রী বেলিনস্কি গভীর ক্ষোভে ও বেদনায় গোগলকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন:

"You have not observed that Russia sees its salvation not in mysticism, not in asceticism, not in pietism, but in the successes of humanity. It is not preachments that Russia needs, nor prayers, but an awakening among her common folk of a sense of human dignity (for so many ages lost amid the mire and manure) and rights and laws, conforming not with the teaching of the church but with common sense and justice and as strict fulfilment of them as is possible. But instead of that Russia presents the horrible spectacle of a land where men traffic in men.···At this very point a great writer, who with his wondrously artistic, profoundly true creations had so mightily assisted in Russia's realization of herself, affording it an opportunity to look at her very self as in a mirror—this writer appears with a book wherein,

in the name of Christ and Church, he instructs the land-owning barbarian to extract more money out of his peons, instructs him to curse them more—"

এই কঠিন শাণিত তিরস্কার গোগল-এর অবশ্যপ্রাপ্য। এই 'ঐতিহাসিক' পত্রখানি সম্পর্কে তুর্গেনেভ বলেছিলেন Beliniski and his 'Letter' are my whole religion.

গোগল-এর Tarass Bulba (টারাস বালবা) ডন নদীর তীরের কসাকদের অতীত ইতিহাসকে অবলম্বন করে লেখা। রুষসাহিত্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হিসাবে এই বইয়ের স্থান খুব উচ্চে। কসাকদের জীবন-মহাকাব্যের তিনি যেন রুষ-হোমার। দুর্ধর্ষ, যুদ্ধপ্রিয়, সরল, বলিষ্ঠ কসাকদের জীবনের নিখুঁত প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে—মিখেইল শোলোকভের ডন নিয়ে লেখা উপন্যাসত্রয়ীর সুদূর সূচনা এই Tarass Bulba.

গোগল এর মৃত্যুর কয়েক বছর পর প্রথম নিকোলাসের রাজত্বও শেষ হল। ১৮৫৫ থেকে ১৮৮১ অবধি দ্বিতীয় আলেকজান্দার রাজত্ব করলেন। এযুগে তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩) এবং দস্তয়েভস্কি (১৮২১ ১৮৮১) কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শিল্পী। দ্বিতীয় আলেকজান্দার যখন সিংহাসনে বসেন তখনও রুষিয়ার সমগ্র কর্ষণযোগ্য ও শস্যজন্মা জমির দশভাগের নয়ভাগ ভোগ করত রাজপরিবার এবং অভিজাতদের একশো চল্লিশহাজার পরিবার। কোটি কোটি ভূমিদাস মুষ্টিমেয় এই কয়েকটি পরিবারের জন্য চাষ করত। তুর্গেনেভ ধনীঘরের সন্তান। বাবা ও মায়ের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্যের ফলে তিনি সার্ফ বা ভূমিদাসদের হাতেই মানুষ হয়েছিলেন। তাদের জমিদারীতে অগণ্য ভূমিদাস ছিল। তাঁর ঠাকুরমা একজন ভূমিদাসকে নিজের হাতে পিটিয়ে মেরেছিলেন। তাঁর মা-ও এ-বিষয়ে উদার ছিলেন না। এমনকি তিনি তাঁর কোনোও ভূদাসকে খ্রীষ্টীয় নাম ব্যবহার করতে দেন নি। অথচ

এই 'সার্ফ'-এর কাছেই তুর্গেনেভ শিখেছিলেন তাঁর মাতৃভাষা রুষভাষা। ভূমিদাসদের জীবনের প্রকৃত রূপ তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ও সমবেদনায় জেনেছিলেন। তাই তাঁর প্রথম সার্থক-রচনা A Sportsman's Sketches (অন্য অনুবাদে নাম Hunting Sketches)—এই ভূমিদাসদের প্রতি গভীর দরদ দিয়েই লেখা। দ্বিতীয় আলেকজান্দার ভূমিদাসদের মুক্তি দেবার যে-সংকল্প কার্যে পরিণত করবার প্রয়াস পান তার সূচনা ১৮৫৯ এ। আর তুর্গেনেভের এই বই বার হয় ১৮৫২-এ। তুর্গেনেভের বই জারের মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয় আলেকজান্দার শুধু ভূমিদাসদের মুক্তি দেবার চেষ্টা করেন নি, তিনি তাদের অভিজাত-জমিদারতন্ত্রের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভূমিসমস্যার সমাধান তিনি করতে পারলেন না, ফলে বিরাট চাষীসমাজের শিয়রে এসে দাঁড়াল অনশনের প্রেতমূর্তি। জার তাঁর পূর্বের শাসকদের তুলনায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে অধিক ক্ষমতা দান করেছিলেন, সেন্সর-এর কড়াকড়ি আপেক্ষিক-ভাবে শিথিল করেছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থারও উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংস্কারধর্মী শাসনপর্ব শীঘ্রই প্রতিক্রিয়াশীলতায় বিলুপ্ত হল এবং তারই ফলে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেকজান্দার বিপ্লবীদলের আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। এই সময়ে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক যুবসমাজের চরমপন্থী চিন্তাধারায় দেখা দিয়েছিল বৈপ্লবিক ধ্বংসবাদ বা নিহিলিজম্। নিহিলিস্টরা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তরুণসম্প্রদায়ের সদস্য। পশ্চিমী ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বৈপ্লবিক দিকগুলি এই জারবিরোধী বুদ্ধিজীবীসমাজের মনপ্রাণ অধিকার করেছিল। তার ফলে উগ্র 'ব্যক্তিত্ববাদ' দেখা দিল—রুষিয়ায় রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, নীতিতে এতদিন যা চলে এসেছিল তার প্রত্যেকটি জিনিসকে অস্বীকার করা হল, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত বলে তুচ্ছ করা হল। চ্যালেঞ্জ পাঠানো হল

প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে। নৈরাজ্যবাদী সমাজতান্ত্রিক চেতনার কিছু যোগ এই নিহিলিজম্-এর মধ্যে ছিল। এই নিহিলিস্ট দল বুঝেছিল যে জনগণের মধ্যে তাদের বিপ্লবী মতবাদ ছড়িয়ে দিতে হবে। ১৮৭০-এর পর থেকে এই আন্দোলন জনগণের মধ্যে প্রবল মাত্রায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বুদ্ধিজীবীসমাজের তরুণ-তরুণীরা চাষীমজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার জন্য চাষী ও মজুরের মতো জীবনযাপনের প্রয়াস করল। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৮-এর মধ্যে প্রায় তিনহাজার তরুণ-তরুণী এই আন্দোলনে জীবনপণ করেছিল। তুর্গেনেভের Fathers and Sons 'দি রুশিয়ান মেসেঞ্জার' নামের তরুণদলের মুখপত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬২-তে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার তুর্গেনেভ ১৮৪০-এ বার্লিনে অ্যানার্কিস্ট মতবাদী বাকুনিনের সঙ্গে একই কক্ষে কিছুদিন বাস করেন। Fathers and Sons তিনি উৎসর্গ করেন বেলিনস্কির নামে। ঐ উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র বাজারভ এই নিহিলিস্টদের প্রতীক। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বাজারভই চাষীদের উদ্দেশে বলেছে: 'future of Russia lies in your hands, a new epoch in history will be started by you—' গভীর সহানুভূতি দিয়ে তুর্গেনেভ বাজারভকে এঁকেছেন। তুর্গেনেভ নিজে এ-সম্পর্কে লিখেছেন: I received congratulations, almost caresses from people of the opposite camp, from enemies. This confused me, wounded me; but my conscience did not reproach me. I know very well I had carried out honestly the type I had sketched, carried it out not only without prejudice but positively with sympathy.

বাজারভ চরিত্রসম্পর্কে তরুণদলের উগ্র-অংশের বিরূপ সমালোচনায় দুঃখিত হয়ে তুর্গেনেভ একজন মহিলাকে লিখেছিলেন: "Bazarov, my favourite child, on whose account I quarrelled with Katkoff; Bazarov, on whom I lavished all the colours

at my disposal; Bazarov, this man of intellect, this hero, a caricature! But I see it is useless to protest." আরও বলেছিলেন যে আর্ট বিষয়ক মতবাদ ছাড়া অন্য সববিষয়ে তাঁর মতামতই বাজারভ-এর বক্তব্যে স্থান পেয়েছে।

তুর্গেনেভ এবং দস্তয়েভস্কি-র রচনাতেই প্রকৃতপক্ষে রুষ উপন্যাস পরিণত সমৃদ্ধ শিল্পরূপ লাভ করল। তুর্গেনেভ বেলিনস্কি-র আহ্বান ও নির্দেশ মেনেছিলেন বাস্তবজীবনধর্মী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে। কিন্তু আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি ফরাসী বাস্তবপন্থী ঔপন্যাসিক জর্জ সাঁদ ও ফ্লোব্যার-এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এসেছিলেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিপুণ কলাকার সেদিনের তরুণ হেনরি জেমস্‌ও তার বন্ধু ছিলেন। রুষদেশের গণ্ডীর বাইরে এসে তিনি ইউরোপের চিন্তা ও চিত্তধর্মের সঙ্গে নিজে আত্মিক যোগ স্থাপন করলেন। চিদগত এই যোগ প্রতিষ্ঠায় তুর্গেনেভ শিল্পীর নবজন্ম লাভ করেন। পুশকিন্-গোগল স্তরকে পিছনে ফেলে রুষ উপন্যাস তুর্গেনেভ্-এর হাতে যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করল।

তুর্গেনেভ তার Fathers and Sons-এ (১৮৬২) এবং Virgin Soil (১৮৭০) বই দুখানিতে সমকালীন বৈপ্লবিক চিন্তা ও কার্যক্রমের যে-ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে শুধু সমকালীন রুষিয়ার ঐতিহাসিক পরিচয় আছে বললে যথার্থ বিচার হয় না। তিনি তার তৃতীয় নয়নের দিব্য-আলোকে সার্থক শিল্পসৃষ্টি করেছেন। ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ বাস্তবদৃষ্টির সঙ্গে গীতধর্মী ও স্বপ্নজাগা কবিদৃষ্টির অনন্যসাধারণ সমন্বয় ঘটেছে তুর্গেনেভের রচনায়। জর্জ মূর লিখেছেন—'পৃথিবীর মধ্যে সেরা গল্পকথক হল রুষিয়ানরা আর রুষিয়ানদের সেরা হলেন তুর্গেনেভ।' কিন্তু গল্পকথক বা গ্রন্থনকার রূপে নয় অমর চরিত্রস্রষ্টা হিসাবেই তিনি সারাবিশ্বের পাঠকের শ্রদ্ধানুরাগের পাত্র হয়েছেন A Nest of the Gentlefolk (১৮৫৮) উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আসন্ন সমাধি ও নবযুগের অভ্যুদয়। কিন্তু এই উপন্যাসের

সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ নায়িকা-চরিত্র 'লিজা কালিটিনা'। তেমনি 'On The Eve' (১৮৬০)-এর মুখ্য আকর্ষণ ইন্‌সারোভ চরিত্রটি। কিন্তু 'Fathers and Sons'এর বাজারভ চরিত্র সবাইকে ম্লান করে দিয়েছে। তুর্গেনেভ সৃষ্ট এই চরিত্রটি নিজের তেজে দীপ্যমান। বাজারভ-এর মৃত্যুদৃশ্যটি উৎকলন করা যাক। বাজারভ টাইফয়েড রোগগ্রস্ত একটি মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজের দেহেই ক্ষত সৃষ্টি করে। সেই ক্ষতপথে টাইফাস জীবাণু তার দেহে প্রবেশ করে। গ্রাম্য ডাক্তার পিতা এবং স্নেহকোমলা মায়ের উদবেগ, সতর্কতা, বেদনা তুর্গেনেভ গভীর দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাজারভ নিষ্কম্প, নির্বিকার। শুধু খবর দিতে বলল অ্যানা সারজিয়েভনাকে। অ্যানা শহরের জর্মান ডাক্তারকে নিয়ে এলো। সবাই সরে গেলে বাজারভ অ্যানাকে বলল: "let us speak the truth. It is all over with me. I am under the wheel. So it turns out that it was useless to think of the future. Death's an old joke but it comes fresh to everyone"—তারপর দুর্বল হাতটি তুলে বলল:

"আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। সেই ভালোবাসার অর্থ আগেও কিছু ছিল না, আজও কিছু নেই। প্রেম আর সব জিনিসের মতো ভঙ্গুর একটি আধার—যাক সে কথা—তার চেয়ে বলি—তুমি কী সুন্দর। এই যে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো—কী সুন্দর।"

অ্যানার দেহ কেঁপে উঠল। বাজারভ লক্ষ্য করল, বলল:

"না, না, বিব্রত হয়ো না—কাছে এসো না, দূরে বসো, জানো তো আমার ব্যাধিটা সংক্রামক।"

অ্যানা একটু দূরে বসল।

বাজারভ বলে চলল:

'অ্যানা আজ তুমি কত কাছে—কী শুভ্র, কী সতেজ—কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি—কত কাজ করবার ছিল, কত সমস্যা সমাধান করবার ছিল—আমি দানবের মতো খাটতে পারতাম—কিন্তু আজ ভাবছি অন্তত মৃত্যুটা একটু সুন্দরভাবে হোক।" অ্যানা একটু জল দিল বাজারভকে।

একটু থেমে সে অ্যানাকে বলল : "তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে যাবে—মৃত কখনও জীবিতের সঙ্গী হয় না। আমার বাবা হয়তো বলবেন—কী সোনার ছেলে রাশিয়া হারালো—আমি জানি ঐ সব বাজে কথার কোনো দাম নেই তবু তাঁর কথা শুনে যেও আর আমার মাকে একটু দেখো।—হয়তো রুষিয়ায় আমার দরকার ছিল—না আমাকে প্রয়োজন ছিল না—কাউকেই প্রয়োজন হয় না—"

নিজের কপালে হাত রাখল বাজারভ। অ্যানা তার মুখের পর ঝুঁকে বলল : "এই যে আমি, এখানে—"

কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বাজারভ একটু উঁচু হবার চেষ্টা করল। 'বিদায়'—অস্বাভাবিক জোরগলায় বলল বাজারভ, চোখে শেষবারের মতো দপ করে আলো জ্বলে উঠলো—"তোমায় সেদিন চুম্বন করি নি, আজ আমার জীবনের এই নিভে-আসা প্রদীপে তোমার শেষ চুম্বন দিয়ে একে নিভিয়ে দিয়ে যাও।" অ্যানার অধরোষ্ঠ বাজারভ-এর ললাট স্পর্শ করল।—

—এই চরিত্রকে শুধু নিহিলিস্ট, বিপ্লবী বললেও হয় না কিংবা সেকালের তরুণেরা যেমন বলেছিল তাদের 'ক্যারিকেচার'—কোনোটিই খাঁটি সমালোচনা নয়। বাজারভ-এর মধ্যে সে-যুগের সংশয়ী অথচ সত্যসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় আছে—তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর মানবিক বোধ—স্নেহ, প্রেম, মমতার স্পন্দন। কাজেই তুর্গেনেভ এই চরিত্র সম্পর্কে যে-দাবি করেছিলেন সে-দাবি সত্য।

তবু যেন তুর্গেনেভের রচনায় একটি বিষণ্ণতার ছায়া সর্বব্যাপ্ত। অন্ধনিয়তির খেলা টমাস হার্ডির উপন্যাসের মতো তাঁর উপন্যাসেও ক্রিয়াশীল।

তুর্গেনেভ-এর পর দস্তয়েভস্‌কি-র (১৮২১-১৮৮১) মধ্যেই ভার্জিনিয়া উল্‌ফ কথিত রুষ-'soul'-এর পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা মন্তব্য করেছেন ইংরেজের জাতীয় প্রকৃতি রুষদের প্রকৃতি থেকে মৌলিক ভাবে পৃথক। দস্তয়েভস্‌কি-র 'দি ব্রাদার্স কারমাজভ' উপন্যাসে জীবনের বিক্ষুব্ধ বিলোড়ন, প্রবৃত্তির বিস্ফোরণ উন্মত্তরূপে উদ্‌ঘাটিত

হয়েছে। হত্যা, মৃত্যু ও পাপের সঙ্গে অনুশোচনা ও অনুতাপের দহন —অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। ঝঞ্চামত্ত সমুদ্র-তরঙ্গের ক্রুদ্ধ ছোবলের মতো দস্তয়েভস্‌কি-র উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিচিত্র বিপুল বেগ আমাদের পাঠকচিত্ততটে অন্ধবেগে আঘাত করে যেন আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ-ধরনের চরিত্রের লালসা-কামনা, অনুতাপ-অনুশোচনার তীব্রতার সঙ্গে আমরা অন্যত্র পরিচিত হই না। ভার্জিনিয়া উলফ ঠিকই বলেছেন: "The novels of Dostoevsky are seething whirlpools, gyrating sandstorms, waterspouts which hiss and boil and suck us in. They are composed purely and wholly of the stuff of the soul. Against our wills we are drawn in, whirled round, blinded, suffocated and at the same time filled with a giddy rapture. Out of Shakespeare there is no more exciting reading."

দস্তয়েভস্‌কি-র শিল্পীজীবনের প্রথম পর্ব দেখা দেয় 'পুওর ফোক' (১৮৪৬) নিয়ে। গোগল-এর 'দি গ্রেট কোট'—থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। বেলিনস্‌কি এই বইখানিকে প্রশংসা করে লিখলেন: 'রুষ সাহিত্যে আর এক গোগল-এর আবির্ভাব হয়েছে'। তিন বছর পরে প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক অপরাধে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে দস্তয়েভস্‌কির মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল। কিন্তু বধ্যভূমিতে নীত হবার পর তিনি পেলেন নির্বাসনদণ্ড, গেলেন সাইবেরিয়া। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন তার সমগ্র শিল্পী জীবনকে অন্য পথে নিয়ে গেল। সে পথ বৈপ্লবিক চিন্তার বর্জন, জারতন্ত্রের সমর্থন ও বাইবেল অধ্যয়ন এবং খ্রীস্ট-পথ গ্রহণ। সাইবেরিয়া থেকে ফেরার পর তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা—'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট" (১৮৬৬)। রাসকলনিকভ এই উপন্যাসের নায়ক। আদর্শবাদী দরিদ্র ছাত্র অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত হয়ে, হারিয়ে ফেলল তার জীবনের আদর্শ ও উদারতা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার

যে দস্তয়েভস্‌কি যখন প্রথম জীবনে 'পুওর ফোক' লেখেন তখন তিনিও নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, এমনও হয়েছে, বহুদিন খাওয়া জোটেনি। রাসকল্‌নিকভ্-এর বোন দুনিয়া মা ও ভাইকে স্বস্তি দেবার জন্য, আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবার জন্য গ্রামের ধনী ও ঘৃণ্যব্যক্তি লুজিন্-কে বিবাহ করবার সংকল্প করল। এই সংবাদ পাবার পর সে যন্ত্রণায় অস্থির হল। সে হত্যা করল এক সুদখোর বুড়ীকে। পরে তার বোনকে। কেউ জানল না। কিন্তু তার মনে জেগে রইল অনির্বাণ পাপবোধ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরতে লাগল সে। কিন্তু, নিজের কাছ থেকে তার নিজের যে মুক্তি নেই। এমন সময় এল সোনিয়া। সে দেহজীবিনী কিন্তু অকলঙ্ক-হৃদয়া। এই দেহজীবিনীর প্রেম রাস্‌কলনিভকে আলোর সন্ধান দিল। সে নিজের হত্যাপরাধ জানাল সোনিয়াকে। তারপর আত্মসমর্পণ করে সাইবেরিয়ায় গেল। আর সোনিয়া? সে-ও স্বেচ্ছায় গেল সাইবেরিয়ায়। সোনিয়ার প্রেম ও ত্যাগ রাসকলনিকভকে নবজীবনের প্রান্তে পৌঁছে দিল। সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জীবনে দস্তয়েভসকি বাইবেল পড়তেন—খ্রীস্টধর্মের পাপবোধ ও অনুতাপ বা 'কনফেসান'-ই "ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট"-এ জয়ী হয়েছে।

দস্তয়েভস্‌কির সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'দি ব্রাদার্স কারমাজভ'। বলা যায় 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'-এ যার শুরু এই উপন্যাসে তারই পরিসমাপ্তি। এই বই দস্তয়েভস্‌কি-র শেষ রচনা এবং মহত্তম রচনা। তলস্তয় ও দস্তয়েভস্‌কির তুলনায় ভার্জিনিয়া উলফ্-এর কথাই মনে পড়ে: "Life dominates Tolstoi as the soul dominates Dostoevsky।" তলস্তয়ের কল্পনাদৃষ্টি, জীবনজিজ্ঞাসা ও শিল্প-বোধ দস্তয়েভস্‌কির ছিলনা। তবুও তলস্তয়ের সমকালে দাঁড়িয়ে দস্তয়েভস্‌কি খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং আজও বিশ্বজোড়া খ্যাতি পাচ্ছেন। তার প্রধান কারণ তাঁর শিল্পকৌশল নয়। যে শিল্পকৌশল তুর্গেনেভ বা তলস্তয় আয়ত্ত করেছিলেন, দস্তয়েভস্‌কি তাকে আয়ত্ত

করার কথা ভাবেন নি। তিনি সেদিক থেকে হয়ত অনিপুণ অমার্জিত শিল্পী। অবশ্য এই অমার্জনার একটি কারণ তার অতি দ্রুত রচনা। তিনি জুয়া খেলতেন, ঋণ করতেন, সেই ঋণ শোধের তাগিদে শিল্পীর কাম্য সাধনায় ব্রতী থাকতে পারেন নি।

'দি ব্রাদার্স কারমাজভ' আমাদের সামনে যুগপৎ স্বর্গ ও নরকের, পাপ ও পুণ্যের এক বিস্ময়কর জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেছে। পিতা কারমাজভ বৃদ্ধ, ধনী ও লালসামত্ত। তার পাপাসক্তির শেষ নেই। তার বড়ো ছেলে দ্‌মিত্রি বা মিতিয়া পিতার মতই উচ্ছৃঙ্খল। উগ্র, ক্রোধী মিতিয়া গ্রুসেংকা বলে একটি বারকন্যাকে নিয়ে মত্ত আছে। টাকা চাই। অন্যদিকে সে একজন কর্ণেলের মেয়ে কাতেরিনা-কেও ভুলিয়েছে। সে কাতেরিনার টাকা ভেঙেছে। তাই টাকা চাই। কিন্তু পিতা টাকা দিতে নারাজ। তার কারণ ঐ গ্রুসেংকা। তারও লালসা জেগে উঠেছে। সে অসংকোচে তার খ্রীস্টধর্মাশ্রয়ী কনিষ্ঠ পুত্র আলোয়শাকে অনুরোধ করেছে: "একবার তুমি গ্রুশেংকার কাছে যাও—যাও, আর তাকে পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করো কাকে সে চায়—আমাকে না মিতিয়াকে।"

মধ্যম পুত্র আইভান বা ভানিয়া ধর্ম মানে না। সে শিক্ষিত এবং নিহিলিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার দস্তয়েভসকি নিহিলিস্ট আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর যে সাধারণ মানুষের প্রতি, দুঃস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি ছিল না তা নয়, কিন্তু ধর্মহীন রাজদ্রোহীদের পর তাঁর বিদ্বেষ ছিল। 'দি ব্রাদার্স কারমাজভ'-এর পূর্বে দস্তয়েভস্‌কি লিখেছিলেন নিহিলিজম বিরোধী 'দি পসেস্‌ড'। তুর্গেনেভের 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্‌স' উপন্যাসে নিহিলিস্ট বাজারভ চরিত্রের প্রতি ছিল গভীর সহানুভূতি। দস্তয়েভস্‌কি 'দি পসেস্‌ড' উপন্যাসে তার বিপরীত চিত্র আঁকলেন। ভানিয়া চরিত্র দস্তয়েভস্‌কির সহানুভূতির পাত্র নয়, শ্রদ্ধার পাত্র নয়। দস্তয়েভস্‌কির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখা যায় আলোয়শা চরিত্রে। ফাদার জোসিমা-র শিষ্য সে।

দস্তয়েভস্কি ব্যক্তিজীবনে খ্রীস্টধর্মের আদর্শ অনুসরণ করেন নি—কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঐ পথই মুক্তির পথ। তিনি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন :—'মানুষ আজ তার সর্বশক্তি দিয়ে ভগবানের শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে চলেছে'। তিনি জড়বিজ্ঞান ও বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন খ্রীস্টধর্মের আহ্বান। এই উপন্যাসে ফাদার জোসিমা বলেছেন :

Fear nothing and never be afraid ; and don't fret. If only your penitence fail not, God will forgive all. There is no sin and there can be no sin on all the earth, which the Lord will not forgive to the truly repentant !···Be not bitter against men. Be not angry if you are wronged. Forgive the dead man in your heart what wrong he did you. Be reconciled with him in truth. And if you love you are of God.—পাপীর প্রতি ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি—ফাদার জোসিমা-র এই মহৎ-বাণী আলোয়শা-র জীবনে সত্য হয়েছে।

বৃদ্ধ কারমাজভ-এর আর একটি অবৈধ সন্তানের পরিচয় আছে। তার নাম স্মেরদিয়াকভ। লিজাভেত নামে একটি নিঃস্ব মেয়ে তার মা। কারমাজভ তাকে বিবাহ করেনি। এই সমেরদিয়াকভ মৃগী-রোগী। এদিকে বড়ো ছেলে প্রকাশ্যে বহুবার বলেছে সে বাপকে খুন করবে। মেজ ভানিয়া বাপের মৃত্যু চেয়েছে। দস্তয়েভস্কি-র লেখা পড়ে মনে হয় বৃদ্ধ কারমাজভকে যে স্মেরদিয়াকভ হত্যা করল তার পিছনে নিহিলিস্ট ভানিয়ার প্ররোচনা ছিল। কেন না স্মেরদিয়াকভ বৃদ্ধকে মেরে যে অর্থ আত্মসাৎ করেছিল আত্মহত্যার পূর্বে সে-অর্থ দিয়ে গেল ভানিয়াকে।

পিতৃহত্যার দায়ে শেষ পর্যন্ত দ্‌মিত্রি দায়ী হল। নির্বাসিত হল সাইবেরিয়ায়। সে বলল : I want to suffer and by suffering I shall purify myself—এখানেই চরিত্রটি প্রকৃত জীবন্ত হল।

সেই চরম দুঃখের দিনে তার সাথী হল আলোয়শা। কেন না তার গুরুর উপদেশ—"Be no man's judge. Humble affection is a terrible power which effects more than violence; only active love can secure faith for us."

দস্তয়েভস্‌কি সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছ হৃদয়-মনের শিল্পী নন। মনোবিকারগ্রস্ত, প্রবৃত্তি-ক্ষিপ্ত, অপ্রকৃতিস্থ নরনারীর, তাদের অসুস্থ মনের বীভৎস কামনার সুদক্ষ বিশ্লেষক। সেজন্য দস্তয়েভস্‌কির সৃষ্ট জগতে যখন আমরা প্রবেশ করি তখন সহজেই তুর্গেনেভ ও তলস্তয়ের উপন্যাসলোকের সঙ্গে পার্থক্য বুঝতে পারি। শ্লাভ জাতির আদিম প্রাণধর্ম যেন দস্তয়েভস্‌কির রচনায় ছাড়া পেয়েছে। জনৈক সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি "Out-Freuded Freud"! কথাটি খুব সত্য। ফ্রয়েডের বহু পূর্বে তিনি অসুস্থ মনোবিকারের, সুপ্তকাম ও তার অবদমিত রূপের অপূর্ব রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ফ্রয়েড দস্তয়েভস্‌কির ব্যক্তি জীবনের মধ্যেই 'দি ব্রাদার্স কারমাজভ'-এর সূত্র দেখেছিলেন। দস্তয়েভস্‌কি-র বাবা ছিলেন সামান্য হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁর মা বিবাহিত-জীবনে সুখী ছিলেন না। দস্তয়েভসকি তাঁর মা-কে খুব বেশি ভালোবাসতেন। বাবা না থাকলে মা শান্তিতে থাকবেন এই গোপন ভাবনা তার মনে বাল্যেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই তার বাবা যখন হঠাৎ নিহত হলেন প্রজাদের হাতে তখন দস্তয়েভস্‌কির মনের সেই পাপবোধ জাগ্রত হল। তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হলেন, পরে খ্রীষ্টধর্মের আলোচনায় হয়ত শান্তি পেয়েছিলেন। এই উপন্যাসে মিতিয়া, ভানিয়া ও আলোয়শা তিনটি বিশেষ চরিত্ররূপকে প্রকাশ করেছে। একমাত্র উগ্রভাবে পরিপূর্ণভাবে ভোগের আকাঙ্ক্ষা মিতিয়া চরিত্রে, বুদ্ধি দিয়ে, 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টি দিয়ে, অবিশ্বাসী মন দিয়ে সব কিছু মানবিকবোধকে উড়িয়ে দেওয়ার মনোবৃত্তি ভানিয়া চরিত্রে আর ক্ষমা ও দয়ার চোখে মানুষকে দেখা আলোয়শা চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বৃদ্ধ কারমাজভ-এর যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

তা দেখলে রক্ত হিম হয়ে আসে, মন ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়। এত নীচ, পাষণ্ড, নির্মম, কামুক যে মানুষ হতে পারে—দস্তয়েভস্কির বই পড়ার আগে তা কারোরই মনে হয় না। কিন্তু তবুও এই চরিত্রের দিকে তাকিয়ে দস্তয়েভস্কির চরিত্রসৃষ্টির নিপুণতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাঁর চরিত্র-সৃষ্টি প্রসঙ্গে মম্ একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন: দস্তয়েভস্কির চরিত্রগুলি "are emanations of Dostoevsky's tortured, warped, morbid sensibility." ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার—

প্রগতিবিরোধী এবং অবক্ষয়ী দৃষ্টি হলে উচ্চ সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীর যে অপমৃত্যু ঘটে দস্তয়েভস্কির ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। এবং ঠিক সেজন্যই আজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের আমেরিকা ও পশ্চিম য়ুরোপ যখন চরম অবক্ষয় ও নৈতিক মূল্যহীনতায় অসুস্থ তখন দস্তয়েভস্কির সমাদর হঠাৎ শতগুণ বেড়ে গিয়েছে।

তলস্তয়ের হাতে রুষ উপন্যাস সার্থক পূর্ণতা লাভ করল। পুশকিন্ গোগল ও তুর্গেনেভের বলিষ্ঠ ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিভা অর্থাৎ উচ্চকোটির শিল্পীকল্পনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে যুক্ত করে তিনি যে উপন্যাস সৃষ্টি করলেন তার জ্যোতিষ্মান রূপ চির অ-ম্লান। পুশকিন-এর রোমান্সধর্ম, গোগল-এর সমাজনিষ্ঠতা তুর্গেনেভ-এর কবিদৃষ্টি ও প্রগতিশীল চেতনা, দস্তয়েভসকির দক্ষ মনোচিত্রণ সবই তলস্তয়ের রচনায় সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু তলস্তয় সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলেছেন। তাই মৃত্যুশয্যা থেকে লিখিত চিঠিতে তুর্গেনেভ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 'My friend, our great national writer' বলে। এ তার যোগ্য অভিনন্দন।

তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) এসেছিলেন পুশকিন ও তুর্গেনেভ-এর মতো বিত্তশালী উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখে তিনি সেনাদলে যোগ দেন। তাঁর প্রথম রচনা তাঁর আত্মজীবনী, 'Childhood, Boyhood and Youth'।

১৮৫৪-৫৬-এর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ফলশ্রুতি 'Sebastopol sketches'। কিছু দিন পরে তিনি সেনাবিভাগের পদ ত্যাগ করেন। তাঁর অর্থের অভাব ছিলনা। কাজেই তাঁকে চাকরি বা কোনও পেশা গ্রহণ করতে হয়নি। পরিপূর্ণ ভোগের জীবনই তিনি যাপন করেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি। এই জীবন-সম্ভোগের যুগে তিনি রচনা করেন 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (War and Peace)। পাশ্চাত্য দেশভ্রমণ, জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক চেতনা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও উদার কল্পনা—সবগুলি সংশ্লিষ্ট হয়ে তলস্তয়ের শিল্পীমনকে গঠন করেছে। সেই বিশ্বকর্মা মন রচনা করেছে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'—যার দিকে তাকিয়ে বলতে হয় 'সৃষ্টিরাদ্যেবধাতুঃ'। ফ্লোবার 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' পড়ে তুর্গেনেভ্‌কে লিখেছিলেন: "বইখানি পাঠাবার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এ একখানি প্রথম শ্রেণীর বই। কী শক্তিশালী চিত্রণ, কী নিপুণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। এর মধ্যে আমি সেক্‌সপীয়রের মতই মহান শিল্পীর প্রকাশ দেখেছি—পড়তে পড়তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি চীৎকার করেছি…।" এ প্রশস্তি অতিশয়োক্তি নয়। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-ই তার প্রথম উপন্যাস ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দীর্ঘকাল ধরে (১৮৬৪-৬৯) তিনি এই উপন্যাসখানি লিখেছিলেন। তাঁর পত্নীকে সাতবার এই সুদীর্ঘ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি 'নকল' করতে হয়েছিল।

"ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' যেন আধুনিক যুগের 'মহাভারত'। হেগেল আধুনিককালের উপন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন প্রাচীন মহাকাব্যের প্রাণশক্তির প্রকাশ ('manifestation of the spirit of epic')। টমাস মান এপিকের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিলেন মহাসাগরের। এই মহাসাগরকল্প এপিক হোমার-এর 'ঈলিয়ড'। হোমারীয় মহাকাব্যের মতই প্রবল প্রাণস্পর্ধী, বস্তুত'-মানবতায় সংসক্ত, জীবনোচ্ছ্বসিত অপূর্ব গদ্য-এপিক 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'। এপিকের মতই প্রায় পাঁচশো চরিত্র আছে এই বই-এ। প্রিন্‌স

ভ্যাসিলি, প্রিন্‌স অ্যান্‌ড্রু, পিয়ের বেজুখভ, নিকোলাস, নাটাশা, সোনিয়া, লিজি, হেলেন, আনাতোল, ডোলোকভ, কোন চরিত্রই তুচ্ছ নয়, অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য নয়। ছোট-বড়ো মিলিয়ে এই অগণ্য চরিত্রের কেউই স্খলিতপদ নয়—সবাই নিজের জোরে দাঁড়িয়ে আছে। বেজুখভ, রোসটভ, বোল্‌কোনস্‌কি ও কুরাগিন্—চারটি অভিজাতবংশের পারিবারিক জীবনের ঘটনাকে চতুরঙ্গ সেনাচালনার মত সব্যসাচী-দক্ষতায় তলস্তয় পরিচালনা করেছেন—পথভ্রষ্ট হন নি।

নেপোলিয়নের রুষ-অভিযানের আশঙ্কার কালো মেঘ ঈশান-কোণে দেখা দিলেও প্রথমে কেউই আমল দেয়নি। দেখতে দেখতে সেই মেঘ বজ্র-বিদ্যুৎ নিয়ে রুষিয়ার সমগ্র আকাশকে ছেয়ে ফেলল। ১৮০৫ থেকে ১৮১২ অবধি রুষিয়ার জীবনে যে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা বয়ে গেল, সেই ঝঞ্ঝার সঙ্গে সঙ্গে তার মানুষের জীবনও বিমথিত হল। এই কাল-পর্ব তলস্তয়ের জন্ম থেকে সামান্য কিছু আগের। তাই তাকে রোমান্‌সপন্থী কল্পনার পর নির্ভর করতে হয় নি—ঐতিহাসিক তথ্যচয়ন ও তীক্ষ্ণ ইতিহাস-চেতনায় তার শিল্পায়ন, তলস্তয়ের উপন্যাসে সার্থক হয়েছে। সেবাস্তপোলের যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল—ব্যক্তিজীবনের সেই অভিজ্ঞতার তিনি চূড়ান্ত ব্যবহার করেছেন 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এ।

ঊর্ধ্বে নেপোলিয়নী অভিযানের মেঘ-বজ্র-বিদ্যুৎ আর নিম্নে মানবজীবন-সাগরতরঙ্গের বিচিত্র উৎক্ষেপ—এই দুয়ের বলিষ্ঠ সংঘাত ও সমন্বয়ের রূপ এই বই-এ অঙ্কিত হয়েছে। অসটারলিজের যুদ্ধ, প্রথম আলেকজান্দার ও নেপোলিয়নের মধ্যে তিলসিটের সন্ধি, সন্ধিভঙ্গ, নেপোলিয়নের রুষিয়া-অভিযান, বোরোদিনোর যুদ্ধ, দগ্ধ মস্কোয় নেপোলিয়নের প্রবেশ ও প্রস্থান,—সবই পরিপূর্ণ সততায় (অবশ্য একজন রুষীয়ের চোখে) তলস্তয় চিত্রিত করেছেন। কিন্তু কেবল ইতিহাস পাঠের জন্য আমরা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' পড়িনা। মানুষের রহস্যময়ী খরস্রোতা জীবনতটিনী যে-ঋজু-বক্ররেখায় প্রবহমান হয়ে আবর্ত রচনা করে চলে, তার সঙ্গে ইতিহাসের অন্ধবেগ মিলে

পরস্পরের কণ্ঠ আঁকড়ে দুর্বার বেগে বহে চলেছে। সেজন্য কাহিনীর স্রোত কোথাও মন্দগতি হয় নি, চরিত্রগুলি কোথাও স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি—সবাই ছুটে চলেছে। ইতিহাস ও মানবজীবন এখানে পরস্পরকে রূপান্তরিত করেছে—যুদ্ধগর্ভ ইতিহাস এবং অপার-রহস্যময় মানবজীবনের এই অর্ধনারীশ্বর রূপ আজ পর্যন্ত একমাত্র 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এ সম্ভব হয়েছে। জনৈক সমালোচকের মনোজ্ঞ মন্তব্য সকল 'সহৃদয় সামাজিক'-ই মেনে নেবেন যে, এই বইখানি সত্যই "A complete picture of human life. A complete picture of the Russia of that day. A complete picture of what may be called the history and struggle of people. A complete picture of everything in which people find their happiness and greatness, their grief and humiliation. That is War and Peace."

চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে অহংকারী অভিজাত যোদ্ধা অ্যানড্রু, চিন্তাশীল হিতকামী পিয়ের ও প্রাণবতী নাটাশা। অ্যানড্রু ও পিয়ের এর মধ্যে তলস্তয়ের নিজের ব্যক্তিসত্তার পরস্পরবিরোধী দুটি দিকেরই প্রকাশ ঘটেছে। বোধকরি সেজন্যই চরিত্রদুটি দুটি গিরিচূড়ার মতো এই উপন্যাসের পটভূমিতে উচ্চশির। নাটাশার মধ্যে আদিম, স্বাস্থ্যবান, রক্তবর্ণী জীবনের জয়গান প্রচণ্ড কলরোলে ধ্বনিত হয়েছে। সদাস্ফুর্জমান তরুর মতো সে বেড়ে চলেছে। সে 'আদর্শ' চরিত্র নয়, তাই অ্যানড্রু-কে ভালোবেসে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েও—পরে পিয়ের-এর শ্যালক ভ্রষ্টচরিত্র আনাতোল এর সঙ্গে পালিয়ে যাবার প্রস্তাবে দ্বিধা করে নি। ধরা পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। আবার পিয়ের-এর মুগ্ধচোখের দৃষ্টিকেও সানন্দে স্বীকার করেছে। তারপর একদিন যখন অ্যানড্রু বোরোদিনের যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে ফিরে এল তখন নাটাশাই প্রাণ দিয়ে তার সেবা করেছে। নতুন করে

ঘোষণা করেছে প্রেমের শপথ। তবু অ্যানড্রু বাঁচলনা। কত রাত্রি কত দিন কাটল। ওদিকে মস্কোতে ফরাসী সৈন্যদের অত্যাচার থেকে একটি রুষ রমণীকে বাঁচাতে গিয়ে পিয়ের বন্দী হল। পরে নেপোলিয়নের রুষিয়া থেকে ফিরে যাবার পথে কসাকদের পালটা আক্রমণে সে মুক্ত হল। ইতিমধ্যে পিয়ের-এর স্ত্রী হেলেন মারা গেল। এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন পিয়ের পেল এক পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ। সে চাইল শুধু প্রাণভরে বেঁচে থাকতে—আর সেই সঙ্গে তার মধ্যে এল ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস। তখন সে এল নাটাশার কাছে। নাটাশা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আর আগের নাটাশা নেই। সে অনেক জেনেছে, অনেক বুঝেছে। সে গ্রহণ করেছে পিয়ের-কে। উর্বরা ভূমির মতোই সে সন্তানশস্যে ভরে উঠেছে। এই নাটাশার রক্তে প্রকৃতির আদিম শক্তি, জীবধাত্রী ভূমির ভূমিকা। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর মূল অংশে জীবনের এই পরিণতি দেখানো হয় নি। তার জন্য তলস্তয়কে প্রথম ও দ্বিতীয় Epilogue লিখতে হয়েছে। আর তিনি যে-পরিণতি দেখিয়েছেন সেই পরিণতিই স্বাভাবিক ও সত্য।

তলস্তয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ এক মহাকায় উপন্যাস লিখবার। রুষিয়ায় নেপোলিয়নী আক্রমণের পটভূমিকায় 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', ১৮২৫-এর জারবিরোধী ডিসেম্বরিস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় দ্বিতীয় এবং ১৮৫৬-এর ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পটভূমিকায় তৃতীয় খণ্ড রচনার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' রচনার কিছুদিন পর থেকেই তলস্তয়ের শিল্পীমানসের পরিবর্তন দেখা দেয় সেজন্য ঐ বইগুলি লেখা আর হয় না। মোটামুটিভাবে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', 'অ্যানা ক্যারেনিনা' ও 'রেসারেকশন' বই তিনখানিকে তলস্তয়ের শিল্পীজীবনের তিন-পর্বের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করা যেতে পারে।

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' লেখার পর 'অ্যানা ক্যারেনিনা' রচিত হয়। 'পিটার দি গ্রেট'-কে নিয়ে তাঁর একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস

লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে-সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করেন। এবার রচনা করলেন 'মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক' উপন্যাস। কিন্তু এই পর্বে জীবন-শিল্পী তলস্তয় এবং 'আদর্শবাদী দার্শনিক' তলস্তয়ের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে। যদি অ্যানা ক্যারেনিনা 'রুষিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বার না হত, তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত এই অনবদ্য উপন্যাসখানি অসমাপ্ত থেকে যেত। ১৮৭৫-এর জানুয়ারি মাস থেকে পর-পর তিনমাস নিয়মিতভাবে উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ বার হল। তারপর থেকে দীর্ঘ-বিরতির পর কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭৬-এর মার্চ-এ তিনি লিখেছেন—'At last I was driven to finish my novel, of which I am sick to death'। এই থেকে বোঝা যায় যে-শিল্পীউদ্যম 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' রচনা করেছিল সেই চেতনা বুঝি হঠাৎ স্তিমিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ আশঙ্কা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'অ্যানা ক্যারেনিনা' আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে রসিকসমাজে আদৃত হচ্ছে।

অ্যানার জীবনে একদিকে স্বামী অ্যালেকসাই অপরদিকে প্রণয়ী ব্রনস্‌কি। একদিকে সামাজিক-অনুশাসন অপরদিকে হৃদয়ের দুরন্ত আকর্ষণ। সামাজিক বিবাহিত জীবন ও অ-সামাজিক প্রণয়ী-জীবন এই দুয়ের তীব্র দ্বন্দ্বে অ্যানার জীবন ক্ষতবিক্ষত। সেই দ্বন্দ্ব তীব্রতম হয়েছে অ্যানার একদিকে প্রেমিক অপরদিকে সন্তানের প্রতি দুর্নিবার টানে। সেজন্যই Anna had not been divorced and positively refused to be divorced. এই নিষ্করুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ চলন্ত ট্রেনের তলায় স্বেচ্ছায় দেহ পেতে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে অ্যানা।

'অ্যানা ক্যারেনিনা'-র প্রারম্ভে বাইবেলের 'Vengence is mine, I will repay' বাণীটি তলস্তয় বসিয়েছেন। তলস্তয়ের শিল্পীমনে অ্যানার প্রতি গভীর সহানুভূতি ছিল। অ্যানার বিরুদ্ধে 'সমাজ' যে-নিষ্ঠুর, কঠিন প্রত্যাঘাত করেছে—তিনি যেন সেই

সমাজকে বেত্রাঘাত করতে চেয়েছেন। আত্মগর্বিতা অ্যানা দুরন্ত কামনার বশে সমাজধর্মকে পরোয়া করেনি সত্য কিন্তু তলস্তয়ের মতে বোধহয় ঈশ্বরই তার শাস্তি দেবার অধিকারী, তুমি-আমি কে। তিনি দেখালেন নিজের জীবন দিয়েই অ্যানা নিজের 'পাপ'-এর প্রায়শ্চিত্ত করেছে। জনৈক প্রখ্যাত সমালোচক এ সম্পর্কে লিখেছেন: "আধুনিক সাহিত্য ভ্রমরকে মর্যাদা দেয়, তা বলে রোহিণীকে গুলি করে মারেনা। বঙ্কিমের সমসাময়িক তলস্তয়, তাঁর অ্যানা ক্যারেনিনাকে রেলগাড়ির তলায় আত্মহত্যা করালেন। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক গলস্‌ওযার্দি এটাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিতে নারাজ হলেন। আধুনিক পাঠক গলস্‌ওয়ার্দির সঙ্গেই একমত হবে, তলস্তয়ের সঙ্গে নয়।" (সাহিত্যে সঙ্কট—অন্নদাশঙ্কর রায়)

কিন্তু সমালোচকের উক্ত মন্তব্য মেনে নিতে অনেকেই অস্বীকৃত হবেন। বঙ্কিমের রোহিণীর প্রতি প্রথম দিকে ঈষৎ সহানুভূতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণাই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রোহিণীর জীবনের শেষ-পর্বে তাকে মসীলিপ্ত করে অঙ্কিত করেছেন। সেজন্য গোবিন্দলালের গুলিতে রোহিণী নিহত হলেও পাঠকের মন আর্তনাদ করে ওঠেনা। কিন্তু অ্যানার প্রতি তলস্তয়ের ছিল গভীর সহানুভূতি। তার জীবনের ট্রাজেডি তিনি বাস্তবধর্মী শিল্পীর চোখেই দেখেছেন বঙ্কিমের মতো নীতিবাগীশের চোখে দেখেন নি। তাই অ্যানা যখন ট্রেনের তলায় নিজেকে সপে দিয়েছে তখন সারা বিশ্বের পাঠক হায়-হায় করেছে। তলস্তয়ের অ্যানার পরিণতি—অন্তর্-জ্বালাময় জীবনের ট্রাজেডি। সে জীবন সমুদ্রমন্থনের অমৃত ও গরলের একসূত্রে গাঁথা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' জীবনধর্মিতার চেয়ে নীতিধর্মকেই মেনেছে বেশি। অ্যানার জীবনের ট্রাজেডি প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা তথা বিবাহ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের অনিবার্য ট্রাজেডি। এই বাস্তবনিষ্ঠ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তলস্তয়ের অ্যানা কারেনিনাকে নবমূল্য দিয়েছে।

তলস্তয় অ্যানার জীবনে যে সুতীব্র দ্বন্দ্বের বেগ সঞ্চার করলেন

তাঁর পূর্বে প্রখ্যাত কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় সেই ট্রাজিক দ্বন্দ্ব দেখা যায়নি। ক্লারিশা হারলো নিঃসন্দেহে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কিন্তু তার চরিত্রটি ট্রাজিক নয়, প্যাথেটিক বা করুণ। স্তাঁদাল-এর মাদাম রেনল্ বা মাতিল্দ কারোর জীবনের পটে দুটি পুরুষের যুগপৎ আবির্ভাবে অনুরূপ দ্বৈরথ ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। 'মাদামবোভারি' উপন্যাসে ফ্লোব্যার এম্‌মা বোভারির যে-চিত্র এঁকেছেন, তার সঙ্গেও অ্যানার আদৌ তুলনা চলে না। ভিকটোরীয় যুগের ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্বপ্নেও এর কল্পনা করতে পারেনি। সেদিক থেকে অ্যানা ক্যারেনিনা novel of character হিসাবে নতুন পর্ব রচনা করেছে। তলস্তয়ের শিল্পীজনোচিত সহানুভূতি সবকয়টি চরিত্রের পর সমভাবে বিচ্ছুরিত। সাম্প্রতিক কালের সমালোচক ট্রিলিং এ-সম্পর্কে লিখেছেন: "Like Homer he scarcely permits us to choose between antagonists—just as we dare not give all our sympathy either to Hector or to Achilles, nor in their great scene, either to Achilles or to Priam, so we cannot say as, between Anna and Alexi or between Anna and Vronsky, who is right and who is wrong." অ্যানার স্বামী আলেক্‌সাই চরিত্রটিকে তলস্তয় খুব সতর্কভাবে গড়েছেন। ফ্লোব্যার তার চার্লস বোভারীকে তার দূরতম নৈকট্যেও আনতে পারেন নি।

এই উপন্যাসে অ্যানা-অ্যালেক্‌সাই-ব্রণস্‌কি-র পাশাপাশি কিটি-লেভিন-এর জীবন-আখ্যায়িকা বহে চলেছে। শেষে দুটি ধারা পরস্পর বিজড়িত হয়ে একটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ম্যাথু আরনল্ড অ্যানা কারেনিনাকে 'work of art'-এর চেয়ে 'piece of life' হিসেবেই মূল্যবান মনে করেছিলেন—কিন্তু সাম্প্রতিক কালের জনৈক সমালোচক লিখেছেন: "it is never the division but always the unity of art and life which makes the

illumination." লেভিন্ চরিত্রে তলস্তয় তাঁর ব্যক্তিজীবনের অজস্র ঘটনা, তাঁর বলিষ্ঠ আশা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা, সবকিছুকে ভরে দিয়েছেন। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসেই Artist তলস্তয়ের সঙ্গে Thinker-এর যোগ লক্ষণীয়। বিশেষত পিয়ের বেজুখভ-এ। অ্যানা ক্যারেনিনা-য় Thinker তলস্তয় আরও সুস্পষ্ট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন লেভিন্-এর মধ্যে।

পুশকিন্-কে শিল্পীহিসাবে তলস্তয় কী গভীর শ্রদ্ধা করতেন তার একটি সুন্দর উল্লেখ পাওয়া যায় 'অ্যানা ক্যারেনিনা' রচনা প্রসঙ্গে। ১৮৭৩-এর বসন্তকালের এক সন্ধ্যায় তলস্তয়ের বড়ো ছেলে তার পিসিমাকে পুশকিনের বেলিকিন্-এর গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল। এমন সময় তলস্তয় সে-ঘরে ঢুকলেন, বইটা টেনে নিয়ে পড়লেন: "The guests assembled in the country house"—তারপর বললেন গল্প এইভাবেই আরম্ভ করতে হয়। তারপর চলে গেলেন পড়ার ঘরে, লিখলেন: "In the Oblonsky house great confusion reigned"—এইভাবেই অ্যানা ক্যারেনিনার প্রথম লাইন লেখা হয়েছিল—পরে অবশ্য বদল হয়েছে।

তলস্তয়ের শেষের পর্যায়ের রচনা 'রেসারেকসন্' ১৮৯৭-এ প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর সপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। উপন্যাসখানি পড়বার পূর্বে পাঠকের চোখ পড়বে বাইবেল থেকে উৎকলিত বিভিন্ন বাণীর দিকে। প্রথম বাণীটি: "Then came Peter, and said to him, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Until seven times? Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven." Math. xviii. 24-22. এই কাহিনীর নায়ক নেখলিউডভ প্রথম যৌবনে মাস্লোভা নামে একটি যুবতী পরিচারিকার কৌমার্য হরণ করেছিল। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং মনিব-গৃহ ত্যাগ করতে এবং পরে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে তার ঘরে একজন

ব্যবসায়ী বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা যায়। মাস্‌লোভা নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে আদালতে আসে। সেই আদালতে জুরীর আসনে বসেছিল নেখলিউডভ। আসামীকে দেখে তার মনে গভীর অনুতাপ ও পাপবোধ জাগল। তার মনে হল শুধু তার অতীত পাপাচারের ফলেই মাস্‌লোভা আজ সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হচ্ছে। সে মাস্‌লোভার সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইল, উকিল নিযুক্ত করল, সবরকম তদবির করল মাস্‌লোভাকে বাঁচাতে কিন্তু হল না। মাস্‌লোভাও স্বীকার করেনি তার এই প্রচেষ্টাকে—সে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় জেনেছে অভিজাত, জমিদার শাসক সমাজকে। সে বলেছে: "So you want to save your soul through me, eh? In this world you used me for your pleasure and now you want to use me in the other world to save your soul." অন্যদিকে নেখলিউডভ নিজের সম্পত্তি চাষীদের স্বার্থে তাদের সঙ্গে বিলিবন্দোবস্ত করে নিল—আর চলল সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত দলটির সঙ্গে। সে কৃতসঙ্কল্প হল মাসলোভাকে বিয়ে করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাস্‌লোভা বিয়ে করল একজন নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীকে। বলল: "'No Dmitry Ivanich, you must forgive me if I am not doing what you wish.' and she looked at him with her unfathomable squinting eyes. 'Yes, evidently that's how it must be. You, too, must live'" নেখলিউডভ ফিরে চলল। সে তার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল বাইবেলে।

অ্যানা ক্যারেনিনা-র কাহিনীর পিছনে যেমন একটি সামাজিক সত্য ঘটনা ছিল, তেমনি রেসারেকসন্‌-এও। তলস্তয়ের ব্যক্তি-জীবনের ঘটনা এবং জীবনচর্যার আদর্শ নেখলিউডভ-এর মধ্যে খ্রীষ্টীয় আত্মশুদ্ধির মতো বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসে তলস্তয়ের আচরিত ও ব্যাখ্যাত খ্রীষ্ট-আদর্শ রূপায়িত হয়েছে। ওয়ার অ্যাণ্ড

পীস বা অ্যানা ক্যারেনিনার মহান শিল্পীকে 'রেসারেকসন্'-এ সম্পূর্ণ যেন পাওয়া যায় না। তবুও রেসারেকসন্-এ রুষ সমাজ, শাসনপদ্ধতি, কারাজীবন, রাজনৈতিক কর্মীদের জীবন ও চিন্তাধারা বাস্তবনিষ্ঠরূপে চিত্রিত হয়েছে। জীবনশিল্পীরূপে যে তলস্তয়ের একদা আবির্ভাব হয়েছিল রেসারেকসন্-এ সেই তলস্তয়ের মহাপ্রস্থানের আগেয় স্বাক্ষর। নেখলিউডভ-কে বাদ দিলে (কেননা ঐ চরিত্রে তলস্তয়ের আদর্শের প্রতীক খাড়া করা হয়েছে) অন্য সব চরিত্রই অপূর্ব জীবনধর্মী। সাধারণ কয়েদী বা রাজনৈতিক বন্দীদের তিনি দেবতা বা দুশমন কিছুই করেন নি। তাদের মানুষই গড়েছেন।

মহানশিল্পী তলস্তয়ের পতাকা রুষ সাহিত্যে পরবর্তীকালে বহন করেছেন মিখেইল শোলোকভ, অ্যালেকসাই তলস্তয়, ইলিয়া ইরেনবুর্গ আর অস্ত্রোভস্কি। বিদেশী সাহিত্যে রমাঁ রলাঁ, গলসওয়ার্দি, টমাস মান তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

উপন্যাসের বিকাশ :

(ইংরেজি সাহিত্য—উনিশের শতক)

রিচার্ডসন-ফিলডিং যুগের পর ইংরেজি উপন্যাসকে সুপরিণত ও সমৃদ্ধ রূপ দান করেন স্কট, জেন অসটেন, ডিকেনস, থ্যাকারে, ব্রন্‌টি ভগ্নীদ্বয়, জর্জ এলিয়ট, মেরিডিথ ও হার্ডি। স্কট ও জেন অসটেন সমকালীন। যদিও দুজনের সাহিত্যসাধনার পথ ভিন্ন। বিগতযুগের ইতিহাসকে স্কট কল্পনাশক্তিতে নতুন ও প্রাণবন্ত করে রচনা করলেন। তাঁর প্রতিভা-স্পর্শে অহল্যা-অতীত যেন অপরূপ মূর্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্কট (১৭৭১-১৮৩২) ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্তিক যুগের যোগ্য লেখক। তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'গুলি অতীত-ভিত্তিক রোমান্তিক কল্পনাপ্রবণতার সাক্ষ্যবহ। জেন

অসটেন (১৭৭৫-১৮১৭) ভিন্ন পথে গিয়েছেন, তিনি যেন 'age of reason'-এর শেষ স্বাক্ষর, অংশতঃ ফিলডিং-এর পথযাত্রিনী।

স্কটল্যাণ্ডের মানুষ ওয়ালটার। দেশের অতীত ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও লোকশ্রুতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও গর্ব। বাল্যকালে তিনি তাঁর মা এবং ঠাকুরমার কাছে গভীর আগ্রহে শুনতেন স্কটল্যাণ্ডের পুরোনো যুগের কথা ও কাহিনী, যুদ্ধগাথা। বাল্যশ্রুত এই কথা ও কাহিনী ওয়ালটারের মনে যুগপৎ স্বদেশপ্রীতি, রোমানস্ ও ইতিহাসপ্রীতির সঞ্চার করেছিল। তারই পরিণত ফল স্কটের ধরাজয়ী 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'গুলি। ইংরেজি সাহিত্যে উত্তরকালে কাম্য স্বীকৃতিলাভ না করলেও তাঁর রচনা ফরাসী সাহিত্যে বালজাক, হুগো, মেরিমি ও দুমার রচনায়, রুষসাহিত্যে পুশকিন, গোগল ও তলস্তয়ের রচনায়, বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের রচনায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতালীয় ও হাঙ্গেরীয় কথা সাহিত্যেও স্কটের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আঠারোর শতকের একেবারে শেষের দিকে ১৭৯৮-এ 'লিরিকাল ব্যালাডস' বার হয়। তারও কিছু আগে গ্রে, গে, টমসন, কুপার প্রভৃতির রচিত কবিতার মধ্য দিয়ে রোমান্তিকতার সূচনা হয়েছিল। 'লিরিকাল ব্যালাডস'-এ সেই ধারা বেগবতী হল। কিন্তু 'লিরিকাল ব্যালাডস' প্রকাশের প্রায় ত্রিশবছর আগে বিশপ পার্সি তিনখণ্ডে 'Reliques of Ancient English Poetry' সঙ্কলন করে বার করেন। লোকগীতি ও লোকগাথার এই অনবদ্য সঙ্কলন ছাত্রবয়সে স্কটের মন কেড়ে নিয়েছিল।

ওয়ালটার-এর যুগ ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্তিক কাব্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পর্ব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস, বায়রন— সবাই এই পর্বের বরণীয় কবি। ওয়ালটার যখন ১৮০৫-এ The Lay of the Last Ministrel রোমান্তিক গাথাকাব্য রচনা করেন তখন তিনি যথাযোগ্য সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। তাঁর অপর কাব্য The Lady of the Lake তার পাঁচ বছর পরে

প্রকাশিত হলে তাঁর নাম মুখে-মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। কিন্তু বায়রনের 'চাইলড হ্যারল্ড' কাব্য যেই প্রকাশিত হতে লাগল (১৮১২) ওয়ালটারের কবিখ্যাতি ম্লান হল। ওয়ালটার পদ্য ছেড়ে গদ্যে এলেন আর ১৮১৪-এ বার হল তাঁর 'ওয়েভরলি' উপন্যাস।

ইতিহাস-চর্চা এবং উপন্যাস-রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে এই দুটি ধারাই যখন সমশক্তিসম্পন্ন হয় তখনই সার্থক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচিত হতে পারে। আঠারোর শতকের ইংরেজি সাহিত্যে ইতিহাস-চর্চার নিদর্শন প্রচুর। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে গিবন্-এর 'The Decline and Fall of the Roman Empire'। আর একদিকে ডেফো, রিচার্ডসন, ফিলডিং, স্মলেট-এর হাতে উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট শিল্পরূপ নিতে শুরু করেছে। এই দুটি ধারার যোগাযোগ ঘটল ওয়ালটার-এর 'ওয়েভরলি' উপন্যাসে। স্কটল্যাণ্ডের লোক হয়ে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর জয়পতাকা প্রোথিত করলেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ওয়ালটারের জন্মকালে স্কটল্যাণ্ডের সর্বাত্মক জাগ্রত যৌবন। আঠারোর শতকের স্কটল্যাণ্ডের ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী এবং চাষী সকলেরই অবস্থা বেশ ভালো ছিল। আর এই কালেই স্কটল্যাণ্ডে দেখা দিয়েছিলেন হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, রবার্টসন, স্মলেট, বস্‌ওয়েল, বার্নস্ প্রভৃতি শ্রুতিকীর্তিরা। তাই এ-যুগ যথার্থই স্কটল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ। সেই যুগপর্বে ওয়ালটার তাঁর গাথাকাব্য ও 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র মারফতে অতীতের স্কটল্যাণ্ডকে স্থাপিত করলেন সমকালীন ইউরোপের বুকে।

ওয়ালটারের 'ওয়েভরলি' গোত্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হবার পূর্বে আঠারোর শতকে কয়েকখানি 'তথাকথিত' ঐতিহাসিক উপন্যাস (যেমন শ্রীমতী রাডক্লিফের 'গথিক' পর্যায়ী উপন্যাস) লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে প্রধান সম্পদ অর্থাৎ ঐতিহাসিক কল্পনাবোধ (historical

imagination) তার অভাব ছিল পূর্ণমাত্রায়। কাল্পনিক ইতিহাস-বোধ ও ঐতিহাসিক কল্পনাবোধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাছাড়া শুধু ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাপঞ্জী সাজিয়ে দিলেও 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হয় না। ঐতিহাসিকের মুখ্য কাজ ঐতিহাসিক তথ্যকে উপস্থাপিত করা, ব্যাখ্যা করা। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রধান কর্তব্য ঐতিহাসিক কল্পনাবোধের দ্বারা বিশেষ-বিশেষ যুগের সর্বস্তরের নর-নারী, তাদের বিপুল সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের, বেগ, দৃশ্য ও ঘটনাকে 'জীবন্ত' করে তোলা। নিজেকে বর্তমানের পটভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে সেই অতীত যুগের সংবেদনশীল দর্শকে রূপান্তরিত হওয়া। সেই জাতিস্মর-ধর্ম আর সংস্কৃত আলংকারিক ঘোষিত 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা' স্কটের ছিল সেজন্য 'imaginative re-creation of the life of the past' তাঁর রচনায় সফল হয়েছে। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের প্রতিপক্ষ নয়, ইতিহাসের পরিপূরক (supplement)। সেজন্য স্কটের কৃতিত্ব বোঝাতে গিয়ে জনৈক সুধী সমালোচক বোধ করি ঠিকই বলেছেন 'he did more for history than any professed historian.'

'ওয়েভরলি'-র প্রথম প্রকাশকে একজন সমালোচক বর্ণনা করেছেন 'burst upon the world like Minerva from the head of Zeus.' যুদ্ধ ও প্রণয় চিরদিনই ঐতিহাসিক রোমান্স বা উপন্যাসের কথাবস্তু, 'ওয়েভরলি' তারই নিদর্শন। 'The whole adventures of Waverley' (স্কটের নিজের ভাষায়) পাঠকদের কাছে ইতিহাস ও রোমান্স উভয়েরই স্বাদ যোগাল। তারপর অশ্বমেধের অশ্বের মত ললাটে জয়পত্র বেঁধে 'ওয়েভরলি' যাত্রা করল।

স্কটের রচনার একদিকে স্কটিশ উপন্যাস 'গাই ম্যানারিং' 'ওল্ড মরটালিটি' 'দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর' এবং অন্যান্য বই অপরদিকে 'আইভান হো', 'কেনিলওয়ার্থ', 'দি ফরচুনস অব নীগেল' ইত্যাদি

উপন্যাসগুলি যেগুলি স্কটল্যাণ্ডকে নিয়ে রচিত নয়, ইংলণ্ডের ইতিহাসাশ্রিত।

'গাই ম্যানারিং'-এ 'দি অ্যানটিকোয়ারি'-র ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচিত হলেও ঠিক কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসখানি লেখা নয়। ভূমিকায় স্কট বলেছেন যে ওয়েভরলি, গাই ম্যানারিং এবং দি অ্যানটিকোয়ারি উপন্যাসত্রয়ীতে তিনি তিনটি বিভিন্ন কাল-পর্বে স্কটল্যাণ্ডের মাটি ও মানুষের জীবনধারা কি ভাবে প্রবাহিত হয়েছিল সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। 'দি অ্যানটিকোয়ারি'র কাল-পর্বে আঠারোর শতকের প্রায় শেষের দিক—স্কটের নিজেরই জীবৎকালসীমা। তাঁর স্কটিশ পর্যায়ের অন্য তিনখানি বিখ্যাত উপন্যাস 'ওল্ড মরটালিটি' 'দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর' এবং 'দি হার্ট অব মিডলোথিয়ান্'—'Tales of my Landlord' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। 'ওল্ড মরটালিটি'-তে স্কট রেসটোরেশন যুগের দ্বিতীয় চার্লস্-এর সময়কার চাঞ্চল্যকর ঘটনা এবং ১৬৮৫র কোভেন্যান্টারদের উত্থানের যুগকে তুলে ধরেছেন। আলোচ্যযুগের নরনারী, রীতিনীতি, ঘটনা ও ভাবাদর্শ স্কটের লেখনীতে প্রাণবন্ত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে—ঐতিহাসিক ঘটনা ও রোমাণ্টিক কাহিনীর চমৎকার মিলন ঘটেছে। 'দি হার্ট অব মিডলোথিয়ান্'-এ পারিবারিক জীবনের দিকটি বেশি ধরা পড়েছে। কিন্তু তার জন্য ইতিহাস-ভিত্তিক গদ্য এপিক হবার পথে তার কোনও বাধা হয় নি। স্কটল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ, বিচিত্র স্তরের মানুষ, কৃষক নরনারী এই উপন্যাসে জীবন্ত রূপে দেখা দিয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্কটের যোগ কত ঘনিষ্ঠ ছিল তার পরিচয় কৃষককন্যা তেজস্বিনী জেনি ডীন্স্, এফি ডীন্স্, ডেভিড, র‍্যাট্‌ক্লিফ, (যেন ফিল্ডিং এর জোনাথন্ ওয়াইল্ড), ডানকান নক্—শহর ও গ্রামের, বিভিন্ন বৃত্তির অগণ্য মানুষের আলেখ্য রচনায় এই উপন্যাস এপিক-কল্প হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিকতার আবির্ভাব ফ্রান্সের ১৭৮৯এর মহান বিপ্লব এবং ইংলণ্ডের শিল্প-

বিপ্লবের সমকালীন ঘটনা। ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চেতনা শেলী-বায়রণের কাব্যে দীপ্যমান। কিন্তু স্কট ছিলেন সবদিক থেকে টোরি পন্থী, বৈপ্লবিক আদর্শকে গ্রহণ করবার মন তাঁর ছিল না। তবে শিল্পবিপ্লবের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের দিকটি তাঁর ঐতিহাসিক চোখ এড়ায় নি। জনসন্-এর যুগের মুখ্যত ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিপ্রধান ইংল্যাণ্ড তখন শিল্পপ্রধান 'workshop of England'-এ পরিণত হচ্ছিল তার ফলে হাজার রকমের নতুন সম্পর্ক, নতুন চিন্তার সম্ভাবনা ঘটেছিল। তার সুস্পষ্ট পরিচয় 'হার্ট অব মিডলোথিয়ান'-এ ছড়িয়ে আছে। আঠারোর শতকের স্কটল্যাণ্ডকে নিয়ে লেখা উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে 'সমাজ-অনুগ' ঐতিহাসিক উপন্যাস বললেই ঠিক হয়। এবং সেখানেই এই উপন্যাসগুলির জোর। এই জোরের আরেকটি কারণ স্কটিশ উপভাষার প্রয়োগ।

'টেলস্ অব মাই ল্যাণ্ডলর্ড'-এর অপর অংশীদার 'দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর' স্কটের ঔপন্যাসিক হিসাবে দক্ষতা নয়, অক্ষমতার প্রমাণ। 'দি হার্ট অব মিডলোথিয়ান্' এর সঙ্গে সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য নয়, ভীতিপ্রবণতা এবং ভাবালুতায়, যেন সেই 'গথিক' উপন্যাসেরই সগোত্র, যার বিরোধিতা করা নিয়ে তার আবির্ভাব। স্কটিশ উপন্যাস-গুলির কাল স্কটের জীবৎকাল থেকে সুদীর্ঘ ব্যবধানের নয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস নিয়ে তিনি যেখানে লিখেছেন সেখানে চলে গিয়েছেন প্রথম রিচার্ড ও ক্রুসেড্ এর যুগে ('আইভান হো'), প্রথম জেমস্-এর রাজত্বকালে (দি ফরচুন্স অব নীগেল') অথবা এলিজাবেথের স্মরণীয় পর্বে ('কেনিলওয়ার্থ')। স্কট তার 'আইভান হো' উপন্যাসকে আখ্যা দিয়েছেন 'a fictitious narrative' এবং এই উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ নির্ভর করবে তাঁর মতে "upon marvellous and uncommon incidents।" রবীন্দ্রনাথ 'আইভ্যান হো' প্রসঙ্গে লিখেছেন : "য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধ যাত্রাযুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কটের আইভ্যান হো-র মধ্যে চিরন্তন মানব-ইতিহাসের যে নিত্য সত্য আছে তাহাও আমাদের জানা

আবশ্যক। এমনকি তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশি যে ক্রুজেড যুগ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ পাইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও ছাত্রগণ অধ্যাপক ফ্রীম্যানকে লুকাইয়া আইভ্যানহো পাঠ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবে না।"

'দি ফরচুনস অব নীগেল' এবং 'কেনিলওয়ার্থ' সম্পর্কেও ঐ কথা সত্য। স্কটের এই ঐতিহাসিক রোমানসগুলিতে বহির্ঘটনার সমুদ্রতরঙ্গ কখনও শান্ত কখনও উত্তুঙ্গ হয়ে পাঠকমনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অথবা চুম্বক লৌহের মতো পাঠকমনকে ঘটনাকীর্ণ পথের পর দিয়ে ক্রমাগত সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করে চলে। কিন্তু স্কট তাঁর এই রোমানসগুলিতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাকে সর্ব-প্রধান স্থান দেননি। কেননা তাঁর মতে "it is unwise to unload too much history into the plot of a novel" এবং "it is not desirable to have real historical figures among the leading characters." স্কট যে যুগকে নিয়ে রচনা করতেন সেই যুগটিকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর প্রধান কাজ ছিল। আইভানহো, দি ফরচুনস অব নীগেল এবং কেনিলওয়ার্থ পড়লে সেই কথাই মনে হবে। তবু প্রথম রিচার্ড, প্রথম জেমস ও রানী এলিজাবেথের চরিত্রগুলি পাঠকের কাছে ইতিহাসের পাতা ছেড়ে সহসা যেন সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু উপন্যাসের আখ্যানের দিক থেকে তারা অপেক্ষাকৃতভাবে গৌণ। 'আইভানহো' উপন্যাসে প্রথম রিচার্ড ও জন চরিত্র ইতিহাস-স্বীকৃত কিন্তু যাদের নিয়ে প্রকৃত আখ্যান সেই আইভানহো, লকসলে, ইহুদী আইজাক, গিলবার্ট, ব্ল্যাক প্রিন্স এবং রেবেকা ও রাওয়েনা চরিত্রগুলি ইতিহাসগ্রন্থ থেকে আহৃত নয়। 'দি ফরচুনস অব নীগেল' এবং 'কেনিলওয়ার্থ' সম্পর্কে একই রীতি অবলম্বিত হয়েছে।

ই. এম. ফরস্টর স্কটের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে খুব বড়ো কোনো গুণ দেখতে না পেলেও স্বীকার করেছেন যে স্কট

চমৎকার করে গল্প বলতে পারতেন। গল্প শোনার যে-আদিম প্রবৃত্তি মানবমনে সদা-জাগ্রত, সেই মৌল-ঔৎসুক্যকে তৃপ্ত করবার ক্ষমতা স্কটের ছিল "he had the primitive power of keeping the reader in suspense and playing on his curiosity." স্কটের উপন্যাসে প্লটের বাঁধুনি বা গাঁথুনি কোনোটিই খুব সুদৃঢ় নয়। ফরস্টর আরও একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন—স্কটের উপন্যাসে 'প্যাসান' (passsion) এর অভাব এবং এই 'প্যাসান'-এর অভাবের জন্যই তাঁর মতে স্কটের উপন্যাস উঁচুদরের শিল্প হতে পারে নি। অভিযোগটি অসত্য নয়। তিনি 'অরথোডক্স' (orthodox) রক্ষণশীল পিউরিটান,—সেজন্যই নর-নারীর প্রণয়-সম্পর্কের, জীবন্ত চিত্র তিনি আঁকতে পারেন নি। অন্যদিকে পারিবারিক জীবনের চিত্র রচনায় তাঁর শক্তির অভাব তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—"The exquisite touch which renders ordinary commonplace things and characters interesting from the truth of description and the sentiment is denied me." এই প্রসঙ্গে আরও মনে হয় স্কট ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছেন সত্য কিন্তু 'marvellous and uncommon incidents'-এর অকৃপণ প্রযোগের ফলে জ্যোতিষ, ভবিষ্যদবাণী, স্বপ্ন, ছায়া-দর্শন প্রভৃতি অলৌকিক বস্তুও তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। (এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কথা মনে হবে)। অবশ্য 'দি ফরচুনস অব নীগেল'-এ তিনি এই অলৌকিকত্ব থেকে সরে আসার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন "There are no dreams or presages or obscure allusions to future events." এ সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে স্কট 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'কে পৃথিবীতে অমর করে রেখে গেছেন—সারা পৃথিবীর কথা সাহিত্য তাঁর ঋণ শোধ করেছে পরবর্তী কালে।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' পর্যায়ের রচনায় স্কট সারা দুনিয়ার কথাসাহিত্যের উপর প্রভাব ছড়িয়েছেন। তাঁর সমকালীন লেখিকা

জেন অস্টেন (১৭৭৫-১৮১৭) দেশের বাইরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি সত্য কিন্তু ইংরেজি উপন্যাসের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর দান উল্লেখ করবার মতো। আঠারোর শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রতিষ্ঠা। তারই ফলে আঠারোর শতকের শেষভাগে শ্রীমতী রাডক্লিফ মারিআ এজওয়ার্থ, জেন অস্টেন, হান্না মোর, ফ্যানি বার্ণি প্রভৃতি লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু এঁদের মধ্যে 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে একমাত্র জেন-এর রচনাই বেঁচে আছে।

জেন পল্লীযাজকের মেয়ে, ভাইবোনদের সঙ্গে বাড়িতেই পড়াশুনা করেছেন। তিনি মহানগরীতে বাস করেন নি, সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার কথা ভাবেননি। ফরাসীবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) দুই-ই তাঁর সমকালীন ঘটনা হলেও তাঁর রচনায় তাদের কোনও ছাপ নেই। তাঁর সময়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাজাত অর্থনৈতিক বৈষম্যগত শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠলেও তাঁর রচনায় শ্রেণী স্বার্থের শ্রেণী বৈষম্যের পর্যালোচনা নেই। সে-দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। এইসব কারণে সমালোচক রবার্ট লিডেল জেন অস্টেন-এর উপন্যাসকে 'Pure Novel' বা 'বিশুদ্ধ উপন্যাস' পর্যায়ে ফেলবার পক্ষপাতী। সমাজে ধনী-দরিদ্রের প্রচলিত কাঠামোকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন যদিও ধনীপরিবারের নাকউঁচু আত্মম্ভরিতাকে কটাক্ষ করতে কসুর করেন নি। তিনি সমাজের মধ্যবিত্ত-স্তরকে বিশেষত পল্লীঅঞ্চলের মধ্যবিত্তসমাজের ভদ্র, সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থদেরই জানতেন তাদের জীবনকেই তিনি এঁকেছেন। শ্রীমতী রাডক্লিফের চমকপ্রদ অবাস্তব 'গথিক' রোমান্স-এর প্রতিবাদ হিসেবেই জেন তাঁর বাস্তবজীবনরসপরিপূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন। 'ম্যানসফিল্ড পার্ক' এ তাঁর নিজের বক্তব্যই বলা হয়েছে: "Let other pens dwell on guilt and misery. I quit such odious subjects as soon as

I can." পারিবারিক জীবনের ছোটখাটো মেঘ ও রৌদ্রের তিনি দরদী নিপুণ রূপশিল্পী। 'এমমা' উপন্যাসে নাইটলি-কে এমমা বলেছে: "Nobody who has not been in the interior of a family, can say what the difficulties of any individual of that family may be"—জেন অস্‌টেন-এর উপন্যাসের একটি সঙ্কেত এই উক্তির মধ্যে নিহিত। রিচার্ডসন এবং ফিল্‌ডিং-এর ঐতিহ্য জেন বহন করেছেন একথা স্বীকার্য। তবে 'ক্লারিশা'-র মতো ট্রাজিক উপন্যাস জেন লেখেন নি। তিনি কমেডি ও হিউমার-এর অনুরাগী। ফিল্‌ডিং তাঁর উপন্যাসকে 'Comic epic in prose' আখ্যাত করেছেন, জেনও তাতে সায় দিয়েছেন। বস্‌ওয়েল-এর মতে জনসন, রিচার্ডসন ও ফিল্‌ডিং-এর চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন characters of nature এবং characters of manners সংজ্ঞায়। জেন-এর রচনায় মুখ্যত 'characters of nature' ধারা অনুসৃত হয়েছে। হেনরি জেমস্ লিখেছেন এবং বোধহয় ঠিকই লিখেছেন: "Women are delicate and patient observers." সেই নিপুণ ও সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি জেন-এর চরিত্রসৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর এই চরিত্রচিত্রণ ফ্লেমিশ চিত্রকলার মতো 'finished up to nature'.

জেন পল্লীযাজক পিতার মেয়ে, একান্ত স্বাভাবিক কারণে নীতিগত মূল্যবোধকে তার সমস্ত রচনায় মিশিয়ে দিয়েছেন, বাড়িয়ে তোলেন নি। কিন্তু তাঁর রচনা didactic উপন্যাস নয়। তার কারণ তিনি মনেপ্রাণে মূলত শিল্পী। গ্যেটের 'Sorrows of Werther'-এর মতো আবেগধর্মী রোমান্তিক উপন্যাস যেমন তাঁর প্রিয় ছিল, তেমনি প্রিয় ছিল সেকস্‌পীয়রের নাটক। এবং ভাবতে সানন্দ-বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যে 'লিরিকাল ব্যালাডস্' প্রকাশেরও একবছর আগে জেন-এর 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্'-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন জেন-এর বয়স মাত্র একুশ। আর এই বই ডিজরেলি পড়েছিলেন

সতেরোবার। 'লিরিকাল ব্যালাডস্'-এর ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে জেন-এর একটি জায়গায় মিল আছে—পল্লীজীবনের আলেখ্যরচনায়। কিন্তু পল্লীজীবনের আলেখ্যরচনা বললে জেন-এর পূর্ণ পরিচয় ফুটে ওঠে না। পরিচিত নরনারীর পারিবারিক জীবনের বাস্তব রস ও রহস্য, তাদের প্রণয়, বিরহ, পুনর্মিলন—বিবাহ অতি সহজ অথচ সূক্ষ্মবয়ণে তিনি উপস্থাপিত করেছেন আমাদের কাছে। তাই স্কট জেন অস্টেন সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন: "That young lady had a talent for describing the involvements, feelings and characters of ordinary life which is to me the most wonderful I have ever met with." যাকে আমরা 'passionate love' বলতে অভ্যস্ত, সেই কামনার বন্যা জেন-এর উপন্যাসে বহে যায় নি। একটি শান্ত সংযম তাঁর রচনায় ছায়াবিকীর্ণ। কোথাও ভাবালুতা, অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই। সেদিক থেকে তাঁর রচনায় ক্লাসিকধর্মী স্বচ্ছতা বিগুমান।

'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্'-এর গল্প সুন্দর ঝরঝরে ভাষায় বলা হয়েছে। সবযুগে গল্প বলতে মেয়েরাই ভালো পারেন। জেন তার গল্প চমৎকার করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলেছেন। গল্প বলার এই কৃতিত্ব এম্মা, ম্যান্সফিল্ড পার্ক, পারসুয়েসান্ প্রভৃতির সর্বত্র দৃশ্যমান। তবে 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্'-এর গল্পের চেয়ে শেষের দিকের রচনায় প্লট আরও জটিল, চরিত্রগুলির চলাফেরা আরও ঘোরানো পথে,—কিন্তু তার দ্বারা জেন-এর উপন্যাসের মর্মবদল হয়নি। সেজন্যই প্রায় একধরনের চরিত্র বারে বারে দেখা দিয়েছে। 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্'-এ বহু চরিত্র ও বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও এর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে—'প্রাইড'-এর প্রতিমূর্তি ডারসি এবং 'প্রেজুডিস্'-এর মূর্তিমতী এলিজাবেথ। দুটি চরিত্রই ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল কিন্তু কেউ নিজের জিদের মাটি ছাড়ে নি, যদিচ দুজনেই মনে-মনে পরস্পরকে ভালোবেসেছে। শেষে সর্বজয়ী সেই ভালোবাসার কাছে 'প্রাইড' ও 'প্রেজুডিস্' উভয়েরই হার হল। ধনী ও অহংকারী

ডারসি হৃদয়ের আহ্বানে অনভিজাত কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়েটিকে নত হয়ে বরণ করল, এলিজাবেথও তার বিমুখতা ভুলল, বোন জেনকে বলল : "It is settled between us already that we are to be the happiest couple in the world." মনস্তত্ত্বের কুশলী বিশ্লেষণ জেন-এর প্রথম উপন্যাসেই লক্ষণীয়। এই প্রথম পদক্ষেপেই রিচার্ডসনকে তিনি প্রায় অতিক্রম করেছেন।

জেন-এর উপন্যাস শিল্পগৌরবে কালজয়ী হয়েছে। এই শিল্প-দক্ষতার মূল রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর চরিত্র-সৃষ্টি ও ঘটনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকারসুলভ প্রয়োগকৌশলে। সেকস্‌পীয়রের নাটক তাঁর প্রিয় বই ছিল এবং তার প্রভাব জেন অস্‌টেন-এর রচনায় সহজলক্ষ্য। সাধারণ ঔপন্যাসিকেরা যেমন বিস্তৃত বর্ণনা বা description-কে অবলম্বন করে থাকেন, জেন সেরকম করেন নি। তিনি তার পরিবর্তে 'নাটকীয় উপস্থাপনা' বা dramatic presentation-রীতিকে গ্রহণ করেছেন। সমালোচক জি. এইচ. লিউয়েস লিখেছেন : "instead of telling us what her characters are, and what they feel, she presents the people, and they reveal themselves."

কিন্তু জেন দীর্ঘকাল সাহিত্যসাধনায় ব্রতী থাকতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুতে স্কট যে-কথা বলেছিলেন সে-কথা চিরকালের উপন্যাস পাঠকসমাজের : "What a pity that such a creature died so early."

ভিক্টোরীয় যুগের (১৮৩৭-১৯০১) ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ডিকেন্‌স কে (১৮১২-৭০)। তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে পদসঞ্চারের পূর্বেই জেন অস্‌টেন ও স্কটের মৃত্যু হয়েছে। ডিকেন্‌স জেন অস্‌টেন বা স্কট কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। জেন অস্‌টেন-এর মতো ছোট পরিধিতে গড়া সমাজ ও নরনারীর শান্ত-মধুর হৃদয়সম্পর্কের কথাচিত্র তিনি আঁকেন নি। স্কট-এর

মতো 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচনার প্রবণতাও তাঁর ছিল না যদিও তিনি ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় 'এ টেল অব টু সিটিজ' লিখেছিলেন। কারলাইল-এর 'ফরাসী বিপ্লব' বইখানি তিনি পড়েছিলেন, এবং 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র দিক থেকে 'এ টেল অব টু সিটিজ' উল্লেখযোগ্য রচনা হলেও ডিকেন্স ঐ পথে আর অগ্রসর হন নি। একদিকে জেন অস্টেন-এর পারিবারিক জীবনের ছবি অন্যদিকে স্কটের মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক রোমান্সের জগৎ এই দুয়ের ভিতর দিয়ে ডিকেন্স চলে এলেন সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতার পথ কেটে। এই বাস্তবতা ডিকেন্স-এর দান নয়। তাঁর বহুপূর্বে ইংরেজি উপন্যাসে ডেফো, সুইফট্, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্মলেট এই পথ তৈরি করেছেন। সেই পথেই ডিকেন্স এসেছেন। যে 'পিকারেস্ক' উপন্যাস সারভেন্টিস্-এর 'ডন কুইকজোট'-এ নবরূপ লাভ করে ফিল্ডিং-এর 'টম্ জোনস্', 'জোনাথন ওয়াইল্ড' 'জোসেফ অ্যানড্রুস্' উপন্যাসে তার ঐতিহ্য বাহিত হয়েছে। ডিকেন্স-এর প্রথম যুগের সার্থক সাহিত্য প্রচেষ্টা 'পিকউইক পেপারস'—সেই 'পিকারেস্ক'-রীতির ভিক্টোরীয় সংস্করণ। পিক-উইক ও স্যাম ওয়েলার যথাক্রমে ডন কুইকজোট্ ও সাংকো পাঞ্জার নব-রূপান্তর। বস্তুত অলিভার টুইসট্, ডেভিড কপারফিল্ড, নিকোলাস নিকলবি—বইগুলিতেও পিকারেস্ক উপন্যাসের প্রভাব আছে। চিরদিনই সাংবাদিকতার সঙ্গে বাস্তবধর্মী উপন্যাসের রক্তগত সম্পর্ক। রিপোর্টার-সাংবাদিক ডিকেন্সই পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিক ডিকেন্স-এ পরিণত হয়েছেন। ডেফো-ফিল্ডিং-এর রচনায় অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের সামাজিক রূপ যেমন প্রতিবিম্বিত হয়েছে, ডিকেন্স-এর রচনায় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের মানচিত্র বহুলাংশে ধরা পড়েছে। অ্যাডিসন্-স্টীল সম্পাদিত 'স্পেকটেটর' পত্রিকায় (১৭১১) প্রকাশিত 'কভারলি পেপারস্'-এ যে বাস্তবধর্মিতা ও ব্যঙ্গধর্মিতা দেখা যায়—'পিকউইক পেপারস' সেই ধারারই পরিণতি। 'পিকউইক পেপারস্'-এ একটি বৈশিষ্ট্য

তার চমৎকার 'হিউমার' বা সহজকৌতুক রস। কিন্তু শুধু কৌতুকরস নয় সমকালীন সমাজের মেকি ধারণাগুলিকে আক্রমণ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। 'পিকউইক পেপারস্'-এর পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় ডিকেন্‌স জানিয়েছিলেন যে পাঠকেরা তাঁকে যেন ভুল না বোঝেন। কেননা ধর্ম বা সেবাব্রতকে তিনি আক্রমণ করেন নি, ধর্মের ভড়ং বা দয়া-র ভানকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন ('it is always the latter and never the former which is satirized here')। সামাজিক বৈষম্য এবং ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চিরদিনই ইংরেজি সাহিত্যে ব্যঙ্গের শাণিত কুঠার হানা হয়েছে। চসার (১৩৪০-১৪০০)-এর 'ক্যান্টারবেরি টেলস্' (১৩৮৫-১৪০০) এ সমাজগত বাস্তবদৃষ্টি, নানারূপ সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ লক্ষণীয়। রেস্‌টোরেশন যুগের কমেডিতে কিছুটা অশালীনতা থাকলেও বাস্তবপন্থী ব্যঙ্গধর্মিতার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঠারোর শতকের ট্যাটলার, স্পেকটেটর কাগজে এবং সুইফট-ডেফো-ফিলডিং-স্মলেটের রচনায় যে বাস্তবপন্থী রচনার ধারা প্রসারিত হয়েছে তাকে ডিকেন্‌স বরণ করেছেন। বাল্যকৈশোরের দুঃখদীর্ণ অভিজ্ঞতা, রিপোর্টার সাংবাদিকের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজসম্পর্কে জ্ঞানার্জন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঘোষিত মানবস্বীকৃতি এবং প্রকৃত হৃদয়বানের সহানুভূতি—এগুলির সম্মিলনে ডিকেন্‌স এর শিল্পীমানস গঠিত হয়েছে।

হয়তো ডিকেন্‌সকে আমরা বালজাক তলস্তয় বা হার্ডির মতো উচ্চকোটির শিল্পীর পর্যায়ে ফেলতে পারি না। তাঁর সমকালীন রুষ ঔপন্যাসিক তুর্গেনেভ ও দস্তয়েভস্কি-র উপন্যাসে জীবনের যে দুরন্ত বেগ পাপ-পুণ্যের তীব্র সংঘাত, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ, মনোজগতের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ দেখতে পাই ডিকেন্‌স-এর উপন্যাসে তাকে পাওয়া যাবে না। বরং গোগল ও গোর্কির সঙ্গে তাঁর কিছু মিল আছে। জারশাসিত রুষিয়ায় লাঞ্ছিত ভূদাসদের চিত্র

গোগল-এর Dead Souls এবং যন্ত্রশাসিত ইংলণ্ডে উৎপীড়িত মানুষের চিত্র ডিকেন্স-এর 'হার্ড টাইমস্' (১৮৫৪) এই দুয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। তেমনি গোর্কির বাল্যকৈশোরের দুঃসহ দিনগুলির সঙ্গে ডিকেন্স-এর জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য থাকলেও এবং উপেক্ষিত মানুষের প্রতি উভয়ের গভীর সহানুভূতি লক্ষণীয় হলেও ভিক্টোরীয় যুগের 'সংস্কারক' ডিকেন্স এবং জারশাসিত রুষিয়ার 'বিপ্লবী' গোর্কির মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে মতভেদ সুস্পষ্ট। অপরদিকে সমকালীন ফরাসী ঔপন্যাসিক ফ্লোব্যার-এর 'মাদাম বোভারি'-তে যে 'ন্যাচারালিজম্'-এর সূত্রপাত, নারীমনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশল দেখা যায় ডিকেন্স-এর রচনা তার থেকে পৃথক। ফ্লোব্যার সাধারণ জনসমাজকে ভালোবাসেননি বরং তাদের ঘৃণা করেছেন। ডিকেন্স জনসমাজকে ভালোবেসেছেন তাদেরই একজন হয়ে সচেতনভাবে লেখনী ধারণ করেছেন। ভিক্টোরীয় যুগের মানবপন্থী মূল্যবোধকে তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন—এখানেই ডিকেন্স-এর শিল্পীজনোচিত মহত্ত্ব আর সে যুগের সমাজকে উদ্ঘাটিত করেছেন এখানেই তার কৃতিত্ব। মানবপন্থী মূল্যবোধের দিক থেকে এই যুগে বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২), জেমস্ মিল (১৭৭৩-১৮৩৬), তাঁর পুত্র স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-'৭৩) এবং এড্উইন চ্যাডউইক (১৮০০-৯০) প্রভৃতি মানবহিতবাদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেন্থাম-এর মহান ঘোষণা 'বহু মানবের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ' তাঁর অনুগামীদের চিন্তাধারায় রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ সাধনের পর জোর দেওয়া হয়েছে। এই মানবহিতবাদ ডিকেন্স-এর উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ১৮১৫-এ পার্লামেণ্ট যে 'শস্য-আইন' (Corn law) পাশ করে তার মূলে যদিচ ছিল বাইরের আমদানি বন্ধ করে দেশের কৃষি তথা কৃষকসমাজের

স্বার্থরক্ষার প্রয়াস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-ফল সম্ভব হলনা। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যক্রয়ও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এসময় মিল ও কারখানার শ্রমিকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। শ্রমিককল্যাণআইন জাতীয় কিছু ছিল না, সংঘটিত শ্রমিকনেতৃত্বও তখন গড়ে ওঠে নি—শ্রমিকেরা কষ্টে দিন কাটাত। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন: "When women could be employed in coal mines, small children in cotton mills and all for twelve or fourteen hours a day, no bargaining about wages was possible. Each had to take what work he could get, there was no hope of returning to the land when so many farms were being deserted and so many labourers unemployed, and employers were able, by ingenious methods of payment in kind and fining for trivial offences, to mulct the worker of even his meagre wages" ডিজরেলি-র লেখা 'সিবিল' (Sybil) উপন্যাসে (১৭৪৫) কল-কারখানার শ্রমিকদের করুণচিত্র আছে। তিনি এই বইয়ের অপর নাম দিয়েছিলেন 'টু নেশনস' বা 'দুইজাতি'। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে মানুষের আগেকার বিশ্বাস ভাঙছিল, ভগবানের মার বলে মানুষ তার দুঃখকে স্বীকার করছিল না এবং ধনী মারছে গরীবকে—এই কথাটি বুঝতে শিখেছিল। এই সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮)-এর প্রয়াস চোখে পড়ে। আর মনে পড়ে অ্যানটান অ্যাসলি কুপারকে। তিনি শ্রমিক-কল্যাণের জন্য ১৮৩৩-এর 'ফ্যাক্টরি আইনের' পথিকৃৎ। এই প্রসঙ্গে এডুইন চ্যাডউইকের নামও স্মরণীয়। অবশ্য শিক্ষিত উদারমনা বুদ্ধিজীবীদের কথা ছাড়াও মনে রাখতে হবে ১৮৩৮-এ কারিগর শ্রেণীর দুইজন নেতা ফ্রানসিস প্লেস এবং উইলিয়ম লোভেত 'Peoples Charter' বা 'গণসনদ' রচনা ও প্রকাশ করেন।

এখানেই চার্টিস্ট আন্দোলনের শুরু। সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যে শ্রমিক ও দরিদ্র জীবনের কান্না অনেকের লেখায় শোনা গেল। তার পিছনে 'চার্টিস্ট' আন্দোলনের ভূমিকা অলক্ষিত নয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বুলওয়ার প্রভৃতির রচিত 'Social Literature'-এর যে প্রকাশ দেখা যায় ডিকেন্স এর রচনা তারই সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত। টমাস হুড (১৭৯০-১৮৪৫)-এর 'Song of the Shirt', শ্রীমতী ব্রাউনিঙ (১৮০৬ ৬১) এর 'Cry of the Children', শ্রীমতী গ্যাসকেল (১৮১০-৬৬)-এর 'Mary Barton', চার্লস কিংসলে (১৮১৯-৭৫)-এর 'Yeast' এবং 'Alton Locke', টমাস কারলাইল (১৭৯৫-১৮৮১) এর 'Chartism' এবং 'Past and Present'—প্রভৃতি সবই 'চার্টিস্ট' আন্দোলনের প্রভাবজাত রচনা। ১৮৪৮-এ অর্থাৎ দীর্ঘ দশবৎসর ধরে এই 'চার্টিস্ট' আন্দোলন চলে, তার উপর কঠোর দমননীতি চালানো হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলন দমিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এই গণআন্দোলন জয়ী হয়েছিল। ডিকেন্স-এর উপন্যাস এই যুগধর্ম, এই মূল্যবোধকে প্রকাশ করেছে। তাই ডিকেন্স এর লেখা থেকে তাঁর মৃত্যুর পরও ইংলণ্ডে শ্রমিকসভায় বিশেষ-বিশেষ অংশ পড়ে শোনানো হতো বলে বাঙালী মনীষী ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন। ডিকেন্স তাঁর উপন্যাসে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, বালক-শ্রমিক নিয়োগরীতি, আইন-আদালতের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য—প্রভৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। 'অলিভার টুইস্ট' থেকে 'হার্ড টাইমস' তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। এই আক্রমণের পিছনে তাঁর ব্যক্তিজীবনের করুণ ইতিহাস রয়েছে। তিনি 'যাদের চোখের জলের হিসেব কেউ নিলে না'—তাদের সকলের কথাই বলতে চেয়েছেন গভীর সমবেদনার সঙ্গে। এজন্যই কার্ল মার্কস ডিকেন্স-এর প্রশংসা করেছেন। তবে ডিকেন্স মার্কস-পন্থী নন। জনৈক সমালোচক ঠিকই লিখেছেন: "His remedy was Christian charity and good-natured

benevolence and he has been well described as nearer to Father Christmas than to Karl Marx."

ডিকেন্‌স-এর উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে 'novel of purpose'—অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক রচনা। সেজন্য তার চরিত্র ও ঘটনা ক্ষেত্র-বিশেষে অনেক সময় নিখুঁত বাস্তবধর্মী হয়নি। এই কারণে থ্যাকারে ডিকেন্‌স-এর আলোচনায় লিখেছেন: "I don't think he (Dickens) represents Nature duly"। কিন্তু ডিকেন্‌স-এর সৃষ্টজগতে প্রবেশ করলে পাঠকের কাছে সে জগৎ অ-বাস্তব বলে মনে হয় না। সেখানে অলিভার, ডেভিড, লিটল নেল-এর বেদনায় আমরা চোখের জল ফেলি। সেখানে মিকবর, বোফিন, শ্রীমতী গাম্‌প-এর মত 'কমিক' চরিত্রের কার্যকলাপে ও কথাবার্তায় হাসি। ইউরিয়া হীপ-এর আবির্ভাবে বিস্ময় বোধ করি। ফ্যাগিন, সাইকস-এর নিষ্ঠুরতায় ঘৃণায় জ্বলে উঠি। ডিকেন্‌স জটিল চরিত্র রচনা করেন নি। সেদিক থেকে তাঁর বেশির ভাগ চরিত্র হয় নিষ্পাপ নয় নরাধম। ফরস্টর কথিত এই 'Flat' চরিত্রগুলি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাজেই সেদিনকার পাঠকসমাজ ডিকেন্‌সকে 'The master of our sunniest smiles and our most unselfish tears" বলে যে-সংবর্ধনা জানিয়েছিল—সে অভিনন্দন ডিকেনস চিরদিনই পাবেন। তাই লিভিস তাঁর 'দি গ্রেট ট্রাডিসন' গ্রন্থে যখন ডিকেন্‌স সম্বন্ধে বলেন: "his genius was that of a great entertainer, and he had for the most part no profounder responsibility as a creative artist than his description suggests"—তখন সে-মন্তব্য আমরা সমর্থন করতে পারি না। বরং আমরা সান্তায়ানা-র সঙ্গে একমত যে "when people say Dickens exaggerates, it seems to me that they can have no eyes and ears. They probably have only *notions* of what things and people are."

ডিকেন্স-এর সঙ্গে থ্যাকারে-র (১৮১১-৬৩) নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। যদিও দুজনের মধ্যে গভীর পার্থক্য রয়েছে সবদিক থেকে। ডিকেন্স গরীবের ছেলে, দারিদ্র্যের কশাঘাত তাঁর জীবনের প্রথম পাথেয়। উচ্চশিক্ষার সুযোগ তিনি পান নি। সমকালীন মানুষের জীবনে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার অশ্রুবর্ষণের ইতিহাস তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি তাদের সমব্যথী। সেজন্যই তাঁর উপন্যাস যুগপৎ প্রতিবাদ ও সমবেদনার রৌদ্র-করুণ রসাশ্রিত। থ্যাকারে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরূপে জন্ম নিয়েছিলেন, শিক্ষা পেয়েছিলেন অভিজাত শিক্ষালয়ে, মনোভঙ্গিতে তিনি ডিকেন্স এর মতো ভাবপ্রবণ বা সেন্টিমেন্টাল নন তিনি যেন অষ্টাদশ শতকের নাগরিকসমাজের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির অধিকারী। সেই দৃষ্টিতে দক্ষিণ নয়নের প্রসন্নতার চেয়ে বাম নয়নের বক্র কটাক্ষই মুখ্য। মধ্য-ভিক্টোরীয় (Mid Victorian) যুগের তথাকথিত উচ্চস্তরের মানুষ অর্থাৎ বুর্জোয়াসমাজের ভিতরের ফাঁপা চেহারা থ্যাকারে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এখানেই থ্যাকারে ইংরেজি বাস্তবপন্থী উপন্যাসকে একধাপ এগিয়ে দিলেন।

তার কর্মজীবনের প্রারম্ভে তাকে ডিকেন্স-এর মতই সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। দীর্ঘ দশ-বারো বছর ধরে তিনি অ্যাডিসন-স্টীল-সুইফট্-এর ঐতিহ্য স্বীকার করে সাময়িক পত্রে সমকালীন নাগরিকসমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নক্শা জাতীয় বহুরচনা লিখেছেন। তারপর 'ভ্যানিটি ফেয়ার' (Vanity Fair) উপন্যাস যেই প্রকাশিত হল (১৮ ৭-৪৮) অমনি থ্যাকারে প্রতিষ্ঠিত হলেন। থ্যাকারে-র মনের গড়ন এই উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই ধরা পড়ে। বানিয়ান-এর 'দি পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস'-এর সঙ্গে তুলনা করলেই থ্যাকারে-র বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। থ্যাকারে তাঁর 'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এই বলে: "Ah! Vanitas vanitatum! Which of us is happy in this world? Which of us has his desire

or having it is satisfied? Come children, let us shut up the box and the puppets for our play is played out."

এই ঘোষণা থেকেই বুঝতে পারা যায় থ্যাকারে রোমান্তিকতার কী বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর এই বইখানিকে পুতুল-নাচের ইতিকথা রূপেই গড়েছেন। সমাজের উপরের তলার বিভিন্ন স্তরের নরনারীকে তিনি এখানে নির্মোকহীনরূপে উপস্থাপিত করেছেন, তার ফলে সে-যুগের এক প্রামাণিক সমাজচিত্র এখানে ধরা পড়েছে। ঊনবিংশ শতকে থ্যাকারে-র জন্ম হলেও তাঁর মন গদ্যপ্রধান অষ্টাদশ শতকের দৃষ্টিদীক্ষিত। তিনি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ হিউম্যারিস্টদের সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন ও বই লিখেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'The History of Henry Esmond' (১৮৫২) অষ্টাদশ শতকের রানী অ্যানের শাসিতযুগের পটভূমিকায় রচিত। স্মৃতিকথনের ঢঙে অষ্টাদশ শতকী রীতিতে লেখা। যুদ্ধ, শৌর্য, প্রেম সম্পর্কে রোমান্টিক ধারণাকে তিনি এই উপন্যাসে কটাক্ষ হেনেছেন। ১৭০৪-এর ব্লেনহিম্-যুদ্ধে বিজয়ী ডিউক অব মার্লবরো বিরাট সম্মান লাভ করেছিলেন কিন্তু ১৮৫২-এ থ্যাকারে-র 'এস্‌মন্ড'-এ সেই 'বীরপূজা' ঘুচে গেল। তাই থ্যাকারে-র মধ্যে যেন লিটন স্ট্রাচির পূর্বাভাষ। ফিলডিং 'জোসেফ অ্যান্‌ড্রুস্' লিখেছিলেন রিচার্ডসন্-এর ভাবপ্রবণ উপন্যাস 'পামেলার' প্রতিবাদ হিসাবে। থ্যাকারে সেই ধারার শিল্পীরূপে রচনা করেছেন তাঁর উপন্যাস। এই রোমান্তিক বিরোধিতাই থ্যাকারে-র বাস্তবমুখিতার ভিত্তি। তাই 'এস্‌মন্ড' উপন্যাসে নায়ক হেনরি দীর্ঘ দশবছর ধরে ছলনাময়ী সুন্দরী তরুণী বিয়াট্রিক্স কাসলউড-কে মনে-মনে কামনা করার পর অবশেষে তার জননী বর্ষিয়সী র‍্যাচেলকে বিবাহ করল (বা থ্যাকারে বিবাহ দিলেন)। অষ্টাদশ শতকীয় রোমান্তিক-বিরোধিতা, ব্যঙ্গপ্রিয়তা থ্যাকারের শিল্পসৃষ্টিতে অনিবার্য উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আরেকদিক থেকে অষ্টাদশ শতকের

জীবনধর্মিতা তিনি পান নি। এবং ফিলডিং ও তাঁর পরবর্তী যুগের তুলনা করতে গিয়ে থ্যাকারে ঠিকই লিখেছেন: "Since Tom Jones it has been forbidden to draw a picture of a man." মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের তথাকথিত ভদ্র 'নীতিবাদে'র কাছে শেষপর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন।

শেষ জীবনে ভিক্টোরীয় যুগের নীতি-নিগড়ে নিজেকে ক্ষেত্র বিশেষে বাঁধলেও স্বীকার করতে হবে থ্যাকারে ইংরেজি উপন্যাসে নতুন ধারা বহিয়ে দিয়েছেন। জেন অস্টেন, স্কট ও ডিকেন্স কারো সঙ্গেই তাঁর মিল নেই। জেন অস্টেন-এর প্রেম ও পরিবারপ্রীতি স্কট-এর ঐতিহাসিক রোমান্সপ্রীতি ও ডিকেন্স-এর লাঞ্ছিত মানব-প্রীতি কোনটিই থ্যাকারে-র স্বভাবগত নয়। ডিকেন্স অর্থ নৈতিক পীড়ন ও সামাজিক অবিচারের বিপক্ষে বঞ্চিতের অশ্রুর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন (সীমাবদ্ধক্ষেত্রে) আর থ্যাকারে দেখিয়েছেন 'স্নব'দের, বুর্জোয়া সমাজের উপরতলার মানুষদের 'ভণ্ড' দিকগুলিকে। এই বিদ্রোহই তাঁর বাস্তবতা এখানে তিনি বর্ণাড শ'-র পূর্বসূরী।

'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এর প্রথম পরিচয় দেওয়া হয়েছিল 'Pen and Pencil Sketches of English Society' তারপর বদলে রাখা হয় 'নায়কহীন নভেল' (a novel without a hero)। এখানে রচনার 'কন্‌ভেনসনাল' বা প্রথাসিদ্ধরীতি থেকে তিনি সরে গেছেন। থ্যাকারে একখানি চিঠিতে এই উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন: "to indicate in cheerful terms that we are for the most part an abominably foolish and selfish people desperately wicked and all eager after vanities. Everybody is you see in that book…" এই পংক্তিগুলি পড়লেই বোঝা যায় সমকালীন 'ভদ্র'-দের কী কৌতুকাশ্রিত অবজ্ঞার চোখে থ্যাকারে দেখেছেন। তাই 'ভ্যানিটি ফেয়ার' সত্যিই পুতুলনাচের ইতিকথা। আর এই নাচের সুতো রয়েছে একটি মেয়ে বেকি শার্প-এর হাতে। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' সম্পর্কে প্রথমেই বলা

হয়েছে 'নায়কহীন নভেল'—এখানে অ্যামেলিয়া ও বেকি—এই দুটি নারীর জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। অ্যামেলিয়া সরলা, বুদ্ধিহীনা, পবিত্রহৃদয়া। বেকি বুদ্ধিমতী, ছলনাময়ী, নীতিবোধহীনা। থ্যাকারে ভালোমন্দ মিশিয়ে চরিত্র গড়তে পারেন নি। তাঁর কাছে পুণ্য ও পাপের আমূল বিপরীতধর্মীরূপেই অ্যামেলিয়া ও বেকি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পাপের মূর্তি হলেও সে যেন প্যারাডাইস লস্ট-এর 'শয়তান'-এর মতো নিজ দীপ্যমান। (রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে-র 'সন্দীপ' চরিত্রের কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয়)। সাধারণ মেয়ে বেকি জেনেছে তার রূপ ও যৌবন তার হাসি ও কটাক্ষের আয়ুধে উঁচুসমাজের বীরদের অহংকার দুর্গকে লুটিয়ে দিয়ে সমান প্রতিষ্ঠা পেতে হবে। তাই দেখা যায় বেকি যখন রডনদের পরিবারে গভর্নেস হল তারপর রডন ও তার পিতা স্যর পিট (রডন তাঁর পূর্বের বিবাহের ছেলে) উভয়েই তার কটাক্ষ-ঘাতে যৌবন চঞ্চল হয়েছেন। ছেলে বেকি-র প্রতি অনুরক্ত জেনেও বৃদ্ধ স্যর পিট ব্যাকুলভাবে বেকি-র প্রণয় ভিক্ষা করেছেন। বেকি কিন্তু রডনকেই বিয়ে করে গেল ব্রাইটনে। এদিকে অ্যামেলিয়াকে ভালোবেসেছিল ডবিন। কিন্তু আত্মত্যাগের 'ভ্যানিটি' গর্বিত ব্যক্তিত্বহীন ডবিন মনে করল সে অ্যামেলিয়ার যোগ্য নয়, যোগ্য জর্জ অসবোর্ণ। কিন্তু অ্যামেলিয়ার বাবা যেই ব্যবসায় মার খেলেন অমনি জর্জের বাবা বিবাহের প্রস্তাব ভেঙে দিলেন আর জর্জও (আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রজেশ্বরের মতো) পিতৃআজ্ঞা মেনে নিল। শেষে ডবিন-এর চেষ্টায় তাদের বিবাহ হল। জর্জ অ্যামেলিয়াকে নিয়ে বেড়াতে গেল ব্রাইটনে। বেকি-র শিকার এবার হল জর্জ এবং সেও অচিরে ধরা পড়ল। কিন্তু জর্জ ওয়াটারলু-র যুদ্ধে মারা গেল, ফিরে এল রডন।

এবার লণ্ডনে বেকি-র জীবনে এলেন লর্ড স্টেইন। বেকি তখন মক্ষীরানী। লর্ড স্টেইন-এর চেষ্টায় সে রাজসভায় পরিচিত হল। এদিকে রডন জুয়ার দেনায় গেল জেলে। বেকি-র কাছে

তার আবেদন নিষ্ফল হল। তারপর তার বাবা স্যর পিট তাকে মুক্ত করলেন। জেল থেকে বাসায় ফিরে রডন দেখল—বেকি আর লর্ড স্টেইন! রডন চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গেল। শেষে বেকি অ্যামেলিয়ার ভাই জোশেফকেও জালে টেনে নিয়েছে। থ্যাকারে বেকি-কে শেষজীবনে দয়াবতী ধর্মভীরু মহিলায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। অ্যামেলিয়া তার সন্তানকে জর্জের বাবার হাতে সমর্পণ করেছিল। স্যর অসবোর্ন তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর সম্পত্তি ঐ নাতিকে দিয়ে গেলেন। ডবিন এবার তার এতদিনের ভীরু প্রেম সাহসের সঙ্গে নিবেদন করল। শুরু হল অ্যামেলিয়া ও ডবিনের বিবাহিত জীবন। 'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এ প্লটের ভালো গাঁথুনি নেই, বেকি শার্প ভিন্ন একটি 'জীবন্ত' চরিত্রও নেই। ঘটনা বিন্যাসের নৈপুণ্যও বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু তবুও এই উপন্যাসখানির কালজয়িতা নির্ভর করেছে থ্যাকারে-র বাস্তবপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির জোরে। সমালোচক কেটল লিখেছেন: 'He pierces the hypocrisies of Vanity Fair, reveals the disgusting, brutal, degrading sordidness behind and below its elegant glitter.'

থ্যাকারে-র আর একখানি উল্লেখযোগ্য বাস্তবপন্থী উপন্যাস—'পেনডেনিস'। বইখানির পুরো নাম 'The History of Pendennis; His fortunes and misfortunes, His friends and his greatest Enemy.' মাসিক কিস্তিতে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০-এ। বইখানির নাম দেখলেই বোঝা যাবে থ্যাকারে ফিলডিং-এর ধারা বহন করছেন। থ্যাকারে-র ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস এই উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ইংরেজি বাস্তবপন্থী উপন্যাসের ক্ষেত্রে থ্যাকারে-র নাম চিরদিনই থাকবে। একদা তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিলেন: "I cannot help telling the truth as I view it, and describing what I see. To describe it otherwise would be false-

hood···truth must be told." শুধু দেখা নয় সমাজের গভীরে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা তাঁর ছিল। নির্মোহ দর্শকের মতো তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন—হয়তো সে দৃষ্টি ঈষৎ-সিনিক (cynic)।

॥ ব্রণ্টি ভগ্নীদ্বয় ॥

এই ভিক্টোরীয় যুগের ডিকেন্স-থ্যাকারের রচনা থেকে পৃথক-ধর্মের উপন্যাস রচনা করে যশস্বিনী হয়েছিলেন ব্রণ্টি ভগ্নীদ্বয়। ডিকেনস ও থ্যাকারে রিচার্ডসন ফিলডিং-সুইফট্-এর ধারাকে নব সম্পদে মণ্ডিত করেছেন, যুগধর্ম ও সমাজ-চেতনাই তাঁদের উপন্যাসের প্রাণশক্তি। কিন্তু ব্রণ্টিরা ফিল্ডিং-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। তাঁদের পূর্বগা জেন অসটেনও তাদের কাছে বরণীয়া হননি। অসটেন্ এর উপন্যাসে তাঁরা প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন কামনার তীব্রতার (passion) অভাব। একথা সত্য যে ফিলডিং ডিকেনস্ থ্যাকারে-র উপন্যাস তৎকালীন নাগরিক সমাজ ও জীবনের বহির্মুখী দিকটির প্রকাশই প্রাধান্য পেযেছে। সামাজিক সমস্যা ভিত্তিক বাস্তবধর্মিতা কখনও ডিকেনস্ এর লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে কখনও থ্যাকারে-র সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরের নরনারীর প্রতি তীক্ষ্ণ বক্র কটাক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর অসটেন্-এর রচনায় অতি-নাটকীয়তা বা অতিপ্রাকৃতের স্থান নেই, ছিন্ন-শৃঙ্খল বিদ্রোহ নেই, কামনার উন্মত্ত ঢেউ নেই। ব্রণটি ভগ্নাদের রচনায় তাকে পাওয়া যাবে। সেখানেই তাদের রচিত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের ইংরেজি কাব্য সম্পর্কে ঈষৎ আলোচনা অহেতুক হবে না। ড্রাইডেন্-এর মৃত্যু (খ্রীষ্টপর ১৭০০) থেকে লিরিকাল ব্যালাডস প্রকাশের (১৭৯৮) পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের কালপর্বকে মোটামুটিভাবে age of reason এবং age of prose বলা হয়েছে। মননশীল, গদ্যপ্রধান, ব্যঙ্গপ্রিয়, এই যুগ। রোমান্তিক মনোভাব গ্রে, গে, টমসন্, কুপার প্রভৃতির কবিতায় দেখা দিলেও তার প্রথম প্রতিষ্ঠা 'লিরিকাল ব্যালাডস'-এ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ,

কোলরিজ, শেলী, কীটস, বায়রণ ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার পঞ্চরথী। কবি-স্বভাবের উদার মুক্তি, প্রকৃতির প্রতি প্যাগান-দৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অনুধ্যান, ব্যক্তি-হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রকাশ, শৃঙ্খলমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন—এই রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর কবিতায় নববর্ষার মতো দেখা দিয়েছে। কিন্তু ১৮২৭ এর মধ্যেই কীটস, শেলি ও বায়রণের কণ্ঠ মর্ত্যলোকে স্তব্ধ হলেও ব্রণটি ভগ্নীদের রচনায় যে ব্যক্তি-বিদ্রোহ, নিসর্গ-মগ্নতা, গীতিধর্মিতা, দুর্মর কামনাবহ্নি অর্থাৎ অন্তরমুখী বৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে সে এই আত্মভাববিকাশী রোমান্টিকতারই গদ্যসমর্পিত রূপ। ব্রণটি ভগ্নীদ্বয়ের রচনায় এই 'সাবজেকটিভ' দৃষ্টি, প্রকৃতিমগ্নতা, গীতিধর্মিতা যেমন তাঁদের নিঃসঙ্গ ব্যক্তিজীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত তেমনি তাঁদের উপন্যাসের নায়িকাদের বিদ্রোহী মনোভাব, কামনার দুরন্ত বেগ প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই ব্যক্তিজীবনে পিউরিটান ধর্ম, পিতার শাসন পারিবারিক সংস্কার, দারিদ্র্য সবকিছুর বিরুদ্ধে নিজেদের নিরুদ্ধ, অতৃপ্ত (ফ্রয়েডীয় ভাষায় অবদমিত) কামনার প্রকারভেদ। সেজন্য শার্লট (১৮১৬—১৫) এবং এমিলি (১৮২৮—৪৮) উভয়ের উপন্যাসে নায়িকাদের 'স্বাধীন' হবার জন্য এত আকাংক্ষা। এই যুগে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার পরিধি প্রসারিত হয়েছে সন্দেহ নেই। মেরি উলস্টোনক্রাফট, হ্যারিয়েট মার্টিন্যু স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবিকে জোরালো করে তুলেছেন কিন্তু তার প্রকৃত আস্বাদ ব্রণ্টি ভগ্নীদ্বয় বিশেষ পাননি। সেই না পাওয়ার পুঞ্জিত ক্ষোভ তাঁদের রচনায় সমুদ্রগর্ভের মগ্নশিলার মত।

শার্লট-এর শ্রেষ্ঠ রচনা 'জেন্ আয়ার' (১৮৪৭) এর কাহিনীতে শ্রীমতী রাডক্লিফের গথিক রোমান্স সুলভ অবিশ্বাস্য ঘটনার অভাব নেই। 'Awe and mystery'-র পরিচয় প্রায় প্রতি অধ্যায়েই মেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রচেস্টার-এর উন্মাদিনী স্ত্রীর খল-খল ভয়াল হাসি, স্বামীকে শয্যায় পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা, রচেসটার-এর সঙ্গে জেন এর বিবাহের পূর্ব রাত্রে হঠাৎ এসে কনের পোষাক ছিঁড়ে

টুকরো করে ফেলা—পাঠকের মনে বাস্তবতার পরিবর্তে এক রহস্যময় ভীতিই জাগিয়ে তোলে।

অন্যদিকে জেন যাতে তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হয় সেজন্য গণৎকারিণী জিপ্‌সি বুড়ীর সাজে রচেস্‌টারের ঘৃণ্য কৌশলও অবিশ্বাস্য। তারপর জেন-এর পলায়ন, আকস্মিক আত্মীয় মিলন এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি সবই যেন দৈব ঘটনা। অথবা রেভারেণ্ড রিভার্স এর সঙ্গে ভারত যাত্রার পূর্বে সে যখন রিভার্স্‌-এর পত্নীত্ব স্বীকারের সংকল্প করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে রাত্রির অন্ধকারকে চিরে ফেলে বেজে উঠেছে রচেস্‌টারের গলা। (একে আধুনিক পাঠক ভৌতিক ব্যাপার বলবেন) কিন্তু। জেন্‌ ফিরে গেল। ফিরে গেল থর্নফিল্ড-এ রচেস্‌টারের কাছে। গিয়ে দেখল তার উন্মাদিনী স্ত্রী ঘরে আগুন দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই পুড়ে মারা গেছে। আর রচেস্‌টার তখন অন্ধপ্রায়। জেন্‌ অক্ষম রচেস্‌টারকে বিবাহ করেছে, সন্তানবতী হয়েছে। তবুও এই উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা আমাদের কাছে বিশ্বাস্য বা convincing হয়ে ওঠে না।

শ্রীমতী গ্যাসকেল-এর লেখা শার্লট-এর জীবনী ও 'জেন আয়ার' মিলিয়ে পড়লে মনে হয় জেন্‌এর মধ্যে যেন শার্লট-এর স্বজীবনচ্ছায়াই প্রতিফলিত। তাঁর জীবনের প্রথম ভালোবাসার পুরুষ-বিবাহিত মসিয়ে হেগারকে তিনি পাননি। বাস্তবে যাকে পাননি কল্পনায় তাকে পাবার চেষ্টা করেছেন। নিজের রুদ্ধ-আকাংক্ষাকে কল্পনায় দাঁড় করিয়েছেন রচেস্‌টার-জেন্‌এর অধ্যায়ে। শার্লট-এর এই রোমান্তিক আত্মমুখীনতা ইংরেজি উপন্যাসে তাঁর বিশেষ স্থান নির্দেশ করে। বহির্জগতের গ্রন্থিবহুল সমস্যাকীর্ণ পরিবেশের সঙ্গে তথা বিচিত্র পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। সেই অ-পরিচয়জনিত ত্রুটি তাঁর রচনায় আছে। কিন্তু নিসর্গ-পরিচয় তার উপন্যাসে একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এর মতে শার্লট-এর উপন্যাস যে আমাদের প্রিয় পাঠ্য তার প্রধান কারণ

তার কাব্যমূল্য। তিনি লিখেছেন: We read Charlotte Bronte not for exquisite observation of character—her characters are vigorous and elementary; not for comedy—hers is grim and crude; not for a philosophic view of life—hers is that of a country parson's daughter: *but for her poetry*

এমিলি একখানি মাত্র উপন্যাস রচনা করেন Wuthering Heights (১৮৪৭) তার পরই তিনি স্বর্গতা হন (১৮৪৮)। একখানি উপন্যাস লিখে এত নাম কারো হয়নি। মম্ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের তালিকায় একে স্থান দিয়েছেন। সমালোচক মহলে এই বইয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল বাদানুবাদ চলেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে এমিলির ব্যক্তি-চরিত্র ও তাঁর শিল্প-রচনা দুই-ই অনন্যসাধারণ। শার্লট তাঁর ভগ্নীর সম্পর্কে লিখেছেন: "তার সদৃশা কোন নারী আমি কখনও দেখিনি। পুরুষের চেয়ে তেজী, শিশুর চেয়ে সরল—সে চিরদিনই সকলের থেকে স্বতন্ত্র।" কবি আর্নলড্ ঠিকই লিখেছেন "knew no fellow for might, passion, vehemence, grief, daring, since Byron died." কথাটি সত্য।

শার্লট-এর চেয়ে এমিলি নিঃসন্দেহে বড়ো শিল্পী। সেই আপেক্ষিক উৎকর্ষ নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেকে তাঁকে কবি ব্লেক-এর সঙ্গে উপমিত করেছেন এবং 'মিস্টিক' সংজ্ঞা দান করেছেন। সমালোচক কেট্ল Wuthering Heightsকে অ-লৌকিক বা অতি-প্রাকৃত উপাদান ও ঘটনা থাকা সত্ত্বেও একখানি বাস্তবধর্মী উপন্যাসরূপেই দেখেছেন। এবং একথা সত্য যে এমিলি-পূর্ব ও সমকালীন ইংরেজি উপন্যাসসাহিত্যে ব্যক্তি-হৃদয়ের এই তীব্র ক্ষিপ্ত আর্তি, নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব, কামনার বহ্নিচ্ছটা দেখা দেয়নি। Wuthering Heights ভৌতিক উপন্যাস নয়। এর মুখ্য দুটি চরিত্র হিথক্লিফ ও ক্যাথরিন শিল্পের দিক থেকে সম্পূর্ণ real।

হিথক্লিফ 'কাল্পনিক' চরিত্র নয়। সে লিভারপুলের বস্তিজাত পিতৃহীন ও গোত্রহীন মানুষ। 'অসংস্কৃত' রুচি আর বন্য বলিষ্ঠ সরলতা নিয়ে এসেছিল ক্যাথরিনদের পরিবারে। বালিকা ক্যাথরিন্-এর মধ্যে প্রায় সমবয়সী হিথক্লিফ-এর প্রতি গড়ে উঠে ছিল তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু ভাই হিন্‌ডলে ছিল হিথক্লিফের বিরোধী। ক্যাথরিন্-এর পিতৃবিয়োগের পর হিন্‌ডলে তাকে ঠিক নগণ্য চাকরের মতই ব্যবহার করেছে। এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্যাথরিন্-এর মন বিদ্রোহী হয়েছে। কিন্তু আবার ক্যাথরিন যখন লিন্‌টন পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তাদের ছেলে এডগার্-কে দেখেছে তখন মনে হয়েছে হিথক্লিফ কত কুশ্রী ও দরিদ্র, ভদ্রসমাজের পক্ষে অচল। কিন্তু তার পরিচারিকা নেল্ যখন জানিয়েছে যে এডগারের বধূ হলে ক্যাথরিন্‌কে হিথক্লিফ-এর সঙ্গ, বন্ধুত্ব সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে তখন সেই ক্যাথরিন চিৎকার করে উঠেছে: Every Linton on the face of the earth might melt into nothing before I could consent to forsake Heathcliff" এর মধ্যে কোথায় অবাস্তবতা? বাস্তব বুদ্ধি থেকেই ক্যাথরিন বলেছে:

> "নেল্ তুমি আমাকে স্বার্থপর শয়তান ভাবছ, কিন্তু তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে হিথক্লিফ-কে বিয়ে করলে আমরা পথের ভিখারী হয়ে বেড়াব? কিন্তু যদি ধনী এডগারকে বিয়ে করি তাহলে আমি হিথক্লিফ কে বড়ো হবার পথে সাহায্য করতে পারব, যাতে সে আমার ভাইয়ের দাসত্ব থেকে বাঁচে।"

কিন্তু নেল বিশ্বাস করেনি। হিথক্লিফও না। অভিমানে, অপমানে, রোষে, ক্ষোভে হিথক্লিফ নিখোঁজ হল। তারপর অনেক দিন পরে সে ফিরে এল। সে তখন অন্যমানুষ—রুচিতে, অর্থে, পদমর্যাদায়। কিন্তু অন্তরে ক্যাথরিন্-এর জন্য আগেয় কামনা। আর ক্যাথরিন্ও (তখন শ্রীমতী এডগার লিন্‌টন) হিথক্লিফের নাম শোনা মাত্র যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। স্বামীর বিরক্তি, ক্রোধকে উপেক্ষা করল—

ছাই-চাপা আগুনের মত হঠাৎ জ্বলে উঠল তার দমিত কৈশোর প্রেম।

এই দুরন্ত প্রেমের চরম লগ্ন বা climax ঘটেছে ক্যাথরিন্-এর আসন্ন মৃত্যু-শয্যায়। হিথক্লিফ দেখা করতে চেয়েছে একটিবারের জন্য। ক্যাথরিন্-এর হৃদয় এর জন্যই উন্মুখ হয়েছিল। সে সম্মতি জানিয়েছে। ক্যাথরিন্ হিথক্লিফ-কে বলেছে :

> তুমি আর এডগার আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছ। আর আজ তোমরা দুজনেই এসেছ তাই নিয়ে শোক করতে—যেন তোমরাই সহানুভূতির পাত্র। কিন্তু না, আমি তোমাদের ক্ষমা করব না · তুমি কি কষ্ট পেয়েছ তার কথা আমি ভাবব না। তুমি কষ্ট পাবে না কেন ?·· তুমি কি একদিন আমার কবর দেখিয়ে বলবে না যে এখানে আমার প্রিয়া ক্যাথরিন ঘুমিয়ে আছে ? বলবে না, তার চেয়ে আমার ছেলেমেয়েকে আমি বেশি ভালোবাসি ?

আহত পশুর মত আর্তনাদ করে উঠেছে হিথক্লিফ। তারপর পরম স্নেহে ক্যাথরিন যখন তাকে শিয়রে আহ্বান করেছে তখন পাগলের মত ক্যাথরিনকে জড়িয়ে ধরে হিথক্লিফ—তার বুকের সমস্ত ক্ষোভ, এতদিনকার সঞ্চিত হাহাকার উজাড় করে দিয়েছে :

> Why did you betray your heart, Cathy ?···You have killed yourself···You loved me—then what right had you to leave me ? What right—answer me ? For the poor fancy you felt for Linton ?···I have not broken your heart—you have broken it ; and in breaking it you have broken mine. So much the worse for me, that I am strong—

—হৃদয়ের এই দুরন্ত লাভা কখনও কি ইংরেজি উপন্যাসে এর পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে ? একে অবাস্তব বলব কোন অপরাধে ? একমাত্র রুষ উপন্যাসেই আমরা এই দুরন্ত-বেগকে প্রত্যক্ষ করেছি।

১৮৪৭-এর ইংরেজি উপন্যাসে এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! প্রেম আর প্রতিহিংসার এক বিচিত্র নাটকীয় ঘটনাধর্মী উপন্যাস Wuthering Heights. হিথক্লিফ এক-এক করে প্রতিশোধ নিয়েছে। হিন্‌ডলে-র সম্পত্তি গ্রাস করেছে, লিন্‌টনদেরও রেহাই দেয়নি। এডগার্‌-এর বোন ইসাবেলাকে কৌশলে মুগ্ধ করেছে তারপর বিবাহ করেছে। অথচ একদিন এই দুটি অভিজাত পরিবারের কাছে সে ছিল চাকর মাত্র। কিন্তু এক পুরুষেই হিথক্লিফের প্রতিহিংসার আগুন নেভেনি। নিজের ক্ষয়িষ্ণু ছেলের সঙ্গে প্রতিশোধবশে সে মৃতা ক্যাথরিনের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। সেই মেয়ে বিধবা হয়েছে। ধনে-প্রাণে-মানে সে দুটি বংশেরই সর্বনাশ করেছে। তার প্রতিহিংসার দাবাগ্নি গ্রীক নাটকের 'ফিউরি'দের মতই ধেয়ে চলেছে। কিন্তু হিথক্লিফ তৃপ্তি পায়নি।

তারপর ক্যাথরিন-এর অশরীরী রূপ তাকে শান্ত করেছে। হিথক্লিফের মৃত্যুর পর তাদের যুগল ছায়ামূর্তি গ্রামের লোকেরা দেখেছে।

শেষের অংশ অবাস্তব। কিন্তু মনে হয় এমিলির কাছে অবিশ্বাস্য বা অবাস্তব ছিল না। তবুও আধুনিক পাঠক একে ত্রুটি বলেই মানবে। কিন্তু প্রেম ও প্রতিহিংসার এই কাহিনী, ক্যাথরিন-হিথক্লিফের চরিত্র-কল্পনা, নরনারীর হৃদয়ের আকাশ ফাটা চাওয়া ও হারানোর নিখাদ ইংরেজি উপন্যাসে অনাস্বাদিত রস সঞ্চার করেছে। বই বন্ধ করলেই কানে এসে বাজে ক্যাথরিন্‌-এর :

> "Nelly, I am Heathcliff! He is always, always in my mind: not as a pleasure, any more than I am always a pleasure to myself, but as my own being."

অথবা হিথক্লিফের :

> I cannot live without my life, I cannot live without my soul."

ভিক্টোরীয় যুগের নৈতিক শুচিবাইগ্রস্ত যুগে এ উপন্যাসের আদর হয়নি। কিন্তু আধুনিক কালে দস্তয়েভসকি থেকে ফকনার্-এর উপন্যাস-পাঠকগোষ্ঠী স্বীকার করেছেন এর মর্যাদা।

ডিকেনস্, থ্যাকারে ও ব্রণটি ভগ্নীদ্বয়ের পর ইংরেজি উপন্যাসের ক্ষেত্রে জর্জ এলিয়ট ও মেরিডিথ-এর নাম স্মরণ করা হয়। এলিয়ট-এর প্রকৃত নাম মারিয়ান্ ইভান্স (১৮১৯—১৮৮০)। তাঁর নাম 'মডার্ণ' বা 'আধুনিক' উপন্যাসের সূত্রপাতের সঙ্গে জড়িত। তার মুখ্য কারণ তাঁর রচনায় উপন্যাসের প্রথাগত ভাব ও রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। 'আধুনিকতার ধর্ম বলতে যে বুদ্ধিধর্মিতা, 'আইডিয়া'-র প্রকাশ বা দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন প্রভৃতি দেখা যায় জর্জ এলিয়টের শেষের পর্যায়ের রচনায়* তার পরিচয় আছে। অন্যদিকে টমাস হার্ডি 'Woodlanders' অথবা 'Far from the Madding crowd'-এ নাগরিক জীবনের পরিধির বাইরে সাধারণ গ্রামীন মানুষের জীবনকে নিয়ে যে 'pastoral novel' রচনা করেছেন তার পূর্বাভাস রয়েছে জর্জ এলিয়টের 'অ্যাডাম বিড'-এ। এমন কি ডি. এইচ. লরেন্স-এর ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও আত্মজীবনের স্পর্শবহ উপন্যাস 'সনস্ অ্যাণ্ড লাভার্স'-এর পূর্বসূরী রূপে তাঁর 'দি মিল্ অন দি ফ্লস্'-এর নাম উল্লেখ করা অন্যায় নয়। কাজেই গ্রামীন জীবন-নাট্যের অমর কথাকার হার্ডি, যৌন সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষক লরেনস্ এবং এইচ. জি. ওয়েলস্ থেকে অলডুয়াস হাকস্লি পর্যন্ত মননশীল উপন্যাসিক গোষ্ঠীর পূর্বসূরী রূপেও জর্জ এলিয়টের নামোচ্চারণ অনৈতিহাসিক বলে গণ্য হবে না।

শ্রীমতী মারিয়ান্ ইভান্স-এর মতো মনস্বিনী লেখিকা তাঁর পূর্বে বা সমকালে কেউ ছিলেন না। তাঁর মতো 'দুঃসাহসিক' জীবনও ভিক্টোরীয় যুগে কোনও মহিলা যাপন করেন নি। ব্রন্‌টি ভগ্নীদ্বয়ের অন্তরের জ্বালা তাদের উপন্যাসে রূপ পেয়েছে, জীবনে পায় নি।

* ফেলিক্স হল্ট দি র‍্যাডিক্যাল মিডলমার্চ ও ড্যানিয়েল ডেরোনডা।

এমিলির রচনার মধ্যে বায়রনী স্রোত উদ্দাম হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু জর্জ এলিয়ট-এর মতো বুদ্ধির দীপ্তি, চিন্তার গভীরতা, বা তীব্র মনন জিজ্ঞাসা তাঁর ছিল না। কিন্তু মারিয়ান্ খ্রীস্টধর্মের অন্ধ আচারগত গণ্ডিকে ভেঙে বাইরে চলে এসেছিলেন, বহু ভাষা শিখেছিলেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন এবং গীর্জা-নির্দিষ্ট উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই সেকালের বিখ্যাত মনীষী জর্জ হেনরি লিউয়েস্ (১৮১৭—৭৮) এর সঙ্গে দীর্ঘকাল দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন। এবং আরও আশ্চর্যের কথা তিনি লিউয়েস্ এর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট জন ওয়ালটার ক্রশকে বিবাহ করেন। তাঁর জীবনের এই গূঢ় বৈচিত্র্য আমাদের চমকিত করে কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিস্মিত করে তাঁর মনস্বিতা। তিনি সেকালের প্রখ্যাত মনীষী হবার্ট স্পেনসার (১৮২০—১৯০৩), স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—৭৩) প্রভৃতির সঙ্গে দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তের পজিটিভিজম্ (positivism) বা 'প্রত্যক্ষবাদ' গ্রহণ করেছিলেন এবং সমকালীন বস্তুবাদী (materialist) জার্মান দার্শনিক ফয়ার বাক-এর মতবাদ তাঁর অনধীত ছিল না। লামার্ক ও ডারউইন-এর অভিব্যক্তিবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে অস্বীকৃত হয় নি। এই মননশীলতা ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর পূর্বে আর কোনও মহিলার মধ্যেপরিলক্ষিত হয় না। এই মননশীলতা তাঁর শেষের পর্বের উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, ইংরেজি উপন্যাসের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা এনেছে। এই ক্ষেত্রে বলা দরকার জর্জ এলিয়ট তার উপন্যাস রচনার প্রথম পর্বে বিশ্বাসী ছিলেন 'রিয়ালিজম' এ, কিন্তু শেষ পর্বে তিনি আর্নল্ড ঘোষিত 'the application of ideas to life' মতবাদকে গ্রহণ করেছিলেন।

জর্জ এলিয়টের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অ্যাডাম বিড। তিনি যে গ্রামীন পরিবেশে তাঁর বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত করেছিলেন অনেকটা স্মৃতি-চারণার

(nostalgia) মতই তিনি সেই স্থান-কাল-পাত্রকে বর্ণনা করেছেন। যদিও সেখানেও তাঁর নিজস্ব নীতিগত দৃষ্টি বা moral tone সহজেই লক্ষণীয়। তাই হেট্টির অবৈধ মাতৃত্বকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। যাই হোক এই জাতীয় উপন্যাসে তাঁর মধ্যে যুগপৎ স্কট ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রেরণা কার্যকরী হয়েছে। যে-জীবন তার কাছে অতীত-কল্প সেই জীবন ও পরিবেশের প্রতি গভীর আকর্ষণবোধ ও তাকে সাহিত্যভাত করা স্কটের কথা মনে পড়ায়। তেমনি গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের রস ও রহস্যকে ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে দেখা ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাবজাত জর্জ এলিয়ট 'অ্যাডাম বিড' উপন্যাসে তার শিল্পী জীবনের প্রথম-পর্বের দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ঐ উপন্যাসে 'অ্যাডাম বিড'-এর সমর্থনে 'ডাচ চিত্রকলা' সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এই প্রসঙ্গে উৎকলন করা যেতে পারে :

'I turn without shrinking from cloud-born angels, from prophets, sibyls and heroic warriors to an old woman bending over her flower-pot on eating her solitary dinner, while the noon daylight, softened perhaps by a screen of leaves, falls on the mob cap and just touches the rim of her spinning wheel and her stone-jug and all those cheap common things which are the precious necessaries of life to her ;—হতশ্রী গ্রাম্য বৃদ্ধার এই সাধারণ ছবি তাঁর কাছে দেবদূতের ছবির চেয়ে আদৌ অগৌরবের মনে হয় নি। এই সূত্রে তিনি আরও লিখেছেন যে গ্রামের একটি সাধারণ অথচ উচ্ছল বিবাহ-উৎসবের ছবি দেখে তাঁর 'আইডিয়ালিস্ট' বন্ধু 'what a low phase of life! what clumsy, ugly people' বলে নাসিকা কুঞ্চিত করলেও তিনি তার মধ্যে বাস্তবতার অকৃত্রিম সৌন্দর্যকেই দেখতে পেয়েছেন।

তাঁর শেষ পর্বের রচনার মধ্যে 'মিডল মার্চ' মনন ও হৃদয়-ধর্মের সম্মিলনে সর্বশ্রেষ্ঠ এই উপন্যাসে বহু চরিত্রের উপাখ্যান পরস্পর-সংবদ্ধ হওয়ায় এর আখ্যান বিপুলাকার হয়েছে এবং সেই জন্যই অনেকে একে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্'-এর সঙ্গে উপমিত করেছেন। এই উপন্যাসে জর্জ এলিয়ট প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের হৃদয়তল থেকে ডুবুরীর মত বারবার রহস্য বস্তু তুলে এনে 'সহৃদয়' পাঠকদের দুর্লভ তৃপ্তি দান করেছেন। এই ক্ষেত্রে বরং হেনরি জেমস-এর সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে জর্জ এলিয়টের একখানি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর উপন্যাস রচনার ভিত্তি হল "the psychological conception of dramatis personae." এই দৃষ্টিভঙ্গি ফিল্ডিং, ডিকেন্স বা থ্যাকারের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

মেরিডিথ (১৮২৮—১৯০৯) জর্জ এলিয়ট-এর শুধু সমকালীন নন, চিন্তাশীলতা ও বাস্তবপন্থী শিল্পদৃষ্টির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্তাঁদাল, ফ্লোব্যার-এর প্রশংসা করেছেন, সাহিত্যে 'আইডিয়ালিজম'-এর চেয়ে 'রিয়ালিজম' এমন কি 'ন্যাচারালিজম'-এর আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন। ১৮৫৭-এ তিনি লিখেছেন: "Realism is the only basis of art" এবং 'আইডিয়ালিজম্'-এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন: "it weans the mind from the significant humanity of things. And there is, Idealism as a school, false." ১৮৬৪-এ লেখা আর একখানি চিঠিতে তিনি ঘোষণা করেছেন: I love and cling to earth as the one piece of God's handiwork which we possess. I admit that we can refashion but of earth must be the material."

কিন্তু তবুও তিনি ঠিক রিয়ালিস্ট ঔপন্যাসিক নন। তিনি ডিকেন্স থ্যাকারে বা ট্রোলোপ থেকে স্বতন্ত্র। জর্জ এলিয়টের মতো 'অ্যাডাম বিড' ধরনের সাধারণ মানুষের উপন্যাসও তিনি লেখেন নি।

সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন বৈষম্যের দিক নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গও তিনি করেন নি। তিনি চিন্তাশীল কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের জড়বাদী দৃষ্টি ও ডারউইনের জৈব-বিজ্ঞানের কাছে দাসখত লেখেন নি। তিনি মানুষের মনন ও চিত্তের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্র ত তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। অথচ রোমান্তিকতার প্রতি আনুগত্যও তিনি বর্জন করেন নি।

তাঁর সমকালীন ডিকেনস, থ্যাকারে বা ট্রোলোপ-এর মত মেরিডিথ তাঁর উপন্যাসে 'স্যাটায়ার' রীতির পরিবর্তে 'কমেডি'-র পথ নেবার পক্ষপাতী। অবশ্য তাঁর কমেডি কনগ্রেভ (১৬৭০—১৭২৯)-এর 'দি ওল্ড ব্যাচেলর' বা 'লাভ ফর লাভ' অথবা শেরিডন (১৭৫১—১৮১৬) রচিত 'দি রাইভ্যালস্' বা 'দি স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল' প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সামাজিক ঘটনা বা সমস্যার প্রতি কটাক্ষ-গর্ভ নাটকের সগোত্র নয়। বরং মেরিডিথ-এর দৃষ্টিকে বলা বলা উচিত 'intellectual comedy' বা 'thoughtful laughter'। এইখানেই কনগ্রেভ ও শেরিডন থেকে তিনি পৃথক। এই প্রসঙ্গে 'Egoist' উপন্যাসে 'Prelude' অংশে 'কমেডি' সম্পর্কে তাঁর উ ক্তর উল্লেখ করা যেতে পারে: Comedy is a game played to throw reflections upon social life, and it deals with human nature in the drawing room of civilized men and women where we have no dust of the struggling outer world, no mire, no violent crashes to make the correctness of the representation convincing···The comic spirit conceives a definite situation for a number of characters and rejects all accessaries in the exclusive pursuit of them and their speech." এই 'কমিক'-আদর্শ ফিল্ডিং-এর 'comic-epic in prose' থেকে পৃথক।

জর্জ এলিয়টের শেষ পর্যায়ের রচনার মতো 'আইডিয়াধর্মী'

মনোবিশ্লেষণ দেখা যায় মেরিডিথের উপন্যাসে। মেরিডিথ স্তাঁদাল-এর প্রশংসা করেছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের নৈপুণ্যের জন্য। মানবচিত্তলোক তাঁর মতে উপন্যাসের প্রকৃত বক্তব্য। নরনারীর এই "internal history" যদি উপন্যাসে রূপায়িত না হয়, যদি এই মনোদর্শন শিল্পীর মননে স্থান না পায় তাহলে তাঁর মতে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ নেই। এই মনোদর্শনের পর জোর দিয়েছিলেন বলেই মেরিডিথ উপন্যাসে কাহিনী-গ্রন্থনকে (plot) কোন স্থানই দিতে চান নি। উচ্চস্থান দিয়েছেন 'চরিত্র' (character)-কে। কিন্তু তবু মেরিডিথ স্মরণীয় চরিত্র বেশি সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে অন্ত্যপর্বের 'ডায়না অব দি ক্রশওয়েস্'-এর উপন্যাসের 'ডায়না'র মধ্যে Earth-mother তত্ত্বটি সুন্দর ভাবে রূপায়িত (১৮৮৫) হয়েছে। এই তত্ত্বের পিছনে সমকালীন বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব রয়েছে। সেই 'অভিব্যক্তিবাদ'কে মেরিডিথ তার নিজস্ব উপলব্ধিতে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'মৃত্তিকা-জননী' দর্শনে তাঁর সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মিল খোঁজা যেতে পারে কিন্তু সে সাধর্ম্য-সন্ধান ব্যর্থ হবে। এই 'মৃত্তিকা-জননী' তত্ত্ব যেন প্রাচীন মানুষের আদিম চেতনা, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের আলোকে পরিমার্জিত। 'ডায়না' চরিত্রটিকে শুধু নয় মেরিডিথ তাঁর বিশেষ বিশেষ নারী-চরিত্রগুলিতে তরুর মত আত্মার শক্তিতে বেড়ে উঠবার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। ডায়না উজ্জ্বল বুদ্ধির অধিকারিণী ও ব্যক্তিত্ব গর্বিতা। সে ওয়ারউইক-কে বিবাহ করেছে কিন্তু তার 'ইন্টেলেকচুয়াল' তৃষ্ণা, তৃপ্ত হয় নি। সে প্লেটোনিক সখ্য স্থাপন করেছে একদা বহুবল্লভ ও বর্তমানে গতযৌবন এক ব্যক্তির সঙ্গে এবং পরিণামে কলঙ্কবতী হয়েছে। তারপর বুদ্ধিশালিনী লেখিকারূপে তার নাম ছড়িয়েছে। সে মক্ষীরাণীর মত বহু বুদ্ধিমান যুবকের আকর্ষণের লক্ষ্য হয়েছে—সেই দলের মধ্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও আছেন। ড্যাসিয়ের নামে একটি তরুণ রাজনীতিক তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ডায়না

তারই রাজনৈতিক মতবাদগুলি নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করেছে। তার কারণ ডায়নার অর্থ প্রাপ্তির আকাংক্ষা শুধু নয়, নারী যে পুরুষের সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তায়ও সমকক্ষ সেকথা প্রমাণ করাই তার দরকার। একদিন রাত্রে তারা দুজন যখন একা, তখন ড্যাসিয়ের শস্য আইন প্রত্যাহার সম্পর্কে মন্ত্রীসভার গোপন সিদ্ধান্ত ডায়নাকে বলে ফেলল। ডায়নার কাছে তখন ড্যাসিয়ের প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে গেল। অথচ কয়েক মাস আগে তার সঙ্গেই সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, একটি অভাবিত দুর্ঘটনার জন্য যা সম্ভব হয়নি। ডায়না মধ্যরাত্রে সম্পাদক টমাসের কাছে এই তথ্য ফাঁস করে গর্বিতা নারীর বিজয়োল্লাস নিয়ে ফিরে এল। তারপর এর প্রতিক্রিয়া হল মারাত্মক। ডায়না তাতে ভেঙে পড়ল। শেষে রেডওয়ার্থ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সুস্থ ও সুখী জীবনের পথে। কেননা রেডওয়ার্থ "believed in the soul of Diana. For him it burned and it was a celestial radiance about her—unquenched by her shifting fortunes, her wilfulness and it might be, errors. She was a woman and weak ; that is, not trained for strength. She was a soul ; therefore perpetually pointing to growth in purification."

এই 'দার্শনিক' দৃষ্টি মেরিডিথের বৈশিষ্ট্য।

মেরিডিথ আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে আছেন তার রচনাশৈলীর জন্য, বিশেষত তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে প্রযুক্ত অভিনব স্টাইলের জন্য। বুদ্ধিদীপ্ত, পরিহাসমার্জিত বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনার উদ্বাহ বন্ধনে যে স্টাইল তিনি গড়েছেন তাকে সংস্কৃত আলংকারিক কুন্তকের ভাষায় 'বক্রোক্তি' বলা যায়। এজন্যই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্যায়ের উপন্যাসে ব্যবহৃত গদ্যরীতির মেরিডিথীয় রীতির সঙ্গত সাদৃশ্য দেখেছেন। এই রীতি হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রভৃতির লেখায় লক্ষিত হয়।

টমাস হার্ডির (১৮৪০—১৯২৮) রচনা ইংরেজি উপন্যাসকে রুষ ও ফরাসী উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির পাশে দাঁড়াবার অধিকার এনে দিয়েছে। তাঁর পূর্বজ ও সমকালীন প্রখ্যাত রুষ ও ফরাসী শিল্পীদের উপন্যাস তিনি পাঠ করেছিলেন, সেই ঐতিহ্য তাঁর উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু হার্ডির উপন্যাস, তাঁর উপলব্ধ 'দুঃখবাদী'-দর্শন, সামাজিক-নৈতিক অত্যাচার ও প্রথাগত সংস্কার-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতির ত্রিধারায় সঞ্জীবিত হয়ে অপূর্ব বাস্তব জীবনধর্মী শিল্পরূপে আদৃত হয়েছে।

এক ধরনের নৈরাশ্যবাদী দুঃখদর্শন হার্ডির মনে কৈশোর কালেই দেখা দিয়েছিল। তিনি সেই বয়সেই একদিন যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন একটি অচেনা মূর্তি দুহাত আকাশে তুলে তাঁকে পিছন থেকে জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে, কোনও সুখস্বপ্নে বিভোর থাকতে দিচ্ছে না। এই 'অবিশ্বাস্য' ঘটনা হার্ডির ভাবপ্রবণ মনে অনপনেয় প্রভাব ফেলেছিল এবং এই ঘটনাই যেন ক্রূর নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা রূপে তাঁর ট্রাজিক উপন্যাসগুলিতে রূপায়িত হয়েছে। জীবনের প্রতি এই নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টি মূলত তাঁর অভিজ্ঞতা জাত, শোপেনহাউয়রের দর্শন বা ডারউইন, ওয়ালেস, হর্বার্ট স্পেনসর পড়বার ফল নয়। অর্থাৎ প্রথমে অধ্যয়নের ফলে তিনি বুদ্ধিগত বিচারের পথে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছননি। তিনি শোপেন-হাউয়রের 'দুঃখবাদী'-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বেই অনুরূপ দুঃখবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন: "Happiness is an occasional episode in a general drama of pain." এই দুঃখবাদী দর্শনের উৎস হিসেবে তাঁর কৈশোরের ঘটনাটি বলা হয়েছে। আর একটি কারণ তাঁর 'ওয়েসেক্স' অঞ্চলের 'সূর্যহারা অরণ্য'-জীবনের নৈসর্গিক প্রকৃতির অভিজ্ঞতা। আদিমকল্প পৃথিবীর প্রাণবহ সেই জীবনে হার্ডি দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি নিশ্বাস নিয়েছেন। তার একদিকে Greenwood tree অন্যদিকে Egdon Heath।

একদিকে গ্রীণউড গাছের শ্যামল সুন্দরস্বপ্ন অন্যদিকে Egdon Heath-এর দুর্জ্ঞেয় নিষ্ঠুর জাগ্রত অন্ধ-শক্তি। হার্ডি এই গ্রামীণ অঞ্চলে, নাগরিক যন্ত্রসমৃদ্ধ সমাজের বাইরে বিশ বছর বয়স অবধি বাস করেছিলেন। সেই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সহিত নিবিড় পরিচয়গত অভিজ্ঞতা তাঁর রক্তে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি জেনেছিলেন এই সব নর-নারীর জীবনে যে সুখ-দুঃখের নাটক অভিনীত হচ্ছে—তার মূল্য গ্রীক বা সেক্সপীরীয় নাটকের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

'প্রকৃতি'র যে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখেছিলেন ওয়েসেক্স অঞ্চলের চাষীদের জীবনে, হার্ডির নৈরাশ্যবাদের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। কিন্তু শুধু নৈসর্গিক জগতের কথা নয়, বৈষম্যমূলক ভূমিব্যবস্থার ফলে চাষীদের দরিদ্র জীবনের ট্রাজেডিও হার্ডির অজ্ঞাত ছিল না। হার্ডি ঔপন্যাসিক রূপে আত্মপ্রকাশের কালে দেখেছিলেন তাঁর কৈশোর ধাত্রী সেই গ্রামীণ সমাজ কী ভাবে ভেঙে যাচ্ছে, ধ্বসে যাচ্ছে। যারা একদিন সম্পন্ন বনেদী চাষী ছিল তারা নিরন্ন পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। নাগরিক, যন্ত্রশাসিত সমাজ ক্রমে অগ্রসর হয়ে সেই স্বপ্নের দেশকে গ্রাস করে নিচ্ছে। 'টেস্' যেন সেই গ্রামীণ সমাজের প্রতীক। অ্যালেক ও এনজল উভয়ের দ্বারাই সে লাঞ্ছিতা হয়েছে। নাগরিক সমাজের নাগরালি এবং 'শ্রেণী' সংস্কার ঐ দুটি পুরুষ চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

ভাবপ্রবণ হার্ডির দুঃখবাদ মূলত এই সমস্ত উপাদান দ্বারা গঠিত হয়েছিল। শোপেনহাউয়র-এর Will তত্ত্ব তিনি পড়েছিলেন। শোপেনহাউয়রের Will তত্ত্ব ডারউইনের জীববিজ্ঞানে, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বে, বৈজ্ঞানিক সমর্থন লাভ করেছিল। হার্ডির কৈশোরজাত দুঃখবাদ এই তত্ত্বগুলি অধ্যয়নের ফলে জোরালো হয়েছিল। ডারউইন, হর্বার্ট স্পেনসর প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মতবাদ সেকালে খ্রীস্টধর্মের ভিত নড়িয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছিল। হার্ডিও তাঁর দুঃখবাদী দর্শনের প্রশ্নের জবাব খ্রীষ্টধর্মে সেদিন পাননি। সংশয়

ও বিশ্বাসহীনতার অংশভাক্ হার্ডির হৃদয় ক্রুর নিয়তি-লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি মমতায় উদ্‌বেল। তাঁর বহু-অধীত গ্রীক ট্রাজেডির ভাগ্যহত চরিত্রের মত তাঁর সৃষ্টি ইউস্‌টাসিয়া ভাই চিৎকার করে বলেছে :

> "O the cruelty of putting me into this ill-conceived world! I was capable of much; but I have been injured and blasted and crushed by things beyond my control."

—এই সব চরিত্রের প্রতিই তিনি মমতাময়। তাই হার্ডি 'সিনিক' নন। তিনি নিজেই লিখেছেন : "No man can be a cynic and live."

হার্ডি ঊনবিংশ শতকের শেষ-দশকে তার বিখ্যাত দুখানি উপন্যাস Tess of the D'Urbervilles (১৮৯১) এবং Jude the Obscure (১৮৯৫) রচনা করেন। 'টেস্' উপন্যাসে হার্ডি তার নায়িকার বিশেষণ দিয়েছিলেন 'A Pure Woman'। ভিক্‌টোরীয় যুগের রক্ষণশীল ইংরেজ পাঠকের ধর্মানুশাসিত নীতিবাদ ও 'সংস্কার' এই অভিধায় স্তম্ভিত হয়েছিল। হার্ডি সমাজের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৮৯৫-এ প্রকাশিত তার Candour in English fiction প্রবন্ধে তিনি ধর্ম ও যৌন প্রসঙ্গে সমকালীন ইংরেজদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন। প্রশংসা করেছিলেন প্রাচীন গ্রীক ও এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের সংস্কার মুক্ত দৃষ্টির। অভিজ্ঞতা লব্ধ সমাজ চেতনা, সৎ শিল্পীর মানবিক বিদ্রোহ এবং হৃদয়বানের মমতা হার্ডির 'টেস' উপন্যাসকে 'ক্লাসিক' পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের সমাজরক্ষকেরা আহত হলেও বিংশ শতকীয় বৈপ্লবিক মনোভাব হার্ডির ঐ উপন্যাস দুখানিতে জ্বলে উঠেছে।

গ্রামের সরলা মেয়ে টেস্ বাবা মায়ের আগ্রহে শহরে তাদের বংশের ধনী আত্মীয় অ্যালেক-এর গৃহে এসে কাজ নিয়েছিল।

তারপর লম্পট অ্যালেক্-এর দ্বারা সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবৈধ মাতৃত্বের পথে এসেছিল। সন্তানটি মারা গেলে টেস একটি ডেয়ারি ফার্মে কাজ নিল। সেই ফার্মে কাজ শিখতে এসেছিল শিক্ষিত সম্পন্ন যাজক পরিবারের ছেলে এনজেল। টেস-এর মধ্যে চিরকালের 'নারী' আবার জেগে উঠল। তারা পরস্পরকে ভালোবাসল। টেসের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করল এনজেল। কিন্তু টেস্ পূর্ব-জীবনের স্মৃতির প্রেতচ্ছায়া থেকে যেন মুক্তি পাচ্ছিল না। সে এনজেলকে বারবার বলবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। এনজেলের দরজায় সব কথা খুলে চিঠি লিখে রেখে এসেছে, কিন্তু সে চিঠি এনজেলের হাতে পড়েনি। পরে টেস্-ই আবার লুকিয়ে সে চিঠি সরিয়ে রেখেছে।

তাদের বিবাহ হল, মধুরাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তারা একটি দূরের সরাই-তে গেল। এনজেল স্থির করেছিল: And shall I ever neglect her, or hurt her or even forget her or even forget to consider her? God forbid such a crime! কিন্তু ভাগ্যের কী দারুণ পরিহাস—টেস-এর মুখ থেকে যখন সে শুনল তার অশ্রুভরা বেদনার কাহিনী, তখন সেই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত প্রেমিক স্বামী বলল: O Tess, forgiveness does not apply to the case! You were one person; now you are another. টেস ক্ষমা ভিক্ষা করেছে, লুটিয়ে পড়ে মার্জনা চেয়েছে কিন্তু তাকে more sinned against than sinning জেনেও এনজেল শেষ পর্যন্ত টেসকে ক্ষমা করতে পারেনি। গ্রামের কৃষক কন্যা টেসের অনুপম আননশ্রী তাকে মুগ্ধ করেছিল কিন্তু সে তার শ্রেণীগত, সমাজগত 'সংস্কার'কে ভুলতে পারেনি। তাই সে বলেছে: Don't Tess; don't argue. Different societies, different manners. You almost make me say you are an unapprehending peasant woman, who have never been initiated into the proportions of social things.

টেস্ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব করেছে, মরবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এনজেল-এর পাছে দুর্নাম হয় সেই ভয়ে আত্মহত্যা করেনি। সে দুঃখ বহন করেছে—শোপেনহউয়রের কথাই টেস্ তার জীবনে সত্য করে তুলেছে: 'The woman pays her debt not by what she does but by what she suffers.'

টেস্-কে ত্যাগ করল এনজেল। আর সে কাঁদল না, হাহাকার করল না। করুণা ভিক্ষা করল না। নারীত্বের মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। (এই প্রসঙ্গে বলা যায় নাট্যকার ইবসেন্ [১৮২৮—১৯০৬]-এর নাটকের নারী চরিত্রগুলির প্রভাব হার্ডির শেষের উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। ইবসেনের নাটক হার্ডির খুব প্রিয় ছিল। ইংলণ্ডে ১৮৮৯-এ ইবসেন্-এর নাটক মঞ্চস্থ হয়। হার্ডি সেই নাটক দেখে বলেছিলেন: "Ibsen's edifying is too obvious." 'হেড্ডা গ্যাবলার', 'এ ডলস্ হাউস'-এ যে-নারীব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ হার্ডি লাভ করেছিলেন তারই ছায়া এখানে পড়েছে।) টেস্ ফিরে গেল তার পুরোণো গ্রামে মা-বাবার কাছে। এনজেলও তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল ব্রেজিল এ। যাবার আগে তার মায়ের সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তরে বলে গেল তার স্ত্রী পবিত্রা। (কিন্তু সে তার নিজের মুখরক্ষা মাত্র!) এখানেই গল্প শেষ হতে পারত, কিন্তু হার্ডির উদ্দেশ্য তা হলে সফল হত না।

নিয়তির খেলায় দারিদ্র্যপীড়িতা, স্বামীপরিত্যক্তা টেস্ এর দেখা হল আবার অ্যালেক-এর সঙ্গে। সে জানাল সে পবিত্রধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, তার 'conversion' হয়েছে। শেষ পর্যন্ত টেস্ তার স্বামীর কাছ থেকে কোনও সাড়া পেল না. চিঠি লিখে জবাব পেল না, ব্যাকুল আবেদন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। এদিকে মা-ভাইয়ের পেটে অন্ন নেই, ওদিকে অ্যালেক-এর সহৃদয় বদান্যতা, সঙ্গে অর্থপূর্ণ আহ্বান। অনুতপ্ত 'সংস্কার'-মুক্ত এনজেল যখন ফিরে এল টেস তখন অ্যালেক-এর 'মিস্ট্রেস্'। এনজেল খুঁজে খুঁজে বার করল টেস্‌কে। কঠিন শান্ত ক্ষমাহীন গলায় টেস্ এনজেলকে ফিরে চলে যেতে বলল। কিন্তু

সে চলে যেতেই টেস্ যেন পাগল হয়ে উঠল, ছুরি দিয়ে খুন করল অ্যালেককে তারপর এনজেল-এর সঙ্গে এসে মিলল। চলল তাদের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অজ্ঞাতবাসের পালা। এ দিনগুলি দুঃখের মধ্যে অমৃতের মত টেস্-এর জীবনকে মাধুরীতে ভরে দিল। শেষে যখন মনে হয়েছে তাদের বিপদের পালা শেষ, তখনই ঘুমন্ত টেস্ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। শাস্তি হল ফাঁসি। হার্ডি টেস্-এর এই মৃত্যুদণ্ডকে সহ্য করতে পারেননি। তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে, তাঁর 'ন্যায়'-নীতির বিরুদ্ধে শাণিত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিয়েছেন: "Justice was done, and the President of the Immortals in Æschylean phrase had ended his sport with Tess. And the D'Urbervilles knights and dames slept on in their tombs unknowing." 'জুড' চরিত্রের জটিলতা, করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিশালতা টেস্ চরিত্রে না থাকলেও টেস্ সর্বযুগের পাঠকদের সহানুভূতি লাভ করেছে।

'জুড দি অবসকিওর' ১৮৯৫-এ বার হয়। 'টেস্' বার হবার পর রক্ষণশীল ইংরেজ সমাজে যে আলোড়ন হয়েছিল 'জুড' প্রকাশোত্তর কালের তুমুল আন্দোলনের কাছে তা নগণ্য। হার্ডি ১৯১২-তে লেখা জুড-এর ভূমিকার Postscript বা অনুলেখ অংশে জানিয়েছেন যে লেখককে না পোড়াতে পেরে জনৈক বিশপ (বিশপ অব ওয়েকফিল্ড) বইখানিকে ভস্মীভূত করেন সামাজিক দুর্নীতির বিষ ছড়াবার অপরাধে। অন্যদিকে জনৈক অ্যামেরিকান পণ্ডিত 'জুড'-এর বিরোধী সমালোচনা পড়ে এককপি বই কিনে পড়তে শুরু করেন। বই পড়া শেষ হয়ে গেল অথচ 'সেরকম দৃশ্য কিছু' না পেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনিও বইটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাঁর মতে 'জুড' উপন্যাসখানি—"a religious and ethical treatise!"

সাহিত্যের প্রকৃত পাঠক ঐ দুটি মতেরই বিরোধী! 'জুড' টমাস হার্ডির প্রকৃতপক্ষে শেষ উপন্যাস এবং মহত্তম সৃষ্টি। এই উপন্যাস-খানি হার্ডির মনের বিংশ শতকীয় আধুনিকতাকে তথা তাঁর শিল্পী

কল্পনার বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠতাকে সুউচ্চ মহিমায় স্থাপন করেছে। Under the Greenwood Tree থেকে Tess of the D'Urbervilles পর্যন্ত হার্ডি মোটামুটি 'গ্রামীণ' কিন্তু 'জুড দি অবসকিওর'-এ বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক দৃষ্টির পূর্ণ প্রকাশ। 'টেস্'-এর তুলনায় 'জুড' উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডি—'টেস' যেন a drama of pathos।

জুড-এর মুখ্য নারী চরিত্র 'সু'-এর বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির করুণ দ্বন্দ্ব, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও গভীরতা বা ধর্ম ও বিবাহ সম্পর্কে বৈপ্লবিক আদর্শ বহন হার্ডির উপন্যাসে অন্য চরিত্রে নেই। লরেন্স-এর পূর্বে এইরূপ যৌন বিদ্রোহ ইংরেজি উপন্যাসেই নেই। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার নারীমুক্তি আন্দোলন (Feminist movement) ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের শেষ পাদে বেশ জোরদার হয়েছিল। তখনও পার্লামেন্ট-এ নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। সেই ভোটাধিকার অর্জনের চেষ্টা ঐ পর্বের উল্লেখ্য ঘটনা। শ্রীমতী যোশেফাইন বাটলার-এর সমাজবন্ধন থেকে মুক্তির আহ্বান, সারা গ্রানড্-এর চাঞ্চল্যকর উপন্যাস The Heavenly Twins-এর প্রকাশ (১৮৯৩), ইবসেন-এর 'A Doll's House এর অভিনয় (১৮৮৯), মোনা কেয়ার্ড এর 'The Morality of Marriage' প্রবন্ধাবলী (১৮৮৮—১৮৯৪)—সেই আন্দোলনের পুষ্টি ও ফলশ্রুতির সাক্ষ্য। হার্ডির টেস্ (১৮৯১) ও জুড (১৮৯৫)—এই যুগসমস্যা ও যুগবিপ্লবের সহিত জড়িত।

'জুড় দি অবসকিওব' পড়তে পড়তে গ্যেটে-র 'ফাউস্ট এর কথা মনে পড়ে। গোটের নিজের জীবনেরই দুটি দিক যথাক্রমে ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিস্-এর মধ্যে মূর্ত হয়েছে। ফাউস্টের একদিকে মর্ত্যের বন্ধন ফেলে ঊর্ধ্বলোকে দিব্যসুধা পানের কামনা অপর দিকে নরকের অন্ধকারে দেহক্ষুধার আদিম লালসা। গ্যেটে মৃত্যুর পূর্বে বলে উঠেছিলেন, 'আলো, আরো আলো'! তাঁর ফউস্টও আলোক-তীর্থের অম্লান যাত্রী। তেমনি হার্ডির জুড চরিত্রেরও একদিকে দেখি সু অপর দিকে আরাবেল্লা। ঊর্ধ্বের Spirit ও

নিম্নের Flesh-এর দ্বন্দ্ব। একদিকে স্বর্গের সুষমা অপর দিকে নরকের তমসা। একদিকে প্রেমের সুধা অপর দিকে দেহের সুরা। একদিকে ক্লাসিকস্ অনুশীলনের, ক্রাইস্‌টমাস্‌-এর সাধনলোক অপর দিকে বিড়ম্বিত, বিবাহিত জীবনের ব্যর্থ জগৎ। কিন্তু তবুও জুড এর প্রাণবিহঙ্গ শেষ পর্যন্ত আলোক-তৃষ্ণা বুকে নিয়ে উড়ে গেল—'when I am dead, you will see my spirit flitting up and down here among these.'

শিক্ষা ও রুচিহীনা আরাবেল্লা ডন মেয়েটির দেহের পাত্রে যৌবনের উগ্র সুরা একদা জুডকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ক্লাসিকস-এর পবিত্র পৃষ্ঠা থেকে। সে থমকে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত পারল না। আরাবেল্লাকে তার সঙ্গিনীরা শিখিয়ে দিল জুডকে গাঁথবার অমোঘ ছিদ্রপথ। আরাবেল্লা হঠাৎ জুডকে জানিয়ে দিল সে অন্তঃসত্ত্বা। জুড ধর্ম ও নীতি মানে, কাজেই সে দায়িত্ব এড়াল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লাসিকস্ বেচে সংসারের সরঞ্জাম কিনল। কিন্তু মাতৃত্বের বিষয়টি আরাবেল্লার ছলনা। শুধু জুডকে বাঁধবার চতুর কৌশল। উনিশ বছরের ভাবপ্রবণ যুবক ধর্মপ্রাণ জুড-এর কাছে বিবাহের সব রঙ মুছে গেল। তারপর একদিন রাত্রে বাসায় ফিরে আবেল্লার চিঠি পেল : 'shall not return.'

জুড-এর হৃদয়পটে আর একটি মেয়ের মুখ ভোরের আলোর মত ফুটছিল। কিন্তু তার বৃদ্ধা পিসীর নিষেধ ছিল সে যেন এই নিকটাত্মীয়া মেয়েটির সঙ্গে না মেশে। কেন না তাদের বংশে উদ্বাহ-সুখ নেই। জুড-এর বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবন বিচ্ছেদান্ত। আত্মীয়া মেয়েটি স্যু-র ইতিহাস একই। জুড-এর কাছে বৃদ্ধা পিসীর এই নিষেধ ও পিতৃ-ইতিহাস যেন সেকালের ডাইনীদের সাবধান-বাণীর মত পিছনে চলেছে। মেরিগ্রীন ছেড়ে সে এসেছে শিক্ষাসত্র ক্রাইসটমাস-এ। কিনে এনেছে বই-খাতা। খোঁজ পেয়েছে সেই ফটোর মেয়েটি স্যু-এর। সেও একা। তারা এক সঙ্গে বেড়িয়েছে, গল্প করেছে—স্যু-র মধ্যে যেন জুড পেয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে

(যেমন গ্যেটে পেয়েছিলেন ফ্রেডারিকার মধ্যে)। কিন্তু জুড ভুলতে পারে না তার বিবাহের তিক্ত অথচ দুশ্ছেদ্য ইতিহাস।

স্যু বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না। নারীর সহজাত আবেগ অনুভূতিও তার প্রবল। কিন্তু সে ধর্ম, বিবাহ, প্রথা প্রভৃতির 'সংস্কার'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী। তাই জুড তার সম্বন্ধে বলেছে: 'You are quite Voltairean.' তাই খ্রীস্টভক্তদের আশ্রয় থেকে একদিন সে বহিষ্কৃতা হল। জুড তাকে নিয়ে গেল তার প্রাক্তন শিক্ষক প্রৌঢ় রিচার্ড ফিলেটসন্-এর কাছে। এতদিনের নিঃসঙ্গ আদর্শ-চরিত্র শিক্ষক স্যু-কে ভালোবেসে ফেললেন। ওদিকে শিক্ষাগারের কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে জুড প্রত্যাখ্যাত হল। তখন শুরু হল জুড-এর অন্তর্জ্বালা। সেই অন্তর্জ্বালায় সে মদ খেল, তারপর সেই রাত্রে স্যু-র কাছে ছুটে গেল, প্রকাশ করল তার হৃদয় যন্ত্রণা।

এদিকে স্যু ফিলটসন্-এর বাগদত্তা হয়ে মেলচেস্টার-এ থিওলজিকাল কলেজে পড়তে এসেছে। জুড বাক্‌দানের কথা জানে না। (আবার নিজের আরাবেল্লার সঙ্গে বিবাহের কথা স্যু কে বলতে পারে নি।) কিন্তু স্যু-ই তাকে জানাল: "আমি তাকে কথা দিয়েছি দুবছর পরে ট্রেনিং স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বিয়ে করব।"

তারপর এক ছুটির দিন তারা বেড়াতে গেল। কিন্তু রাত্রে ফিরতে পারল না। তার শাস্তি স্বরূপ বোর্ডিং এ স্যু-কে আটকে রাখা হল। স্যু পিছনের জানালা টপকে পাশের ছোট নদী সাঁতরে ওপারে সিক্ত বেশে জুড-এর ঘরে গিয়ে হাজির হল। সেখানে স্যু জুডকে জানাল সে লণ্ডনে পনের মাস একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে না করে বাস করেছিল কিন্তু ছেলেটির তীব্র আকাংক্ষা সত্ত্বেও স্যু তাকে দেহ দান করে নি। সে যদিও জুডকে বলেছে: 'তুমি আমাকে ভালোবেসো না', কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্যুও জ্বলছিল।

ওদিকে প্রৌঢ় রিচার্ড ফিলটসন্-এর মনে এল বসন্তের হাওয়া। ঠিক এই সময়টিতে জুড স্যু-কে বলল তার পূর্ব বিবাহের ইতিহাস।

স্যু তার হাত সরিয়ে নিল, নারীতে-নারীতে চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জেগে উঠল। ব্যঙ্গবিদ্ধ গলায় সে বলল 'তুমি তো দারুণ ধর্ম-মানা লোক। তোমার সব দেবতারা, মানে, তোমার 'সেন্ট'রা (saint) কী করে এ-ব্যাপারে তোমার পক্ষে ওকালতি করছেন? আমার কথা আলাদা—কেননা আমি বিয়ে ব্যাপারটাকে সাংঘাতিক আধ্যাত্মিক কিছু বলে মনে করি না—কিন্তু দেখছি তোমার মত আর পথের মিল নেই।···'আমাকে ভালোবাস' একথা বলার আগে তোমার আগের বিয়ের কথা জানানো উচিত ছিল।" স্যু-র চোখে জল দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত জুড কন্যা সম্প্রদান করল—স্যু-র নিষ্ঠুর অনুরোধে। চারদিকের আকাশ যখন বেদনার কালোমেঘে ভরল তখন সুরাপাত্রকেই বন্ধু মনে হল। সেই পানাগারে আরাবেল্লা তখন 'মেড'। স্যু-এর জন্য সেই সন্ধ্যায় জুড অপেক্ষা করার কথা ভুলল—রাত্রিটা কাটিয়ে দিল আরাবেল্লার সঙ্গে। আরাবেল্লা জানাল সে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। কিন্তু বিবাহের পর স্যু-র মধ্যে দেখা দিল তীব্র অন্তর্জ্বালা। তার বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জুড-এর প্রতি দুবার আকর্ষণ ফিলটসন দুঃসহ ব্যথায় সব মেনে নিল। তাকে চলে যাবার স্বাধীনতা দিল। আরাবেল্লা-ও জুডকে অনুরোধ করল তাকে মুক্তি দিতে। জুড সানন্দে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করল। স্যু চলে এল জুডের কাছে। কিন্তু উপন্যাস এখানে শেষ হল না।

তখন তারা বিবাহ-হীন জীবন যাপন করছে। একদিন রাত্রে দরজায় আরাবেল্লার করাঘাত পড়ল। তখন স্যু-র মধ্যে পুরুষকে ছিনিয়ে-নেয়া নারী ক্ষেপে উঠল। সে আরাবেল্লার থাবা থেকে জুডকে টেনে নেবার জন্য বিবাহে সম্মত হল। কিন্তু বিবাহের আপিস থেকে, চার্চের দরজা থেকে তারা ফিরে এসেছে—স্যু-এর জন্যই ফিরে এসেছে। কেন না স্যু-র তখনও ধারণা 'how hopelessly vulgar an institution legal marriage is—a sort of trap to catch a man—I cannot bear to think of it.'

এমন সময় তাদের সংসারে এল জুড ও আরাবেল্লার সন্তান বিবর্ণ-প্রাণ ফাদার টাইম। তারপর থেকে শুরু হল সামাজিক নির্যাতন। স্যু ও জুড যে চার্চ-বিহিত বিধানে বিবাহিত না হয়েও দাম্পত্যজীবন যাপন করছে—এ ঘটনায় সমাজ ক্ষেপে উঠল। তারা স্থান বদলাল কিন্তু তবুও তাদের ভাগ্য প্রসন্ন হল না। বারবার কাজ ছাড়তে বাধ্য হল। শেষ পর্ব 'ক্রাইস্‌টমিনিস্টার'-এর জুড-এর জীবনের শুরু ও শেষ একই কেন্দ্রে।

উপন্যাস এখানেও সমাপ্ত হল না।

হঠাৎ একটি বীভৎস ঘটনা ঘটল। জুড ও স্যু একদিন বাসায় ফিরে দেখল ফাদার টাইম স্যু-এর ছেলেদুটিকে হত্যা করেছে এবং নিজেও আত্মহত্যা করেছে—এক টুকরো কাগজে লেখা ছিল: '*Done because we are too menny.*' এর উপর স্যু একটি মৃত সন্তান প্রসব করল। এই দুর্ঘটনা স্যুর মধ্যে জাগিয়ে তুলল 'পাপবোধ'—তার মনে হল সে 'পাপ' করেছে তাই এই প্রায়শ্চিত্ত। বিবাহের যে সংস্কারের বিরুদ্ধে সে চিরদিন লড়াই করেছে, সন্তানের মৃত্যুতে সে সেই সংস্কারকে আশ্রয় করল। ফিরে গেল ফিলটসন্-এর কাছে। পুনরায় বিবাহ করল ফিলটসনকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এল আরাবেল্লা। তখন সে বিধবা। স্যু-র জন্য জুড তখন মর্মচ্ছেদী যন্ত্রণায় কাতর। আরাবেল্লা তাকে নিয়ে গেল পানাগারে, তারপর কড়া মদে চুর করিয়ে জুড যখন বিকলচেতন তখন কৌশলে তাকে কাছের চার্চে নিয়ে বিবাহটা সেরে ফেলল। জুড স্যু-র বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেনি, ছুটে গেল তার কাছে, বলল: "I was gin-drunk; you were creed-drunk. Either form of in-toxication takes away the nobler vision."—স্যু ফিলটসনকে পুনর্বিবাহ করলেও, 'সংস্কার'কে আশ্রয় করলেও জুড-এর ব্যগ্র বাহুর সেই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। তারপর জুড অসুখে পড়ল। আরাবেল্লা তার লণ্ডনের স্বামীকে হারিয়ে কৌশলে জুডকে ধরেছিল। তখন জুড যদি হারায় তাহলে যাতে ডাক্তারটি

হাতছাড়া না হয় তার পথও খুলে দিল। মুমূর্ষু, তৃষ্ণার্ত জুড জল চাইল—তার কম্পিত স্বর দেয়ালে ঘা খেয়ে-খেয়ে ফিরে এল।

—সংক্ষেপে এই হলো 'জুড দি অব্‌সকিওর'-এর গল্পাংশ।

জীবনশিল্পী মানবতাবাদী হার্ডি তাঁর সমকালীন অসকার ওয়াইলড্‌-এর 'All art is useless' মতবাদ স্বীকার করেন নি। কলাকৈবল্যবাদী অস্‌কার ওয়াইলড্‌-এর The picture of Dorian Gray ১৮৯০-এ Lippincott's Magazine-এ প্রথম বার হয়। তারপর বর্ধিত আকারে ১৮৯১-এ উপন্যাসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ১৮৯১-এ হার্ডির 'টেস' প্রকাশিত হয়েছে। তার পূর্বে The Woodlanders, The Return of the Native, Far from the Madding Crowd, The Mayor of Casterbridge প্রভৃতি বেরিয়ে গেছে। হার্ডির জীবনধর্মী ও মানবিক লক্ষ্যে অসকার ওয়াইল্ড বিশ্বাসী নন। তিনি এই উপন্যাসের মুখবন্ধে লিখলেন "There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all."। পত্রিকার সমালোচনার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন: "My Story is an essay in decorative art, it reacts against the crude brutality of plain realism." যে-অবক্ষয়ী অথচ নিপুণ শিল্পদক্ষ দৃষ্টি বোদলের, গোতিয়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তারই ঐতিহ্যবহ পরিণতি 'ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসে। অস্‌কার ওয়াইল্ড-এর কলা-কৈবল্যবাদের প্রবক্তা হলেন গোতিয়ে। তাই মনে হয় হার্ডির উপন্যাস মৃত্তিকার উদ্ভিদ, ওয়াইল্ড-এর 'ডোরিয়ান গ্রে' 'perfect' অর্কিড।

স্কটের মতো হার্ডি-ও চমৎকার গল্পকথক ও বয়নশিল্পী। এই কথন ও বয়ন নৈপুণ্য হার্ডির উপন্যাসকে অনন্যসাধারণ শ্রী দান করেছে। তার সঙ্গে রয়েছে 'আয়রণি' (Irony) সৃষ্টির নাট্যকার-সুলভ দক্ষতা।

বাংলা উপন্যাসের আদি-পর্ব

বাংলা উপন্যাস গড়ে উঠেছে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। খ্রীষ্ট পর দশম শতকের শেষার্ধে বাংলা ভাষা অপভ্রংশের নির্মোক পরিত্যাগ করে নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। সেই সদ্যোজাত ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাগীতি। ঐ গীতিগুলির ভাষা প্রকৃত পক্ষে 'প্রত্ন বাংলা' বা Proto-Bengali. গীতিগুলির শীর্ষে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থাকায় স্বীকার করতে হবে যে ঐগুলি গীত হত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বর্ণনা, সংলাপ ও গীতি-র সার্থক ত্রিবেণী রচিত হয়েছে। 'গুর্জর রাগেন সহ গীয়তে' 'মালব রাগেন সহ গীয়তে'—নির্দেশগুলি দ্বারা বোঝা যায় যে জয়দেব তাঁর কাব্যে বিভিন্ন রাগাশ্রিত পদগীতি বিন্যস্ত করেছেন। চর্যাগীতি ও 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের অন্তর্ভূত গীতিগুলির ঐতিহ্য অপভ্রংশ সাহিত্যে ও ভাষা-গীতে। তার কারণ ক্লাসিকাল সংস্কৃতে এই রীতির সাক্ষ্য মেলে না কিন্তু অপভ্রংশে ও ভাষাগীতে কবিতা ও গীতির একাত্মতা লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তসঙ্গীত, সহজিয়া-বাউল পদগীতি সবই তার সাক্ষ্যবহ। শুধু এগুলি নয়, কবিওয়ালাদের গান, নিধুবাবুর টপ্পা, দাশরথি রায় ও রূপচাঁদ পক্ষীর পাঁচালী, মধুসূদন কিন্নরের ঢপ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পর্যন্ত এই ধারাটি বহে এসেছে। শুধু পদাবলী ধারার কথাই নয়। মঙ্গল-পাঁচালী কাব্যও গীতাত্মক। মঙ্গল-গীত পালাক্রমে গান করা হত। মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন এবং রামমঙ্গল বা রামায়ণ—মধ্যযুগের সর্বপর্যায়ের বাংলা কাব্য সম্পর্কেই একথা সত্য। আগ্রহী শ্রোতা, কবি-গায়েন, দোহার ও বাদ্যকর মিলে সেই 'আসর' রচিত হত। তবে অষ্টাদশ শতকের

পূর্ব পর্যন্ত মঙ্গল গীতপালার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ধর্মস্থান ও ধর্মাচারের যোগ অচ্ছেদ্য ছিল। কাজেই সেদিনকার সাহিত্য ছিল প্রধানত ধর্মাশ্রিত, ছন্দোবদ্ধ, গীতাত্মক এবং গ্রামীণ। গদ্য সেদিন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেনি। চিঠিপত্রে, দলিল দস্তাবেজে, জয়পত্র-দানপত্রে, আয়ুর্বেদীয় ব্যবস্থাপত্রে, পোর্তুগীজ মিশনারীদের রচনায়, গোস্বামীদের রচিত সহজিয়া কড়চায় অথবা শূন্য পুরাণের ভাষায় আবদ্ধ ছিল। সেদিন আমাদের সমাজ নাগরিক স্তরে উন্নীত হয়নি, ব্যক্তিস্বাধীনতার সন্ধান পায়নি, রঘুনন্দনের বিধির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি, যন্ত্রশিল্পের সন্ধান নেয়নি, মুদ্রাযন্ত্রের স্বপ্নও দেখেনি—তাই সেদিন গদ্য মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

গদ্যের বিকাশের সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা-প্রসার প্রভৃতির সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং শহরবাসী ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ না ঘটলে মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্র ঐতিহাসিক নিয়মে আবির্ভূত হয় না। মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের যোগ। যন্ত্রশিল্প নাগরিক ও বণিকতন্ত্রী সমাজের সৃষ্টি। আর মুদ্রিত গ্রন্থ, পুস্তিকা বা সাময়িক ও সংবাদপত্র বর্ণজ্ঞান সম্পন্ন পাঠকের জন্যই। Listening public বা শ্রোতা-সাধারণের জন্য পালা-গীত, পালা-কীর্তন বা কথকতাই স্বাভাবিক। কিন্তু নাগরিক সমাজে Reading public বা পড়ুয়া-সাধারণ দেখা দেয়। তখন ছাপা বইয়ের প্রয়োজন হয়। ছাপা বই পড়তে গেলে অক্ষর পরিচয় হওয়া দরকার। অক্ষর পরিচয়ের জন্য দরকার পাঠশালা, স্কুল। তারপর ঘটে শিক্ষার প্রসার। তখন স্কুলের সঙ্গে কলেজ স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীও চাকুরিয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দাবির ভিত্তিতেই শিক্ষার প্রসার ঘটা সম্ভব। শিক্ষার প্রসার ঘটলে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে থাকে। কাজেই নগরকেন্দ্রিক সমাজ, গ্রামত্যাগী শহরবাসী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীর সমাবেশ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সূচনা, বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর প্রসার, মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব যখন বাংলাদেশে ঘটেছে তখনই সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক, পুস্তিকা, নক্‌শা, মননশীল রচনা সবই গদ্যাশ্রিত হয়ে দেখা দিয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর লক্ষণীয়। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ পোর্তুগীজ, দিনেমার এমন কি আমেরিকানরাও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে আলোচ্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দেশীয় পণ্যদ্রব্য বা তাদের বহির্বাণিজ্য যে কিছুই ছিল না তা নয়। কিন্তু তার আর উৎকর্ষ ছিল না, ক্রমপ্রসারও ঘটছিল না। আলিবর্দির আমল সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল, সামাজিক সুখশান্তিহীন। সিরাজদ্দৌল্লার স্বল্পকালীন রাজত্ব ১৭৫৭-এ পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হল। এ-পরাজয় ঘটতই, মীরজাফরের চক্রান্ত উপলক্ষ মাত্র। আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো শিথিলমূল জীর্ণ গৃহের মত অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছিল। যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে বাংলাদেশ পলাশীর পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটে এবং মুর্শিদাবাদ, সপ্তগ্রাম, হুগলী, চন্দন নগর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানগুলি বৈদেশিক বণিকদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠায় ক্রমশঃ 'নাগরিক' রূপ পেতে থাকে। এদের মধ্যে ইংরাজেরা কলিকাতায় এবং ফরাসীরা চন্দননগরে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। নীল, তুলা, পাট, রেশমের ব্যবসাই ছিল প্রধান। এই ব্যবসা সূত্রে কুঠী স্থাপিত হত। কুঠীয়াল সাহেবের প্রয়োজন হত দেওয়ানের। ব্যবসায়ী সাহেবদের বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দিদের সহায়তা না পেলে ব্যবসা চালানোর পথ সুগম হত না। সে-যুগের ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে বিদেশী বণিকদের বহু কুঠী ছিল। ঐ সব কুঠীর 'দেওয়ান' হয়েছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের ব্যক্তিরা। এই প্রথম উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দু সাহেবদের কুঠীতে নগদ বেতনে চাকরি

নিল। তারা গ্রাম থেকে বড়ো গঞ্জে বা শহরে এল, নগদ বেতন পেল, কাঁচা টাকার ঘুষ নিল, অপরিমিত অর্থবান হয়ে নতুন 'শ্রেণী'র পত্তন ঘটাল। ফরাসীদের ফরাসডাঙ্গা বা চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী অর্থের জোরে সমাজকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতার বিখ্যাত ধনকুবের রামদুলাল সরকার টাকার জোরে সমাজকে অবজ্ঞা করেছিলেন। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত বিবি আনার নামে একজন পরমাসুন্দরী মুসলমানীকে উপপত্নী রেখে তার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। এর ফলে তিনি জাত্যন্তরিত হলে তাঁর পক্ষের লোকেরা তাকে সমন্বয় করে জাতিতে তোলে। সমকালীন কলিকাতার হিন্দুসমাজে এ-ঘটনা নিয়ে আন্দোলন হলে রামদুলাল সরকার সদম্ভে বলেছিলেন জাত তাঁর বাক্‌সের ভিতরে। সে বাক্‌স হল কাঁচা টাকার বাক্‌স। যাই হোক—ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কবি ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু 'সামাজিক' কারণে ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নগ্রহণ করেন নি, পরে তিনি ওলন্দাজদের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আহার ও বাসস্থান লাভ করেন। তাঁর শেষ আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে 'দুই চারি লক্ষ টাকা' কর্জ করতে আসতেন। সম্রাট এখন শ্রেষ্ঠীর কাছে নত হচ্ছেন—এ তারই ইঙ্গিত। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রাম্মু-নৃসিংহ কবিওয়ালাদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বণিকতন্ত্রী সমাজে, কুঠিয়াল-দেওয়ান-বেনিয়ান মুৎসুদ্দির-সভায় রাধাকৃষ্ণের দিব্য লীলাত্মক পালা-কীর্তনের ভক্ত 'সহৃদয়' শ্রোতা ছিল না, থাকবার কথাও নয়। তাই কবিওয়ালাদের রুচিদুষ্ট গানই তাদের মনোরঞ্জনের ভোগ্য বস্তু হল। কাজেই দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতকে পূর্বের নবাব ও মহারাজাদের প্রাধান্যের হ্রাস ঘটল এবং দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, হৌসদার প্রভৃতি নবোত্থিত ধনী সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা ও প্রভাব বহুগুণ বর্ধিত হল। এঁদের অনেকেই আবার 'রাজা' 'মহারাজা' খেতাব পেয়েছিলেন এবং অর্জিত অর্থে জমিদারিও কিনেছিলেন। মোগল

যুগের বিলাসী জীবনযাপনের ও সুরা, বাইজী বুলবুলের প্রতি আদিম আসক্তি এর পিছনে ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য দিকে এই অর্জিত অর্থ খাটাবার বা শিল্পে নিয়োগ করবার অনুকূল সুযোগ ও সামর্থ্যও সেদিন ছিল না। অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা মরতে পারে না। বিশেষত কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে অসংখ্য নতুন হঠাৎ-জমিদারে দেশ ছেয়ে গেল। এই ছোট-বড়ো জমিদারেরা সকলেই ইংরেজের সৃষ্ট। নন্দকুমার ও নবকৃষ্ণ, 'মহারাজ' উপাধি পেয়েছিলেন, জমিদারি কিনেছিলেন কিন্তু তাঁরা উভয়েই ছিলেন কোম্পানির কর্মচারী ও লাটদের 'বেনিয়ান্'। এই নবকৃষ্ণই ছিলেন কবি, আখড়াই, পক্ষীর দলের গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

আন্দুল রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামচরণ ছিলেন গভর্নর ভ্যানসিটার্টের বেনিয়ান। জোড়াসাকোর শান্তিরাম সিংহ (কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ) দেওয়ান ছিলেন। এবং ফেয়ার্লি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন রামদুলাল। নবরঙ্গ কুলপতি দুর্গাচরণ মিত্র ১৭৫৫—৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ান কোম্পানির দেওয়ান পদে কাজ করতেন। শেঠ, বসাক ও শীলেরা দালালি করতেন, স্বাধীন ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন ১৯টি এজেন্সি হাউসের নাম ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দেই পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ক্রমশঃ নতুন এজেন্সী হাউসের সংখ্যা বেড়েছে। বিদেশী ও দেশী অর্থনীতির মিশ্রণে ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে বিশেষত কলিকাতায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটে গেল। কিন্তু তবুও গদ্যের আশানুরূপ বিকাশ লাভ ঘটে নি। তার প্রধান কারণ ভিন্নভাষী শাসক, মুদ্রাযন্ত্রের অভাব এবং সে-যুগের বাঙালীর মনের দারিদ্র্য। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারী চর্লস্ উইলকিনস্ এবং বাঙালী কর্মকার পঞ্চাননের সহায়তায় বাংলা ধাতব হরফ তৈরী হয়। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেড-এর বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ব্যাকরণখানিতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির জন্যই

বাংলা হরফ তৈরীর প্রয়োজন ঘটেছিল। আখ্যাপত্রে হালহেড লিখেছেন : "ফিরাঙ্গীনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদংগ্রেজী।" অর্থাৎ ফিরিঙ্গীদের উপকারের জন্য এই ব্যাকরণ লেখা হল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে খ্রীস্টধর্ম বিষয়ক বহু গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে কেরী যখন ঐ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন তখনই প্রথম বাঙালী পণ্ডিত-মুনশীর হাতে বাংলা গদ্যের বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিল। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানো যদিচ এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তবুও সেই প্রয়োজনের পথেই বাংলা গদ্য নিজে পা বাড়িয়ে চলা শুরু করল। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রায় স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করতে আসেন। ১৮১৫-তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাইরে বাংলা গদ্যের, মননশীল গদ্যের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এই গদ্যের রীতি ও ঠাট সম্পূর্ণভাবেই সংস্কৃত নৈয়ায়িক রীতির। রামমোহন যে-সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ লড়াই শুরু করেন তার পক্ষে এই রীতিই স্বাভাবিক ছিল। 'সহমরণ' গ্রন্থের নিবর্তক-প্রবর্তকের পূর্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষ স্থাপন পণ্ডিতীরীতির সাক্ষ্য। বাংলা ব্যাকরণের বই রামমোহন লিখেছিলেন তার নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। হালহেডের ব্যাকরণ, কেরির ব্যাকরণ, জে. কীথের 'বঙ্গভাষার ব্যাকরণ' প্রকাশিত হবার পর রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা যতদিন পদ্যবন্ধের বাহন ছিল ততদিন ব্যাকরণ বা অভিধানের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু যখনি মুদ্রিত গদ্যের বিকাশ ঘটল, পাঠ্যপুস্তকের ও মননচর্চার বাহন গদ্য হল, ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হল তখনই ব্যাকরণ, অভিধানের প্রয়োজন অনিবার্য হল। একথা সত্য যে মুখ্যতঃ কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের

বাংলা গদ্যরীতির ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত করাবার প্রয়োজনেই উইলিয়ম কেরী বাংলা অভিধান সংকলন করিয়েছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের অনুরাগী ব্রহ্মসভার আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে 'বঙ্গভাষাভিধান' প্রকাশিত করেছিলেন তার পিছনে ছিল রামমোহন রায়ের জাতীয় ভাবমূলক অনুপ্রেরণা। ১৮১৮-এ পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত 'অমরকোষ'-কে অকারাদি ক্রমে সাজিয়ে বাংলা ভাষায় তার অর্থ প্রকাশ করে 'শব্দসিন্ধু' নামে বাঙালীদের ব্যবহারোপযোগী অভিধান বার করেন। বিদ্যাবাগীশ এবং পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় উভয়ের সংকলিত অভিধান রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'-য় কিনতে পাওয়া যেত।

দেখা যাচ্ছে মৌলিক ও অনূদিত গদ্যগ্রন্থ, শাস্ত্র ও দর্শন-আলোচনাত্মক গ্রন্থ, বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশিত হতে শুরু করেছে কিন্তু তবুও গদ্যে উৎসাহজনক চলৎশক্তি ঘটছিল না। সেই চলৎশক্তি এলো ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরের 'সমাচারদর্পণ' ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র আত্মপ্রকাশের পর থেকে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বৎসরাধিক কাল চলে বন্ধ হয়ে যায়। 'সমাচার দর্পণ' দীর্ঘকাল চলেছিল। এই পত্রিকা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "সমাচার দর্পণ যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদ পত্র ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশী ও বিলাতী সংবাদ, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রের সার সংকলন, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা প্রভৃতি জ্ঞাতব্যতথ্যে উহা পূর্ণ থাকিত এবং মিশনরী পরিচালিত হইলেও উহাতে পরধর্মের কুৎসা অথবা খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা স্থান পাইতই না বলিলে অন্যায় হয়না।"

এই ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (মাসিক, ত্রৈমাসিক ও সাপ্তাহিক) প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮১৮-এ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা 'দিগ্দর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

১৮১৮-র পূর্বে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু কয়েকখানি ইংরাজি সংবাদপত্র বার হয়েছিল। সেগুলি বাঙালী পরিচালিত নয়, বাঙালীর জাতীয়জীবনের সঙ্গেও তাদের যোগ ছিল না। কিন্তু সেগুলি সমকালীন দেশের ও কলকাতার সমাজের বহু তথ্যের আকর। ক্যালকাটা গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, ক্যালকাটা জর্নাল, বেঙ্গল হেরাল্ড, এশিয়াটিক জর্নাল প্রভৃতি পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে দিগদর্শনের কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু ঐ মাসিক পত্র দ্বারা কাম্য উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় সাপ্তাহিক 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান সম্পাদক ছিলেন নামে, সম্পাদনার প্রকৃত ভার ছিল পণ্ডিতদের হাতে। সমাচারদর্পণের প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার। তাঁর পর পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চারবৎসর সমাচারদর্পণ সম্পাদনায় সহায়তা করেছিলেন। জয়গোপাল তর্কালংকারের আমলে সমাচার-দর্পণের ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যায় 'বাবুর উপাখ্যান' প্রথম যখন বার হল তখনি আধুনিক কথাসাহিত্যের বীজ রোপিত হল বললে অনৈতিহাসিক হয় না। 'বাবুর উপাখ্যান' রচনাটির শেষ অংশ বার হয়েছিল ১৮২১ এর ৯ই জুনের সংখ্যায়। সাময়িক পত্র, গদ্য, সামাজিক ব্যঙ্গ ও বস্তুধর্মিতার সমন্বয়ে কথা-সাহিত্যের যাত্রা শুরু হল। এই রচনাটির রচয়িতার নাম সঠিকভাবে জানা যায় না—তবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি প্রমথনাথ শর্মা নামে 'নববাবুবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়' লিখেছিলেন—এই 'বাবুর উপাখ্যান' সম্ভবত তাঁরই রচনা। 'বাবুর উপাখ্যান' বিদ্রূপাত্মক নকশা, এই ধারার পরিণতি 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম পেঁচার নকশা' ও বঙ্কিমরচিত 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'-এ। ভবানীচরণ সাংবাদিক ছিলেন, 'সমাচার-চন্দ্রিকা'-র সম্পাদক হিসেবেই তিনি নাম করেছিলেন। অশিক্ষিত, উচ্ছৃংখল হঠাৎ-ধনী 'দেওয়ান'-পুত্রদের অর্থাৎ তথাকথিত 'বাবু'দের বাস্তব

আলেখ্য তিনিই প্রথম অঙ্কিত করেন। কিছু কিছু অংশ উৎকলন করে দেওয়া হল :

"...দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাংক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয়না অতএব কৃত্রিম-অকৃত্রিম আফিম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিকটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম করাইলেন। ...ঘুড়ী তুড়ী জস দান। আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন। এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥ অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। বাবু ঘুড়ী, বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখাপড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না।... ব্রাহ্মণ্ভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত নহে ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রধারা ও ধার্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখিনা। অতঃপর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ কর্ত্তা বলে কেহ ২ বাবু কহে...বাবুর পিতা বহুকালে বহুশ্রমে কিঞ্চিৎ ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন বাবু সেই ধন হাজার ২ টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এতাবিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোক মানেনা ও দশজন প্রতিপালন হয়না। ইহা সর্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কর্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু চাকরি করিবেন ইহাতে কতকগুলি বিদেশস্থ কর্মচ্যুত বিষয়াকাংক্ষী উম্মেদওয়ার লোক

বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না জবাবও দেননা ববং যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম উপস্থিত হইযাছিল। তোমাব কতকদিন না আইসাতে সে কর্ম অন্যের হইযাছে। এই প্রকারে বাবু কালক্ষেপ করেন· বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিযম ইত্যাদি সকলি শিখা হইযাছে এবং তদ যায়ী কর্মও সকল করা হইযাছে এইক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব সাহেব লোকের ধাবা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়িতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিযা বেড়ান। বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিযা রাখেন তোপের পূর্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইযা দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইযা বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিযা শয়ন করিয়াছেন তাহাব পর চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইযা যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইযাছে এইক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য পথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভালো চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিযা পিঠ হইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িযা হাতে মুখে ছাই মাখিযা সহীসের কান্ধে হাত দিযা বাটী আইলেন সাহেবলোক রবিবার ২ গির্জায় গিযা থাকেন অন্যবারে বিষয়কর্ম করেন। বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিযা রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেডীর গান কখন শকের যাত্রা খেউড় গীত শুনিযা থাকেন।" ইত্যাদি

এই হল নতুন যুগের কথাসাহিত্যের গোড়ার কথা। এটি গদ্যে রচিত, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। এর উপজীব্য বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নয়, সমকালীন বাঙালী হঠাৎ-ধনী দেওয়ান ও দেওয়ান-পুত্র তিলকচন্দ্রের জীবনচিত্র। এর মধ্যে কল্পনা বা রোমান্স নেই এ হল তথাকথিত বাঙালী নাগরিক সমাজের এক-অংশের বস্তুনিষ্ঠ নকশা বা sketch। এই নকশা আঁকা হয়েছে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সুস্পষ্ট

উদ্দেশ্য নিয়ে। 'নববাবুবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়'—বইগুলি এই বিদ্রূপাত্মক ধারাকে বহন করে চলেছে। 'সমাচারদর্পণ'-এ দুই কিস্তিতে 'বাবুর উপাখ্যান' বার হয়েছিল। এর সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগের ইংরেজি সাময়িকপত্র ও গদ্যসাহিত্যের আংশিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'নববাবুবিলাস' ১৮২৩-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ (১৮৫৬) লিখেছিলেন—"যে সময়ে তাহা (আলোচ্য বই) প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হৃতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত।" বইখানির প্রশংসা করে পাদরী লং সাহেব ১৮৫৫-এ লিখেছিলেন—"One of the ablest satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago." নববাবুবিলাস বইখানি চার ভাগে বিভক্ত: অঙ্কুর, পল্লব, কুসুম ও ফলখণ্ড। অধ্যায়গুলির তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে 'নববাবুবিলাস'কে কেন 'বাবুর উপাখ্যান'-এর পরিণতিরূপ ও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পূর্বরূপ বলা হয়। অঙ্কুর খণ্ডের বর্ণিত বিষয়—গুরুমহাশয়ের বৃত্তান্ত, গুরুমহাশয়ের নিকট বাবুদিগের বিদ্যাভ্যাসরীতি, কর্তার নিকটে বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয়, খোসামুদের বৃত্তান্ত, মুন্সী বৃত্তান্ত, স্কুল মেস্টরের বৃত্তান্ত। পল্লব খণ্ডের বর্ণিত বিষয়—উপদেশারম্ভ, লুচ্চবৃত্তান্ত, তৃতীয় উপদেশ, চতুর্থ উপদেশ। কুসুম খণ্ডের বর্ণিত বিষয়—দ্রব্যাদির বিবরণ, সহচারিণী রূপবর্ণনা। ফল খণ্ডের বর্ণিত বিষয়—বাবুর সতীর বিলাপ, বাবুর খেদ বর্ণন, জ্ঞানোপদেশ।

'বাবু'-দের 'স্যাটায়ার'ধর্মী এই বইখানিতে ('বাবুরূপ বৃক্ষের পল্লব অংশে) জনৈক তোষামুদে ও উপদেস্টার উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

> "শুন বাবু টাকা থাকিলেই বাবু হয়না ইহার সকল ধারা আছে আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি রাজা গুরুদাস, রাজা

> ইন্দুনাথ রাজা লোকনাথ তনুবাবু রামহরিবাবু বেণীমাধব বাবু প্রভৃতি ইহাদিগের মজলিস শিক্ষাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইযাছি···বাবুজী বাবুর লক্ষণ শ্রবণ কর। অথ উপদেশারম্ভ। মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান। আড়িঘুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥ অতএব তুমি যেরূপে এ লক্ষণাস্ত হও তাহা বলি॥"

ভবানীচরণের রচনা সাংবাদিকসুলভ ও বিদ্রূপাত্মক। তাঁর এই রচনাগুলিতে নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, ফলও দেখা দিয়েছিল। তাঁর জীবনচরিতকার লিখেছেন: "তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য-পদ্য রচনায় প্রথমত নববাবুবিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফল ও তদ্দারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃস্টে কুকার্য পরিহার করিয়া সৎ পথাবলম্বন করেন।"

'নববাবুবিলাস'-এ যে 'বাবু' সমাজকে চিত্রিত করা হয়েছে তার সঙ্গে হিন্দুকলেজ, ডিরোজিও, ইয়ংবেঙ্গল-এর কোনও সম্পর্ক নেই। রামমোহন হিন্দুকলেজ, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলদের যুগ বাংলাদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। এ-যুগের নেতৃত্ব করেছেন রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও, হেয়ার।

'বাবুর উপাখ্যান' বা 'নববাবুবিলাস' কিংবা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ যাদের কথা বলা হয়েছে তারা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের কেউ নয়। অর্ধশিক্ষিত ধনীসন্তানদের কথাই এই বইগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। শুধু 'সমাচারদর্পণ'-এ নয়, 'সম্বাদ কৌমুদী' (প্রথম প্রকাশ ১৮২১) পত্রের ৫ম সংখ্যায় 'বাবু'দের একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। ১৮২২ সনের ৩১শে জানুয়ারি তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নাল'-এ লেখা হয়েছিল—"A very entertaining account of a certain class of Baboos, who are known by the denomination of captains;···" অর্থাৎ 'কাপ্তেন'দের ব্যঙ্গচিত্র। এইভাবে সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই

নকশাধর্মী বাংলা কথাসাহিত্যের গোড়াপত্তন হলো। এই সময়ে অসংখ্য প্রেস গড়ে উঠতে লাগল কলিকাতায় ও আশে-পাশে। পত্রিকাগুলির নিজেদের প্রেস ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সমাচারদর্পণ, সমাচারচন্দ্রিকা, বাঙ্গাল গেজেটি, সম্বাদতিমিরনাশক, বঙ্গদূত প্রভৃতি প্রেসের নাম উল্লেখ করা যায়। তারপর কলিকাতার সব অঞ্চলে ব্যক্তিগত ব্যবসা হিসেবে অসংখ্য প্রেস দেখা দিতে থাকে। আরপুলিতে হরচন্দ্র রায়ের প্রেস, রামমোহন রায়ের ইউনিটারিয়ান প্রেস, শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বহু প্রেস হয়েছে, সেখানে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজির অনুবাদ গ্রন্থ ছাপা হচ্ছে, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র প্রচারিত হচ্ছে। বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা না বাড়লে মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্র বিস্তারলাভ করে না। শিক্ষা সম্পর্কে বলা দরকার সামান্য ইংরেজি-জানা লোক তখনকার দিনে বেশ দু-পয়সা অর্জন করত। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি জানলে অর্থোপার্জন বেশি হবে বলে কত কষ্ট করেছিলেন।

১৮১৭-এর ২০শে জানুয়ারি হিন্দুস্কুল খোলা হয়। এই স্কুলই পরে উন্নত হয়ে হিন্দুকলেজে পরিণত হয়। এ-সময়ে স্কুল সোসাইটি কলিকাতায় বালক ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য দুটি স্কুল স্থাপিত করেছিলেন। ১৮২২-এ রামমোহন রায়ের স্কুল ১৮২৩-এ পটলডাঙ্গার ইংরেজী স্কুল, ১৮৩০-এ ডফসাহেবের স্কুল প্রভৃতি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২১-এ শ্রীরামপুর কলেজ, ১৮২৪-এ সংস্কৃতকলেজ, ১৮৩৬-এ হুগলীকলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রসার হতে থাকে। ১৮৩৪-এ মেকলে বাংলাদেশে আসেন, ১৮৩৫ থেকে তাঁর চেষ্টায় ফার্সির বদলে ইংরেজী ভাষা ভারতে শিক্ষার অবশ্যস্বীকার্য বাহন হল। এর পূর্বে ১৮২৩-এ রামমোহন রায় লিখেছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে পাশ্চাত্যের 'Mathematics, Natural Philo-

sophy, Chemistry, Anatomy and other useful Sciences' ভারতবাসীকে শিক্ষাদানের জন্য। এই ১৮৩৫-এ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয়। এই ১৮৩৫-এ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লর্ড মেটকাফের মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দান। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা হইলেই বঙ্গদেশে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। নূতন নূতন সংবাদপত্র সকল দেখা দিতে লাগিল ও নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতার ভাব সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা ও কার্যে এক নূতন তেজস্বিতা প্রবিষ্ট করিল; এবং সর্বপ্রকার উন্নতিকর কার্যের উৎসাহ যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল।"

দেশের স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টাও এই সময় দেখা দিয়েছিল। স্কুল সোসাইটি কলিকাতায় বালিকাদের জন্য একটি স্কুল করেছিলেন একথা বলা হয়েছে। ১৮৪৯-এর ৭ই মে বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। এর কিছুদিন পরে রাধাকান্ত দেব তাঁর বাড়িতে একটি মেয়েদের পাঠশালা খোলেন সেখানে "সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গালা উভয় ভাষায়" শিক্ষাদান করতেন। তবুও রক্ষণশীল দলের মতিলাল শীল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অবধি অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার কল্যাণকামী ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার গতি রুদ্ধ হয়নি। ১৮২৭ সালের ২৮শে জুলাই তারিখের 'সমাচারচন্দ্রিকা'-য় প্রকাশিত একটি খবরে লেখা হয়েছে: "এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৪০০ প্রতিদিন হাজির হইয়া পাঠশালায় পাঠ করিতেছে।"

স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম শুভাকাংক্ষী ও উদ্যোগী কর্মী প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪ ৮৩) (এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'রামারঞ্জিকা' বইয়ের কথা মনে পড়বে) তাঁর সুহৃদ রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশ করেন। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে।'

এই 'মাসিক পত্রিকা' পত্রিকায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ থেকে।

হিন্দু কলেজে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়গুলি পড়ানো হত। হিন্দু কলেজে ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। (১৮১৯-এ ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭০, ১৮২৫-এ ১১০, ১৮২৬-এ ২২৩, ১৮২৭-এ ৩০০, ১৮২৮-এ ৪৩৩, ১৮২৯-এ ৪২১ এবং ১৮৩০-এ ৪০৯।) কাজেই কলিকাতার ও সন্নিহিত অঞ্চলে ধনী ও সঙ্গতিপন্ন পরিবারের ছেলেরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নবযুগের সমাজ রচনায় ও সাহিত্যসৃষ্টিতে অগ্রসর হবে—এই বিষয় ঐতিহাসিক সূত্রসম্মত। এই ১৮৩০-এ ডফ সাহেব আসেন কিন্তু তখনও তাঁর কার্যক্রম ঠিক শুরু হয়নি, তখনও রামমোহনের মৃত্যু হয়নি, 'হিন্দু থিয়েটার' হয়নি, 'সংবাদপ্রভাকর' প্রকাশিত হয়নি, বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত আসেননি। কিন্তু সে-সময়ই শিক্ষিত সাধারণের দেশীয় ভাষায় রচিত সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ কেমন ব্যাপক হয়েছিল সেটা জানতে পারি 'সমাচারদর্পণে'র ১৮৩০-এর ৩০শে জানুয়ারি তারিখের একটি বিবৃতি থেকে :

> "আমরা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎকাগজ প্রকাশক মহাশয়ের পূর্বাপেক্ষা ক্রমশঃ দূর দূর দেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেদের পূবাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।"

কাজেই Reading public-এর পরিধি ক্রমবর্ধিত হচ্ছিল এ-বিষয়ে সংশয় নেই। এই নতুন পড়ুয়া-সাধারণ মৈমনসিংহ গীতিকা বা কবিকঙ্কন চণ্ডী পড়ে আর তৃপ্ত হচ্ছিল না।

নাগরিক সমাজের এবং জাতীয় বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, মুদ্রিত পুস্তিকা ও পড়ুয়া-সাধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার আপেক্ষিক প্রসার এগুলি ঘটল। কিন্তু এই যুগের প্রধান কথা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ,

মানবতাবিরোধী প্রাচীন সংস্কার, ধারণার বর্জন, যুক্তিবাদ বরণ এবং প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের ও সাহিত্যের নবমূল্যায়ন। এরই নাম (অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে হলেও) বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ক্ষেত্রে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও, রিচার্ডসন, হোরেস হেমান উইলসন প্রভৃতির নামও উল্লেখ করা উচিত। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যেরা গণতান্ত্রিক মানবপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তারা টমাস পেইন-এর Age of Reason এবং Rights of Man পড়তেন। হিউম, লক্‌ এর যুক্তিবাদী দর্শনের ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম পর্ব যুক্তিবাদের ও গদ্যের যুগ, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের যুগ নয়। অনেকটা ইংলণ্ডের রেসটোরেশন যুগের সাহিত্যের মত। ঐ যুগের সাহিত্যে ফরাসীপ্রভাব পড়েছিল, তার ফলে হল 'to emphasise cold reasoning rather than romantic fancy'. উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যে হৃদয়ভাব, গীতিপ্রবণতা ও রসকল্পনার পরিবর্তে তার স্থান অধিকার করল মননশীলতা, জ্ঞানৈষণা, সংস্কার প্রচেষ্টা, ব্যঙ্গপ্রিয়তা, সমসাময়িকতা ও গদ্যের সর্বাত্মক প্রভাব। রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির দার্শনিক, মননশীল, ঐতিহাসিক যুক্তিবাদী রচনা নবজাগ্রত বাঙালীর জ্ঞানৈষণার অভিজ্ঞানবহ। যে যুগ উপনিষদ অনুবাদের, সহমরণ ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব বিচারের, কৃষ্ণের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা অনুবাদের, পুরাবৃত্তানুসন্ধানের যুগ।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের যুগ, 'Romantic Imagination'-এর যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের (১৮৬৫) পূর্বে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) এবং কর্মদেবী (১৮৬২) প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য কাব্য ও নাটকগুলি এবং হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু' কাব্যও বার হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পৃথক ধরনের শিল্প বা Art-form হলেও

যে-রোমান্টিক কল্পনার অবকাশ শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তমুকুরে ধরা পড়ছিল সেই রোমান্টিক কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মূর্ত হল। পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অনুশীলন ও স্বীকরণ ভিন্ন নব-যুগের এই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব ছিল না। 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উল্লেখযোগ্য রচনা সন্দেহ নেই কিন্তু এগুলি রচিত না হলেও জগৎসিংহের অশ্বের শৈলেশ্বরের মন্দিরে আবির্ভাবে বিলম্ব ঘটত না। কেননা কাব্যে, নাটকে যেখানে পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যের সৌন্দর্য-স্বপ্ন ও ভাবকল্পনা রূপান্বিত হয়েছে সেখানে দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব একান্ত স্বাভাবিক। 'আলালের ঘরের দুলাল' নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হলেও এর মধ্যে সমকালীন শহর-গঞ্জের, ইস্কুল-আদালতের, পারিবারিক, সামাজিক উৎসব পার্বনের, সংবাদপত্রের রিপোর্ট-এর মত তথাগত ছবি আছে। তাই আলালের ঘরের দুলাল নক্শাধর্মী রচনা—উপন্যাস নয়। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ মৌলিকতা কম, কন্টর-এর অনুসরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের শিক্ষিত পড়ুয়া-গোষ্ঠী অর্থাৎ নতুন যুগের পাঠক সমাজ আর 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' 'কাদম্বরী' বা 'রাসেলাস' কিংবা 'আলালের ঘরের দুলাল' অথবা 'কামিনীকুমার' পড়ে তৃপ্তি পায়নি। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন :

> "বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লা মজনুর হাঁতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?"

—কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮—৯৪) সাহিত্যিক-জীবন ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত বিস্তৃত। কেননা রাজসিংহ উপন্যাসের বর্ধিত সংস্করণ

("পুনঃ প্রণীত") ১৮৯৩-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম তিনখানি উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী-তে স্কট প্রবর্তিত 'ঐতিহাসিক রোমান্স'-এর ধারাবহন। এই মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অগৌরবের কিছু নেই। বালজাক, পুশকিন, দুমা, হুগো, তলস্তয় সকলেই স্কটের কাছে ঋণী। এই প্রসঙ্গে মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্যটি উৎকলনযোগ্য :

> "বঙ্কিমবাবু · ইংরাজী উপন্যাস লেখকের মধ্যে স্কট নামা একজন শ্রেষ্ঠতমকে আদর্শ স্বীকার করিয়া পরপর তিনখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, অধিকন্তু যে কেহ ঐ তিনখানি গ্রন্থপাঠ করিয়াছেন তেঁহ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাহার রচনা চাতুর্যের ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।"

প্রথম তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যধর্মী রোমান্স। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনী' ঐতিহাসিক রোমানস। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-র প্রথম সংস্করণে তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস', পরে সেটি প্রত্যাহার করেন। মৃণালিনীও প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে পরিচিত হয়েছিল 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে। পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিশেষণ বর্জন করেন। তিনি পরবর্তীকালে 'রাজসিংহ'-কে তাঁর একমাত্র 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা দিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'-র 'রোমান্স রস' এতদিন বাঙালী পাঠকের কাছে অনাস্বাদিত ছিল। মোগল-পাঠান সংঘাতের যুগের পটভূমিকায় দুর্গেশনন্দিনা রচিত হয়েছে। এর ঐতিহাসিক দিক নিয়ে ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন— এখানে সে আলোচনা অবান্তর হবে। তবে একথা মানতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে স্কটের মত গল্পবলার ক্ষমতা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেননি। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে নায়িকাদের রূপ ও দেহবর্ণনায়, বিমলা-বীরেন্দ্র সাক্ষাতে এবং কতলুখাঁ-র প্রমোদ-বিহার বিবরণে ভারতচন্দ্রীয় তথা অবক্ষয় যুগের সংস্কৃতকাব্যীয় আদিরসাশ্রিত বহু উপাদান বঙ্কিম বজায় রেখেছিলেন। আশমানী-দিগগজ-এর

দীর্ঘ সংবাদে সকল রুচিশীলতার গণ্ডি অতিক্রম করে সস্তা ভাঁড়ামিকেও স্থান দিয়েছিলেন এবং অকারণ দীর্ঘ রূপবর্ণনায় সংস্কৃত আলংকারিকদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের পক্ষে অন্য উপায় ছিল না। ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্য, ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য এবং জয়দেব-ভারতচন্দ্র ধারার গীতিপ্রধান বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই তিন ধারাই গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছিল। মধুসূদন দত্ত-ও এই ত্রিধারাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে এ-সব বিচ্যুতি বহুলাংশে দূর হলেও 'দুর্গেশনন্দিনী' উঁচুদরের লেখা হতে পারেনি। রোমান্স-এর চরিত্র 'বাস্তব' হয় না কিন্তু 'probable' বিশ্বাস্য অর্থাৎ সম্ভাব্যগুণান্বিত হবে। দুর্গেশনন্দিনীর 'বিমলা' চরিত্র সেদিক থেকে সবচেয়ে অসার্থক। স্কটের উপন্যাস 'marvellous and uncommon incidents'-এর প্রয়োগ বেশি হওয়ায় জ্যোতিষ, স্বপ্ন, ছায়াদর্শন প্রভৃতি অলৌকিক উপাদানও এসে গেছে। ওয়েভরলি, ওল্ড মরটালিটি, গাই ম্যানারিং, ব্রাইড অব ল্যামারমুর পড়লেই একথা স্পস্ট হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম উপন্যাসেই জ্যোতিষ, ভবিষ্যদ্‌বাণী, 'স্বামী' গুরুদের এনেছেন। তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এ এই মনোভাবেরই পরিণতি। বঙ্কিমের উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার রূপান্তর বহুলাংশে সাধিত হয়েছে অলৌকিক ঘটনা, স্বপ্ন ও জ্যোতিষ গণনার মারফতে। এর ফলে উপন্যাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এসব ত্রুটি থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-র মাধ্যমে প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'ঐতিহাসিক রোমান্সে'র স্বাদ আমাদের পান করিয়েছেন। উপন্যাসের কথাবস্তু, চরিত্র, বর্ণনা ও সংলাপ—যাকে সেন্‌টসবেরি উপন্যাসের চতুরঙ্গ বলে নির্দেশ করেছেন সেই চতুরঙ্গ এখানে মোটামুটিভাবে একটি সমন্বয় লাভ করেছে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ সাজিয়ে, পাঠকমনে কৌতূহল ও সংশয় জাগিয়ে, ঘটনা ও চরিত্রের নাটকীয় রূপান্তর বিচিত্র পথে ঘটিয়ে আখ্যানের উপসংহার রচনায় শিল্প-কৌশল তিনি বহুলাংশে দুর্গেশনন্দিনীতে

দেখিয়েছেন। 'সংলাপ' উপন্যাসের প্রাণশক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। নরনারীর মনোচিত্রণে এই সংলাপ-অংশ দুর্গেশনন্দিনীতে কোন-কোন জায়গায় বেশ ভালো হয়েছে। কিন্তু প্রথম সংস্করণের জড়ানো ভাষা পরবর্তী সংস্করণে সহজতর করবার ও রুচিশীল করবার প্রয়াস সত্ত্বেও দুর্গেশনন্দিনীর 'সিরিয়াস' অংশের ভাষা গতিশীল হতে পারেনি।

'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র তথা অনবদ্য কাব্যধর্মী রোমান্স। ইতিহাসের যে-ঘটনাবলী দুর্গেশনন্দিনীর পক্ষে অপরিহার্য ছিল, কপালকুণ্ডলায় তা নয়। একদিকে রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা অপরদিকে গ্রীক নিয়তিবাদ (Fatalism) 'কপাল-কুণ্ডলা'-য় প্রাধান্য পেয়েছে। চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদের পূর্বের একটি 'বর্জিত' পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র জে. এস. মিল থেকে দু'ধরনের Fatalism-এর উল্লেখ করে লিখেছেন :

> কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না, গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।' ইহার উত্তর, 'অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে।"

'কপালকুণ্ডলা' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী হিসাবে দুর্গেশনন্দিনীর স্রষ্টার চেয়ে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'পাঠভেদ' অংশ আলোচনা করলে দেখা যায় বঙ্কিম পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত মন্তব্য, অবান্তর বিবরণ, আপ্তবাক্য প্রভৃতি অনেক বর্জন করেছেন, ফলে কপালকুণ্ডলা শ্রীময়ী হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'কপালকুণ্ডলা'-র প্রথম সংস্করণে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের কবল থেকে পালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত করবার কারণস্বরূপ বলেছিলেন :

> "স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ না করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না, তাহা তুমি জান না। আমিও তন্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি। মা জগদম্বা জগতের মাতা। ইনি সতীর সতীত্ব সতী প্রধানা।...তুমি পলায়ন করিলে কদাপি কৃতঘ্ন হইবে না। কেবল এ পর্যন্ত সিদ্ধির সময় উপস্থিত হয়

নাই বলিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। আজি তুমি যে কার্য করিয়াছ—
তাহাতে প্রাণেরও আশঙ্কা।" ইত্যাদি।

পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম সংক্ষেপে লেখেন :

"এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।"

—এই পরিবর্তন বঙ্কিমের শুধু রুচির নয় শিল্পকুশলী মনেরই সাক্ষ্যবহ। বঙ্কিমচন্দ্র সংলাপ ও সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতধর্মী বর্ণনায় নরনারীর হৃদয়োদ্ঘাটনে যে কতদূর শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় মতিবিবি-নবকুমারের সাক্ষাৎ বর্ণনায় :

"ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন, "মহাশয় বাগবৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন, আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায় ?"

নবকুমার কহিলেন, আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোনও উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না ?'

নবকুমার কহিলেন, "নবকুমার শর্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।"

কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ 'রোমান্তিক' চরিত্র করেই গড়েছিলেন কিন্তু শেষের দিকে অতিপ্রাকৃত উপাদান—স্বপ্ন, কালামূর্তি দর্শন, পরার্থে প্রাণদানে ভৈরবী ভবানীর আদেশ, শ্মশান প্রভৃতির অত্যধিক সমাবেশ ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর ট্রাজেডিকে লঘু ও শিল্পকে খর্ব করেছেন। যে-বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরভাবে কপালকুণ্ডলার জীবনের ট্রাজেডিকে বিশ্লেষণ করেছেন :

"কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানস-লোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেম না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথরোধ করিবেন ?"

—সেই বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা-র অন্তর্দৃষ্টিতে সহসা ভৈরবীর অলৌকিক মূর্তি না আনলেই সার্থক শিল্পী হতেন। নবকুমার ব্যর্থ সৃষ্টি হলেও অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছে মতিবিবি। মতিবিবি রোমান্সের চরিত্র নয় —ঠিক 'নভেলের' চরিত্র। কপালকুণ্ডলা কল্পনার, মতিবিবি বাস্তবের। বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির মনের দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের রূপান্তর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে নির্দেশ করেছেন। কপালকুণ্ডলার গঠনও প্রশংসার্হ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি অনিবার্য 'organic unity' লাভ করেছে।

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসে দুর্গেশনন্দিনী-র তুলনায় বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বোধ ও দেশপ্রেম সচেতনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার নবজাগরণের সহিত এই দুটি চেতনা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বঙ্কিম চিরদিনই ইতিহাসপাঠে আগ্রহী। 'মৃণালিনী'-র ঐতিহাসিক পটভূমি বঙ্কিমচন্দ্রের তথা বাঙালীর চিরকালের বেদনার কুরুক্ষেত্র। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে, এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা' (বিবিধ প্রবন্ধ), 'একটি গীত' (কমলাকান্তের দপ্তর) প্রভৃতি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। তাই মিনহাজউদ্দীন-এর 'তবকাৎ-ঈ-নাসিরি' প্রদত্ত তথ্যকে তিনি গ্রহণ করলেও স্বীকার করতে পারেননি।

'মৃণালিনী' রচনার যুগে ১৮৬৭ তে 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা, হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' (১৮৬৯) রচনা, রাজনারায়ণ বসুর 'স্বাদেশিকদের সভা' স্থাপন (১৮৬৫), নবগোপাল মিত্রের পরিচালনায় 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশ—উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন—মৃণালিনী, আনন্দমঠ, সীতারাম বা রাজসিংহ তার পর্যায়ভেদ। ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কতদূর নিষ্ঠাবান ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, 'মৃণালিনী'-র প্রথম দুই সংস্করণে যেখানে 'বঙ্গ' ও 'যবন' লিখেছিলেন, পরবর্তী সংস্করণে সেখানে 'গৌড়' ও 'তুরক' বসিয়ে দেন। 'মৃণালিনী'-র প্রথম সংস্করণে (প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত) প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে স্কটের ধরনে

'ঐতিহাসিক রোমান্স'-এর পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে হেমচন্দ্র-মাধবাচার্য-মৃণালিনী সংবাদকে উপস্থাপিত করেছেন। এর ফল ভালো হয়নি। 'মৃণালিনী'-তে তুর্কি বিজয়ের যুগের পরিমণ্ডল সর্বাংশে রক্ষিত হয়নি। মৃণালিনী-গিরিজায়া অংশ দেবীচৌধুরাণীর যুগে এমন কি বিষবৃক্ষের যুগেও যেন বসানো চলত। দ্বাদশ শতকের একবারে শেষে ও ত্রয়োদশ শতকের সূচনার বাতাবরণে বৈষ্ণবপদাবলী গান 'ঔচিত্য' ভঙ্গ করেছে। মৃণালিনীকেও পদাবলীর রাধিকার মতই গড়া হয়েছে। মাধবাচার্যের হাতের পুতুলের মত হেমচন্দ্র ব্যক্তিত্বহীন। দিগ্বিজয়-গিরিজায়া, আশমানী বিদ্যাদিগ্‌গজের নবরূপ মাত্র।

একমাত্র পশুপতি মনোরমা চরিত্র দুটি এ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় সৃষ্টি। কিন্তু 'মনোরমা' চরিত্র কখন রহস্যময়ী, কখনও বা বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী হলেও—একটি পরিপূর্ণ বিশ্বাস্য (convincing) নারীচরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি আর তার জীবন-কাহিনীর সঙ্গে বঙ্কিম জ্যোতিষীদের গণনাজাত অকালবৈধব্যের প্রশ্ন জড়িত করেছেন। পরবর্তী কালের সীতারাম উপন্যাসে এই একই পন্থা অবলম্বিত হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম 'মনোরমা'-কে স্বামী পশুপতির চিতাশয্যায় সহমরণে প্রাণ বিসর্জন করিয়েছেন। বিমলার মত প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষিণীরূপে গড়েননি। পশুপতি চরিত্র চিত্রণ বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

ঐতিহাসিক রোমান্স বা উপন্যাসে বর্ণিত পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের ঘটনা ও নরনারীকে আলোচ্যযুগের spirit ও form-এ উন্নীত করতে হয়। ঐতিহাসিক কল্পনা বা historical imagination বঙ্কিমের ছিল কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে এ বিষয়ে সার্থক হতে পারেননি। হেমচন্দ্রের স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা নেই, একক প্রচেষ্টামাত্র। আর সে প্রচেষ্টার চালকশক্তি সংগঠন নয়, মাধবাচার্যের জ্যোতিষ-গণনা, পশ্চিম দেশ থেকে কেউ এসে যবন-শাসন দূর করবে। চিন্তার

এই অসম্পূর্ণতা (Immaturity) পরবর্তীকালের আনন্দমঠ, সীতারাম ও রাজসিংহে দূর হয়েছে।

এই তিনখানি উপন্যাসের আশ্রয় যদিচ ইতিহাসাশ্রিত অতীত—কিন্তু নবজাগরণের যুগের বঙ্কিমচন্দ্র নারী-ব্যক্তিত্বকে এই উপন্যাসগুলির মধ্যে রূপায়িত করেছেন। বস্তুত বিমলা-আয়েষা, কপালকুণ্ডলা মতিবিবি এবং মনোরমা চরিত্রে নবযুগের নারীলক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। এই নারীলক্ষণ অষ্টাদশ শতকে বা সংস্কৃত সাহিত্যে বা মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যাবে না। নারী সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি রেনেসাঁসের অন্যতম অভিজ্ঞান। বঙ্কিমের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ববিরোধ থাকলেও তিনি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নারীচরিত্র সৃষ্টি করলেন তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি। ঈষৎ পূর্বে মধুসূদনের রচিত মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যে তার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। আবার 'মৃণালিনী'র হেমচন্দ্রের কথাও বঙ্কিমচন্দ্রের, যে-বঙ্কিম এবার বিষবৃক্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন :

> "তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও।—"

১৮৭২-এর এপ্রিল-এ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্য-পত্রিকা বার করেন। এতদিন পর্যন্ত বঙ্কিমের রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় সকলের কাছে তাঁর লেখা পৌঁছত না। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হওয়ায় সেই বেড়া ভেঙে গেল। অন্তঃপুরেও 'বঙ্গদর্শন' স্থান পেতে লাগল—আর এই 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হল নতুন 'নভেল'—'বিষবৃক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ তার 'ছেলেবেলা'-য় লিখেছেন :

> "তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে; সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মত আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল কী হবে, দেশশুদ্ধ সবার এই ভাবনা।
>
> বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না।…আপন

মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুণ (কাদম্বরী দেবী) ভালোবাসতেন।"

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন :

"বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।...বিষবৃক্ষ কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"

'বিষবৃক্ষ' বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম শিল্পসম্মত মনস্তত্ত্বমূলক 'নভেল'। আমাদের পরিচিত জগত ও সমাজের বাস্তব নরনারীর আবর্তময় বহির্ ও অন্তরজীবনের বিশ্লেষণধর্মী আলেখ্যই নভেল বা উপন্যাস। তাই আর সুদূর ইতিহাসের কল্পনাশ্রিত ছায়াপট নয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের গোবিন্দপুর গ্রাম। জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র, তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা, মনোরমা নয়—নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কুন্দ, সূর্যমুখী ও হীরা। মোগল বিজয় বা তুর্কি বিজয় নয়—সমকালীন বিধবা-বিবাহ সমস্যা। (১৮৫৬-এ বিধবাবিবাহ বিল পাশ হয়।)

এতদিন যে-রোমান্টিক কল্পনা ইতিহাসাশ্রয়ী ছিল—এবার সেই শিল্পী-কল্পনার অ-পূর্ব আলো আমাদের পরিচিত জগতে পড়ল, ফলে "আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী-কমলমণিরূপে দেখিলাম।" আরও একটি ক্ষেত্রে পূর্বসীমা থেকে বঙ্কিম এগিয়ে এলেন। বিষবৃক্ষের পূর্বে 'নিয়তি'র খেলাই মানব-ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কপালকুণ্ডলা রচনাকালে তিনি স্টুয়ার্ট মিল নির্দেশিত Asiatic Fatalism ও Modified Fatalism-এর উল্লেখ করেন। Asiatic Fatalism বলতে গ্রীক নিয়তিবাদ বোঝায়—যে অপ্রতিরোধ্য শক্তির খেলায় মানুষের নিজ প্রবৃত্তি ও কর্মের কোনও দায়িত্ব নেই। কিন্তু 'modified fatalism' মানুষের নিজ প্রবৃত্তি ও কর্মের সঙ্গে

যুক্ত—"Our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character." (মিল)। বঙ্কিমচন্দ্র মিল নির্দেশিত পথে এবার নগেন্দ্রনাথের জীবনে 'নিয়তি'-কে দেখালেন 'রূপতৃষ্ণা'-রূপে। গোবিন্দলাল এ তারই অনুবৃত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু 'নভেল' রচনায় 'উদ্দেশ্য' (mission) হীনভাবে অবতীর্ণ হলেননা। 'বিষবৃক্ষ' নামকরণেই তার প্রমাণ আছে। শিল্পী (artist) এবং সমাজনীতিরক্ষক (moralist) বঙ্কিমের দ্বন্দ্ব এখানে লক্ষণীয়। তাই দেখি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে তারাচরণের বিবাহ, দেবেন্দ্রের সহিত কুন্দের আলাপ, তিন বছর পরে তারাচরণের মৃত্যু ও কুন্দের বৈধব্য মাত্র একটি পরিচ্ছেদেই শেষ করেছেন। আর তার শেষে লিখেছেন :

> "এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।"

তারপর কুড়িটি পরিচ্ছেদ জুড়ে আখ্যান স্বাভাবিক পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহের পর সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ বর্ণনা করে হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের পরিচিতি দিলেন 'বিষবৃক্ষ কি ?' এবং তার ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন :

> "যে বিষবৃক্ষের বীজবপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা সকলেরই গৃহ প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ, ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।"

এবং কুন্দনন্দিনীর বিষপানে মৃত্যু ও হীরার উন্মাদিনী হবার পর বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যান শেষ করে লিখলেন :

> "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ায় তিনি ত্রুটিমুক্ত হতে পারেন নি। 'বিষবৃক্ষ'-এর শিল্পের দিক থেকে আরও বড় ত্রুটি অলৌকিক ঘটনার প্রয়োগ দ্বারা লৌকিক জগতের জীবনসমস্যা ও ঘটনা-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা। 'রোমান্স'-এ যা মানায় 'নভেলে'-এ তার স্থান হয় না এমন কথা বলা অসঙ্গত। কিন্তু 'বিশ্বাস্য' বা convincing ঘটনার পরিবর্তে অলৌকিক ঘটনা বিন্যাস নিন্দার্হ হবেই। দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমার স্বপ্ন সুবিন্যস্ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে শিল্পের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি কুন্দনন্দিনীকে তার মৃতা মাতার দুবার স্বপ্নপ্রদর্শন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ-এ স্বপ্নে আকাশে নগেন্দ্রনাথ ও হীরার মূর্তি প্রদর্শন ও সাবধানবাণী উচ্চারণ বাস্তবতার বিরোধী। আর একটি ত্রুটি কুন্দের ক্ষেত্রে। কুন্দ সেকালের হিন্দুঘরের বালিকা, শাস্ত্র ও লোকাচার অনুযায়ী তারাচরণের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে, তিন বৎসর বিবাহিত জীবনযাপন করেছে। কিন্তু বৈধব্য পালন ও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার —এই দুয়ের মধ্যে একবারও দ্বন্দ্ব দেখা দিল না? কুন্দ চরিত্রের এই ফাঁকটুকু রাখা শিল্পরীতির দিক থেকে ঈষৎ ত্রুটি বলেও গণ্য হবে। ঘটনার দিক থেকেও কুন্দের পলায়ন, সূর্যমুখীর পলায়ন দুই-ই বিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম করেছে।

কিন্তু বিষবৃক্ষের নরনারী কেউ 'টাইপ' নয় সকলেই 'individual' অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যক্তি। তাই দেবেন্দ্র বা হীরা ঠিক typical villain নয় বা conventional চরিত্রও নয়। 'হীরা'-র শিল্পসার্থকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "কেবল এইটুকু বলে রাখি, বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না। সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে। সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ বলে, সুপ্রত্যক্ষ বলে।"

নারী-হৃদয়ের স্বাধীন প্রণয়কামনা এর পূর্বে রচিত রোমান্স-এ বঙ্কিম প্রকাশ করেছিলেন, এবার তাকে 'নভেলে' রূপ দিলেন।

শুধু প্রণয়কামনা নয়, নগেন্দ্রনাথের প্রেমহীন অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চাবুক হেনে কুন্দ মৃত্যুবরণ করেছে :

> "কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, 'তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ ?'
>
> নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, 'কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই।"

শিল্পীর মানবিক সহানুভূতি এবং সংস্কারকের নির্মম নীতির দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে খণ্ডিত।

বিষবৃক্ষের পর বঙ্কিম 'ইন্দিরা' লেখেন। তখন ইন্দিরা একটি গল্পমাত্র। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নয়, কোনও seriousness নিয়ে নয়—একটু হালকা রসের গল্প পরিবেষণের উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এটি লিখেছিলেন। বোধ করি সেজন্যই তিনি 'ইন্দিরা'র আখ্যাপত্রের বিপরীত দিকে শেলির 'Rarely, rarely, comest thou, Spirit of Delight!' অংশটি উৎকলিত করেছেন। ইন্দিরার প্রচলিত সংস্করণ ১৮৯৩-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রচনা। তরল গল্প-রসই ইন্দিরার মুখ্য রস। 'ইন্দিরা'-র সম্পর্কে শ্রীসুকুমার সেন ঠিকই লিখেছেন :

> —"ইন্দিরায় বঙ্কিম পুরাতন দেশীয় আদর্শের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুপরিচিত 'মন্মথকাব্য' প্রভৃতি আদিরসাল আখ্যায়িকার নায়িকার মত ইন্দিরাও হারানো স্বামীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং স্বামীকে হস্তগত করিবার জন্য যাবতীয় নারী-কলার প্রয়োগ করিয়াছে।"

—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ধারা এ-পর্যন্ত অনুসরণ করলে দেখা যায় বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'One man, Golden Age।' তিনি একাই বাংলা কথাসাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোনও সাহিত্যে একক-প্রয়াসে উপন্যাসে নব ঐতিহ্য সৃষ্টি ও সার্থক অবয়ব (structure) নির্মাণ এত অল্প সময়ে দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা—এই চারখানি উপন্যাসের বক্তব্য ও মর্মগত পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সেজন্য চারখানি উপন্যাসের অবয়বগত (structural) পার্থক্যও তিনি রক্ষা করেছেন—চারখানি উপন্যাসের ভাষাও বিশিষ্টরূপে চতুর্মুখী। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এসেছিলেন তখন গদ্যে আমাদের যুক্তি ও বিচারের, সমসাময়িক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বা ব্রহ্মোপাসনার ভাষা দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সাধু প্রচেস্টা সত্ত্বেও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের, রস-কল্পনার, হৃদয়-বেদনার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রকে গড়ে নিতে হয়েছিল।

'ইন্দিরা'র পর বঙ্কিম আবার রোমান্স-এ ফিরে গেলেন, লিখলেন 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)। 'বঙ্গদর্শন' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি পরিচ্ছেদ বর্জন করেন। প্রথম সংস্করণে ষষ্ঠ খণ্ডে একটি পরিশিষ্ট ছিল। সেই অংশে মীরকাশিমের শেষ জীবন, গুরগণ খাঁকে হত্যা, জগৎ শেঠদের গঙ্গায় ডুবিয়ে মারার উল্লেখ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মীরকাশেমের উপর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। তাই এই 'বর্জিত' পরিশিষ্ট অংশ লিখেছিলেন :

> "বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যনষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন, বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।"

এ-অংশ রাখলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী সংস্করণে মীরকাশেম-কাহিনী অপেক্ষা শৈবলিনী-প্রতাপ আখ্যানকে সর্বপ্রধান করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেজন্য প্রতাপের প্রতি রমানন্দের

প্রশস্তি বাক্যেই সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। ১৮৮৩ ও ১৮৮৯-এ যথাক্রমে এই উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র মানবিক শিল্পধর্ম থেকে ক্রমশ নীতিধর্মে সরে গেছেন। 'চন্দ্রশেখর'-এর তৃতীয় সংস্করণে বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন নাম পাই—প্রথম সংস্করণে ছিল না। তৃতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনামা দিয়েছেন "পাপীয়সী"—এই নির্দেশ প্রথম সংস্করণে ছিল না। এই "পাপীয়সী" বলা বাহুল্য শৈবলিনী। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খণ্ডের ও তৃতীয় খণ্ডের 'শিরোনামা' দিয়েছেন যথাক্রমে পাপ" ও "পুণ্যের স্পর্শ"। বঙ্কিমের শিল্পধর্ম অপেক্ষা নীতিধর্ম যে প্রবলতর হয়েছে ১৮৮৩-এর সংস্করণ তার দৃষ্টান্ত।

চন্দ্রশেখরের গল্পাংশে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা চন্দ্রশেখরের যৌগিক চিকিৎসার আতিশয্য কম হলে উপন্যাসটি চমৎকার দাঁড়াত। পূর্বে যে রোমান্সগুলি বঙ্কিম লিখেছিলেন, সেগুলি তাঁর সময় থেকে অনেক দূরের কালের। দুর্গেশনন্দিনীতে মোগল-বিজয়, মৃণালিনীতে তুর্কি-বিজয় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রশেখরের পটভূমি ইংরেজ-বিজয়। বঙ্কিমচন্দ্র আমিয়ট, গলস্টন, জনসন, ফস্টর, তাদের সিপাহীদের, কুঠিয়াল সাহেবদের যে ছবি এঁকেছেন—সে-ছবি ঐতিহাসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সত্য ও পরিপূর্ণ জীবন্ত। মীরকাশেম, গুরগণ খাঁ, জগৎ শেঠও সার্থক সৃষ্টি। একদিকে জাতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক দুর্যোগের ঘনঘটা অপরদিকে সেই দুর্যোগ চন্দ্রশেখর-প্রতাপের পারিবারিক জীবনের শান্তিকেও বিমথিত করেছে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে উভয়ের মধ্যে এই সংযোগ ঘটেনি। এখানে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের অন্যতম সার্থকতা।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যেন প্রথম তার কাম্য 'আদর্শ' বা Ideal বাঙালী আঁকলেন। এর সদৃশ চরিত্র সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্যে বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে এই 'Ideal' চরিত্র কিন্তু সাহিত্যের 'বাস্তবতা' অর্জন করেনি :

"বঙ্কিমবাবু…যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর'-এ তার নীতি-আদর্শকে বড়ো করে দেখাতে গিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে লিখলেন :

"তাঁহার (প্রতাপের) চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।"

কিন্তু তবুও শৈবলিনীর মুখে মানবস্বীকৃতির 'শিল্পী' বঙ্কিম যে দীপ্ত বাক্য বলিয়েছিলেন তার সামনে 'নীতিরক্ষক' বঙ্কিম তাঁর 'আদর্শ' প্রতাপের মতই পলায়ন করেছেন :

"তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাশক্তি ও নাটকীয় উপস্থাপনা বহুগুণ উন্নত হয়েছে, ভাষায় যে 'ব্যঞ্জনা'-শক্তি একমাত্র উচ্চস্তরের শিল্পীতেই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে তার প্রকাশ ঘটেছে :

সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবন হিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্মরিত হইতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল "কুল্‌সম্"।

আর একটি কথা। দলনী ও গুরগণ পরবর্তীকালে 'সীতারাম'-এ রমা ও গঙ্গারামে-র মধ্যে দেখা দিয়েছে কি?

চন্দ্রশেখরের পর রচিত হয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল', বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ 'নভেল'। 'বিষবৃক্ষ'-এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অনেক উন্নত সৃষ্টি। 'বিষবৃক্ষ' বাস্তবধর্মী ও

মনস্তত্ত্বমূলক নভেল হলেও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শনের মত অলৌকিক ঘটনা তাকে শ্রীভ্রষ্ট করেছে। আখ্যানের জটিলতায়, দুরবগাহ চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনার সর্পিল গতিতে এবং সর্বোপরি বিস্ময়কর মনোবিশ্লেষণে, স্বপ্ন, জ্যোতিষ প্রভৃতি অলৌকিক উপাদান বর্জনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লোকোত্তর সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এ যে উপন্যাস লিখেছিলেন প্রথম সংস্করণে তার সামান্য সংশোধন করেন, দ্বিতীয় সংস্করণে 'রোহিণী' চরিত্র বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়—বঙ্কিমের শিল্পীমনের সহানুভূতি তার মধ্যে লক্ষণীয়। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯২) রোহিণীর চেয়ে গোবিন্দলালের কথাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে চিন্তান্বিত করেছিল। শেষ-পর্বের বঙ্কিমের পক্ষে গোবিন্দলালের সন্ন্যাস, তীর্থভ্রমণ, প্রায়শ্চিত্ত, ভগবানে আত্মসমর্পণে শান্তি-সন্ধানের বিধানদান তাঁর শিল্পী মনের চেয়ে 'ধার্মিক' মনের পরিচয়ই বেশি দেয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই লিখেছেন :

> "প্রথম বয়সে বঙ্কিম বাবু যে সকল নভেল লিখিতেন তাহাতে তিনি দেখিতেন গল্পটি সাজান হইল কিরূপে। এককথায় তিনি কাব্যাংশের দিকেই দেখিতেন, আর কিছু দেখিতেন না। তাহার পর তাঁহার মাথায় ঢুকিল কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের কথা বলিতে হইবে।... এক কথায় ধর্মপ্রচার করিতে হইবে।"

'রোহিণী' চরিত্র পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী ও শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী-তে রূপান্তরিত হয়েছে। রোহিণীর বিরুদ্ধে যাই বলুন রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে কাশীবাসিনী ও শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে বিকৃতমস্তিষ্কা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি। ১৩০৭-এ (১৯০০) প্রথম বিনোদিনীর খসড়া করেন রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৯-এ (১৯০২) 'চোখের বালি' গ্রন্থাকারে বার হয়। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'-এ (১৯১৭) সাবিত্রীকে idealize করা হলেও কিরণময়ী-কে রোহিণীর থেকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। শুধু 'রোহিণী' চরিত্র নয় রবীন্দ্রনাথ

সচেতনভাবে গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী, গোবিন্দলাল-রোহিণীর গৃহত্যাগ, প্রবাসগমন, সবই মহেন্দ্র, আশা, বিনোদিনী, মহেন্দ্রের ব্যক্তিত্বহীনতা, রূপতৃষ্ণা, বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের গৃহত্যাগ ও প্রবাস-যাপন-এ অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া 'চোখের বালি'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন :

> "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"

বাংলা উপন্যাসে 'আঁতের কথা বের করে দেখানো'-র প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর-এর চেয়ে তার পূর্ণতর রূপ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ দেখা দিয়েছে। রোহিণী ও গোবিন্দলালের নিজেদের অন্তরের দ্বন্দ্ব বঙ্কিম 'সুমতি-কুমতি'-র মাধ্যমে নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পিতামহ ভীষ্মের তূণ থেকেই সব্যসাচী অর্জুন শর সংগ্রহ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রণাঙ্গনে প্রবেশের শক্তি-সঞ্চয় করেছিলেন —বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল তার কাছে উজ্জ্বল ঐতিহ্যরূপে বরণীয় হয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে দ্বিতীয় সংস্করণে 'রোহিণী' চরিত্র নতুন করে রচনা করবার সময়ে উপন্যাসের প্রথমাংশে শিল্পী বঙ্কিমের যে পরিচয় ফুটে উঠছিল শেষাংশে সে বঙ্কিম প্রস্থান করেছেন। ১৮৮২-তে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এই সংস্করণ প্রকাশিত হবার কয়েক বছর পর (১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্র একখানি চিঠিতে লেখেন :

> "কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেকমাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে আমাকে কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই

ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।"

—এ অসঙ্গতি আছে। শেষাংশে রচনা দুর্বল ও অতি নাটকীয়, অংশ বিশেষে হাস্যকর। দুর্বলতার যৌথ নিদর্শন।

তবুও একথা স্বীকার্য যে সেক্সপীয়রের ট্রাজেডিগুলির মত 'chance' এবং 'accident' (tragic error) 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ সুপ্রযুক্ত হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ চরিত্র-সৃষ্টির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়েছেন। বিশেষত ভ্রমর চরিত্র। 'ভ্রমর' চরিত্রে সূর্যমুখীর আত্মসমর্পণ নেই—ভ্রমর সূর্যমুখীর তুলনায় ব্যক্তিত্বের তেজে উজ্জ্বলতর। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের চরিত্রাঙ্কণে নতুন ও যথার্থ 'মডার্ন' দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন :

> "তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও —একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে…"

এবং

> "যামিনী বুঝিল না যে, গোবিন্দলাল হত্যাকারী ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।"

রক্ষণশীল দলের সমালোচকেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য নিন্দা করেছিলেন।

জনৈক সমালোচক ঔপন্যাসিকদের 'অভিজ্ঞতা' (experience) আলোচনা প্রসঙ্গে 'wide' ও 'deep' এই দুটি পর্যায়ভেদ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই দুয়ের সমন্বয় দেখি—'কৃষ্ণকান্তের উইল' তার সেরা দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হবে। শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা 'wide' ছিল, 'deep' ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী রচনা 'রজনী' উপন্যাসখানির একমাত্র বৈশিষ্ট্য তার নতুন টেক্‌নিক। পরবর্তী কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এই রীতির জয়যাত্রা। আনন্দমঠ (১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্রের ভিন্ন প্রকৃতির উপন্যাস। দেবী-চৌধুরাণী ও সীতারাম এই ধারার রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক

পরিহাস, ঐতিহাসিক রোমান্‌স্‌-এর জগত থেকে হঠাৎ অতি-লৌকিক-গার্হস্থ্য সমাজের একেবারে তলায় এসে পৌঁছেচে। ভবানী পাঠকের এতদিনের শিক্ষা-দীক্ষা ব্রজেশ্বর-দর্শনেই দেবীচৌধুরাণীর লুপ্ত হয়েছে এবং তারই পরিণতি গ্রন্থশেষে 'নূতনবৌ'-এর বাসনমাজা। দেবীচৌধুরাণী-র মধ্যে ব্রজেশ্বরপ্রাণা প্রফুল্ল চিরদিনই বেঁচে ছিল, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম সেদিকটি দেখিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নবজাগরণের যুগের প্রতিনিধি হয়েও কৌলীন্য প্রথা বা বহুবিবাহের নিন্দা করলেন না—পাশ্চাত্য হিতবাদ ও গীতার নিষ্কাম কর্মের মনগড়া মিশ্রণ ঘটিয়ে নারীজীবনের সার্থকতা নির্দেশ করলেন। 'দেবী-চৌধুরাণী' বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব প্রচারের 'একটা কল' হতে পারে, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে সার্থকতার বহু সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যর্থ সৃষ্টি। ইতিহাসের ভবানী পাঠক ইংরেজের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক ভবানী পাঠককে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করালেন ও দ্বীপান্তরে পাঠালেন (যদিও তখন দ্বীপান্তর ছিল না)। তার কারণ ভবানী পাঠক 'অধর্ম' করেছেন তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রয়োজন।—এখানেও বঙ্কিম স্ববিরোধী।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙালী' সম্পর্কে যুগপৎ অবজ্ঞা ও অহংকার ছিল। তিনি যে-বাঙালীর কল্পনা করেছিলেন, আবির্ভাব কামনা করেছিলেন তারা প্রতাপ রায়, জীবানন্দ, ভবানী পাঠক আর বাস্তবে দেখেছিলেন হরবল্লভ, গঙ্গারাম। এই Ideal ও Real-এর সমাবেশ বঙ্কিম সাহিত্যে লক্ষণীয়।

'সীতারাম' (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতপক্ষে শেষ উপন্যাস। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বেও ১৮৯৩-এ 'ইন্দিরা'-র পরিবর্ধিত সংস্করণ, "রাজসিংহ"-এর "পুনঃপ্রণীত" সংস্করণ সাক্ষ্য দেয় যে বঙ্কিম হৃত-বল হননি। কাজেই 'সীতারাম' রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার শক্তি অস্তমিত হয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা ঠিক বলেন না। "রাজসিংহ"-এর 'পুনঃপ্রণীত' সংস্করণ শিল্পী বঙ্কিমের সবলতার নিদর্শন, দুর্বলতার নয়।

'সীতারাম' উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী অপেক্ষা উপভোগ্য। আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীর পটভূমি পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অরাজক অবস্থা। 'সীতারাম'-এর পটভূমি মোগল সাম্রাজ্যের শেষঅবস্থায় সপ্তদশশতকের শেষপাদের দক্ষিণবাংলা। ঐতিহাসিক কল্পনার আশ্চর্য উৎকর্ষ সীতারামের রাজ্যকালীন যুগের নর-নারী ও সমাজ বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে। মৃণালিনী থেকে আনন্দমঠ অবধি যে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বঙ্কিম দেখেছিলেন 'সীতারাম'এ তার বাস্তব প্রতিষ্ঠা, আবার 'সীতারাম'-এ তার বিসর্জন। এ বিসর্জনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মুঘল রাজশক্তিকে দায়ী করেননি, করেছেন সীতারামের 'ধর্ম'ত্যাগ, ও পাপাচারকে। 'সীতারাম'-এ বঙ্কিমচন্দ্র গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় থেকে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। আসক্তি থেকে কাম, ক্রোধ, সম্মোহ, বুদ্ধিভ্রংশ ও মৃত্যু ঘটে। সীতারামের চরিত্রে গীতার এই বিধান অক্ষরে অক্ষরে দেখানো হয়েছে। কিন্তু তবু 'সীতারাম' উপন্যাসে তত্ত্ব বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারেনি। সীতারামের গল্পাংশ মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হলেও অশ্বের মতই ছুটে চলেছে। 'চরিত্র' সৃষ্টির দিক থেকে অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব—'typical characters under typical circumstances'। সেযুগের ফকির, কাজী, কামার, ভাণ্ডারী, মুরলা দাসী, কসাই,—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত—সেইরূপ চিত্রিত হয়েছে। চন্দ্রচূড় ও চাঁদশাহ ফকির প্রকৃত 'জীবন্ত' চরিত্র। গঙ্গারাম চরিত্র villain চরিত্র হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাকে type করেননি—'individual'-এর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। নারী-চরিত্রের মধ্যে নন্দা-রমা চরিত্র দুটি দুই কোটির। নন্দা মহিষী-র উপযুক্ত, রমা যেন খেলার পুতুল। কিন্তু এই খেলার পুতুলেও বঙ্কিমচন্দ্র দীপ্ত তেজ সঞ্চার করেছেন—গঙ্গারামের বিচার দৃশ্যে। শ্রী চরিত্র-ই 'সীতারাম' উপন্যাসের সমস্যা। জ্যোতিষের ভবিষ্যৎফল শ্রী ও সীতারামকে মিলিত হতে দিল না—এখানেই উপন্যাসের ট্রাজেডি। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির দিক

থেকে শ্রী চরিত্র সবচেয়ে দুর্বল সৃষ্টি। 'সীতারাম' চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সংস্করণের সীতারাম চরিত্রের সংস্কার সাধনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। সীতারাম উপন্যাসে প্রথম সংস্করণে ছিল :

"শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল : অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্তা বলিলেন, "তুমি কে ?"

শ্রী বলিল "আমি শ্রী।"

"শ্রী। তুমি তবে কি আমাকে চেন না ? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, আনন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন "তুমি শ্রী।" শুনিয়া শ্রী কাঁদিয়া উঠিল।

—পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন :

"তুমি শ্রী। এত সুন্দরী।"

শ্রী বলিল 'আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্য নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষেত্রে 'এত সুন্দরী'—সীতারামের মুখে বসিয়ে চরিত্রের গৌরব কমিয়ে দিয়েছেন। সীতারামের চিত্তে গোবিন্দলালের মত অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা ছিলনা। সীতারামের শ্রীর প্রতি আকর্ষণ তার অবয়বগত রূপের জন্য নয়—শ্রীর শত্রুনিধনে তেজোদীপ্ত মূর্তির জন্য :

"যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দিনী অঞ্চল সঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন ' সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমময়ী সিংহবাহিনী মূর্তি পূজা করিতে লাগিলেন।'

—একে কি ঠিক রূপতৃষ্ণা বলা যায় ?

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা 'সীতারাম'-এ স্তিমিত হয়নি বরং জ্বলে উঠেছে। তিনি গঙ্গারামের প্রথম ও দ্বিতীয় বিচার এবং জয়ন্তীর লাঞ্ছনার দৃশ্য যে 'canvas' ও 'details' দৃষ্টিশক্তি বলে রচনা করেছেন

তার তুলনা খুব বেশি নেই। জয়ন্তীর লাঞ্ছনার একমাত্র তুলনা মহাকবি ব্যাসের মহাভারতে দ্রৌপদীর কৌরব সভায় লাঞ্ছনার দৃশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে 'সীতারাম' উপন্যাসের শেষ 'দেবীচৌধুরাণী'-র ধরনে গড়েছিলেন—

"এখন, যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুইজনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।"

দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশ বর্জিত হয়। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে 'সীতারাম'-এর স্রষ্টা শিল্পী হিসাবে 'দেবীচৌধুরাণী'-র রচয়িতার চেয়ে বড়ো।

"রাজসিংহ"-এর পুনঃপ্রণীত চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯৩) বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। তার মতে :

"এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।"

এউক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের বিনয়। 'রাজসিংহ' উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যবান সৃষ্টি। 'রাজসিংহ' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের থেকে অপেক্ষাকৃত পৃথক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাজসিংহ, ঔরঙ্গজীব, জেবউন্নিসা, উদীপুরী, আকবর প্রভৃতি 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তিকে সম্মুখপটে নিয়ে এসেছেন। স্কটের মত পশ্চাদ্‌পটে রাখেননি। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর সত্যটি ঠিকই ব্যক্ত করেছেন :

"মূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা, উদিপুরী ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেমন আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

ইতিহাস-স্বীকৃত তথ্য ও উচ্চকোটির শিল্পীকল্পনার মিলনে রাজসিংহ সার্থক। বঙ্কিম এখানে গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ, পাশ্চাত্য হিতবাদ ও 'অনুশীলন'-এর তত্ত্বলোক থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পীর ধর্মে ফিরে এসেছেন। 'জেবউন্নিসা-দরিয়া মবারক' এবং 'নির্মলকুমারী-মাণিকলাল' উপাখ্যান দুটি 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাঠামোকে দুর্বল করেনি। বলশালী পক্ষীর দুটি পাখার মত এই উপাখ্যান দুটি উপন্যাসের সৌন্দর্য ও গতির সঞ্চারক। বিশেষত জেবউন্নিসা-র চরিত্র-সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতাব চরম শিখরে আরোহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভাষা' ব্যবহারেও যে ক্রমশঃ প্রগতিশীল রীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠছিলেন জীবনসায়াহ্নে রচিত নিম্নোদ্ধৃত অংশে তার পরিচয় সুস্পষ্ট :

> 'আমি যদিও ইতিপূর্বে সম্বোধনে "ভগবন" "প্রভো" "স্বামিন" "রাজকুমারী" "পিতঃ" প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাংলা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি "তথা" এবং "তথা" উভয় রূপত ব্যবহার করিয়াছি। "সসৈন্যে" এবং "সসৈন্য" দুই-ই লিখিয়াছি—একটু অর্থ প্রভেদে। কিন্তু "গোপিনী" "সশরীরে উপস্থিত" এরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি।'

—এ ক্ষেত্রেও বঙ্কিম 'আধুনিক'।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঔপন্যাসিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন তাঁর শিষ্যরূপে সিভিলিয়ন রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দেন। ১৯০৫-এর ২৩শে অগস্ট তারিখের 'Wednesday Review' পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর একটি রচনায় পাই :

> "অনেকের কাছে বিস্ময়ের হলেও একথা সত্য যে সেক্সপীয়র ও স্কটের রচনায় আমি প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলাম, বাংলা সাহিত্যের রসোপভোগ করেছি তার পরে। কেননা চল্লিশ বছর আগে বাংলা সাহিত্য—বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আদৃত হত না।"

বাংলা রচনার পথে তাঁকে আশ্বাস দেন ও চালিত করেন

বঙ্কিমচন্দ্র। মধুসূদনের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দেন যে ইংরেজিতে লিখে কোনও লাভ নেই। রমেশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলি আমার মনে গভীর দাগ এঁকে দিল এবং তার ফলে দুবছর পরে আমার প্রথম বাংলা বই 'বঙ্গবিজেতা' ১৮৭৪-এ বার হল।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস মুখ্যত দুটি পর্যায়ভুক্ত: ঐতিহাসিক ও সামাজিক। তাঁর বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) ও মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) ঠিক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নয়। যে-অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র 'রাজসিংহ'-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন, সে অর্থে মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) ও রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯) খাঁটি 'ঐতিহাসিক' উপন্যাস। এই চারখানি উপন্যাস 'শতবর্ষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯-এ। আকবরের বঙ্গবিজয় থেকে শিবাজীর রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক কাল এই উপন্যাস চতুষ্টয়ে বিবৃত হয়েছে।

তাঁর দুখানি সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে রচিত।

রমেশচন্দ্র ইতিহাস ও স্কট উভয়েরই গভীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago. I spent days and nights over his novels, I almost lived in those historic scenes and in those mediaeval times which the enchanter had conjured up. Scott has in fact created a world of his own—a somewhat idealised, but a vivid and on the whole, faithful picture of the mediaeval world in Europe.
>
> I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for

> history or if my taste for history made me an admirer of Scott; but no subject, not even poetry had such a hold upon me as history. The first great work that fascinated me—it is thirtyfour years since I first read it—was Gibbon's 'Roman Empire'.

স্কট ও গিবন অধ্যয়নজাত প্রবণতা রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা। আর ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বঙ্কিমের উৎসাহ ও নির্দেশ। কিন্তু রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বঙ্গবিজেতা' যদিচ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র অনুসরণ—তবু 'বঙ্গবিজেতা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চকোটির রোমান্তিক কল্পন, ভাস্বর চরিত্রসৃষ্টি, কবিজনোচিত হৃদয়বোধ-এর কোনও পরিচয় নেই। আয়েষার অনুকরণে 'বিমলা' পরিকল্পিত হলেও কল্পনার যে সমুন্নতি 'আয়েষা'-য় দেখা যায় সেই প্রেম ও ত্যাগের উজ্জ্বল মূর্তি গঠনের ক্ষমতা রমেশচন্দ্রের ছিল না। Hero ও villain-এর conventional পন্থায় তিনি যাত্রা করেছেন ও পরিশেষে সকল প্রিয়-বিচ্ছেদের রূপকথাসুলভ মিলন ঘটিয়ে এবং পাপ ও পাপীর শাস্তি দেখিয়ে moral fable রচনা করেছেন। বঙ্কিমের ও স্কটের উপন্যাস থেকে পাওয়া সন্ন্যাসী, পাগলিনী, হাতদেখা, স্বপ্ন প্রভৃতি সবই তিনি বসিয়ে দিয়েছেন। 'বঙ্গবিজেতা' নামটিরও প্রকৃতপক্ষে কোনও মূল্য নেই। তাছাড়া ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে পারিবারিক জীবনও যুগোচিত হওয়া দরকার। 'বঙ্গবিজেতা'-র অমলা-সরলা সংবাদ গার্হস্থ্য উপন্যাসের যোগ্য, ঐতিহাসিক উপন্যাসের নয়। মুকুন্দরাম ও কৃত্তিবাসকে একআসরে বসিয়ে রমেশচন্দ্র ভুল করেছেন। রমেশচন্দ্র নিজের শক্তির চেয়ে অনুকরণের পর আস্থা রেখেছিলেন বেশি সেজন্যই বঙ্গবিজেতা কাঁচা লেখা। Local colour-এও অনেক ত্রুটি আছে।

এই ত্রুটি বহুলাংশে দূর হয়েছে পরবর্তী রচনা 'মাধবীকঙ্কণ'-এ (১৮৭৭)। 'বঙ্গবিজেতা' ১২৮১ সালের 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ

সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। মাধবীকঙ্কণ বই হিসাবে একবারে বার হয়। এই পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) অবধি উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে ইতিহাস আছে কিন্তু 'ঐতিহাসিক রস' পরিবেশন রমেশচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ঔরংজীব, সুজা, মোরাদ কাহিনী এই উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট অংশ কিন্তু এই অংশ নরেন্দ্র-হেমলতার কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়। নরেন্দ্র-হেমলতার কাহিনী পরিকল্পনার একদিকে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস অপরদিকে টেনিসন্ এর 'এনক আর্ডেন'। 'বঙ্গবিজেতা'-র সতীশচন্দ্র, বিমলা, 'মাধবীকঙ্কণ'-এ নবকুমার ও হেমলতা-য় রূপান্তরিত হয়েছে। কারাগারে জেলেখা কর্তৃক নরেন্দ্রের শুশ্রূষা ও মসরুর-এর ক্রোধের সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনী-র আয়েষা-র জগৎসিংহকে সেবা ও ওসমানের মনোভাব মনে করিয়ে দেয় বটে, কিন্তু আয়েষা ও ওসমান দক্ষশিল্পীর সৃষ্টি—সে শিল্পক্ষমতা রমেশচন্দ্রের ছিল না। শৈলেশ্বর ও নরেন্দ্রের যুদ্ধ, 'কপালকুণ্ডলা'-র কাপালিক ও নবকুমারের অনুকরণ। এ উপন্যাসেও হাতদেখা, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ-বাণী, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। কাহিনীর শেষে হেম ও নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ, মাধবীকঙ্কণের বিসর্জন—অনেকটা চন্দ্রশেখরের anti-thesis। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতাপ বা শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর বা মীরকাসেম চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেননি। সামাজিক পটভূমিকাকেও শাহ্-জাহানের যুগে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। গার্হস্থ্যধর্ম ও নীতিবাদ মাধবীকঙ্কণে পরিসমাপ্তি এনেছে। তাই হেমলতা নরেন্দ্রকে বলেছে :

> "জীবন থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না, চিরকাল সহোদরার ন্যায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অন্যরূপ প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ আমাকে দিয়াছিলে,—নরেন্দ্র আমি সে প্রণয়ের অধিকারিণী নহি।... ভাই নরেন! বাল্যকালে তুমি আমাকে ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলে, এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা দাও, এস ভাই আমরা প্রতিশ্রুত

হই, ধর্মপথ কখনও ত্যাগ করিব না; আমি জন্মে মরণে স্বামীর চিরদাসী থাকিব।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্বাধীনতার আদর্শের সহিত পরিচিত হবার ফলে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর রোমান্টিক দেশপ্রেম সাহিত্যে প্রকাশ লাভ করে। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে তার বহু পরিচয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র বীরেন্দ্রসিংহের তেজোদ্দীপ্ত উক্তিতে, 'মৃণালিনী'-র হেমচন্দ্রের প্রচেষ্টায়, 'চন্দ্রশেখর'-এ মীরকাসেমের কার্যকলাপে তার অপর দৃষ্টান্ত। 'রাজসিংহ' ক্ষুদ্র অবয়বে বঙ্গদর্শন-এ ১২৮৪ চৈত্র থেকে ১২৮৫ ভাদ্র অবধি প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরে রমেশচন্দ্রের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' প্রকাশিত হতে থাকে 'বান্ধব'-এ (১২৮৫ সালের ১ম সংখ্যা থেকে ১০ম সংখ্যা)। রমেশচন্দ্র 'রাজসিংহ' পড়ে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পথে এসেছিলেন এ সিদ্ধান্ত হয়ত অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু হিন্দুর যে-পরাধীনতার জন্য বঙ্কিম খেদ প্রকাশ করেছেন ও যে-অতীতের জন্য গর্ববোধ করেছেন রমেশচন্দ্র তার সহমর্মী। 'মাধবী কঙ্কণ'-এ নরেন্দ্রের উক্তিতে যে মর্মযন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে—সে যন্ত্রণা রমেশচন্দ্রের। এই যন্ত্রণা-ই তাকে 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' বা 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' রচনায় উদ্বুদ্ধ করাত—হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" রচিত না হলেও। 'চিতোর' অধ্যায়ে চারণের রাজপুতানার গৌরবময় অতীতের সঙ্গীত যখন ক্ষান্ত হল তখন নরেন্দ্র ভাবলেন :

"আজি ছয় শত বৎসর অবধি পরাক্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজপুতেরা স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, বঙ্গদেশে মুসলমান পদার্পণ না করিতে করিতে হিন্দুরাজ্যের নাম লুপ্ত হইল। জগতে তাহাদিগের নাম নাই, অথবা তাহাদিগের নাম কেবল ঘৃণার পদার্থ। হা বিধাত!" বলিয়া নরেন্দ্র ললাটে সজোরে করাঘাত করিলেন, ললাট হইতে রুধির ধারা বহিতে লাগিল। (১৮শ পরিচ্ছেদ)॥

রমেশচন্দ্র পরবর্তী উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' গ্রন্থে তাঁর উদ্দেশ্য খুলে বলেছেন :

> "পাঠক। একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।" (১ম পরিচ্ছেদ)

'জীবন প্রভাত' লেখার আগে, 'রাজসিংহ' প্রকাশের পূর্বেই তিনি মারাঠাদের ইতিহাস পাঠ করেন ও একখানি উপন্যাস রচনার সংকল্প করেন :

> "I read Grant Duff's inspiring work on the history of the Maharattas and spent my nights in dreaming over a story of Shivaji,"

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এর ইতিহাস অংশ সবই পরিচিত ইতিহাস গ্রন্থ থেকে গৃহীত। তার সঙ্গে চন্দ্ররাও লক্ষ্মী এবং রঘুনাথ-সরযূ কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের পশুপতি-মনোরমা ও হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনী দুটির অনুসরণ এখানে ঘটেছে। চন্দ্ররাও-এর পাপের শাস্তি ও লক্ষ্মীর সহমরণ, পশুপতি-মনোরমার কথা স্মরণ করায়। যদিও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে বঙ্কিমের কাছাকাছি রমেশচন্দ্র যেতে পারেন নি। শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহ-তিলোত্তমা সন্দর্শনের পথ ধরে তিনি ভবানী-মন্দিরে রঘুনাথের সরযূ দর্শন ঘটিয়েছেন। 'বঙ্গবিজেতা'-র ইন্দ্রনাথ-সরলা তার মধ্যে মিশেছে। রমেশচন্দ্র স্কটের Quentin Durward-উপন্যাসের নাম-চরিত্রের অনুকরণে রঘুনাথ হাবিলদারের চরিত্র এঁকেছেন। প্রকৃতপক্ষে অখ্যাত ব্যক্তির নিজশক্তিবলে সৌভাগ্যপথ কেটে তৈরী করার কাহিনী তিনি 'বঙ্গবিজেতা'র ইন্দ্রনাথ, 'জীবন প্রভাত'-এর রঘুনাথ, 'জীবনসন্ধ্যা'র তেজসিংহ চরিত্রে দেখিয়েছেন।

সেজন্যই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসৃষ্টিতে বৈচিত্র্য কম, রোমান্তিক কল্পনার প্রকাশ সংকুচিত।

ভি. এস. প্রিচেট তাঁর 'দি লিভিং নভেল' বই-এ স্কট সম্পর্কে লিখেছেন: 'The historical passion was the engine of his impulse.' রমেশচন্দ্র সম্পর্কেও সেকথা অনেকটা সত্য। কিন্তু ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ে এবং গল্পকথনের বিস্ময়কর কৌশলে স্কট যে-জগত রচনা করেছেন রমেশচন্দ্র তা পারেননি। স্কটের চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল- তিনি ঐ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'The bold life-like figures of Scott, hewn out of solid marble.' কিন্তু রমেশচন্দ্র তাঁর গুরুর যোগ্য শিষ্য হতে পারেননি। 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' সম্পর্কে রমেশচন্দ্র বলেছেন:

> "I remember the days when I travelled over Tippera... with Todd's spirited 'History of Rajasthan' and when I ventured to compose a story of Pratap Sinha."

রমেশচন্দ্র ১৮৭৮-এ সরকারী কার্যে ত্রিপুরায় ছিলেন। অতীত গৌরববাহী দেশপ্রেম ও ইতিহাসপ্রীতির যুগ্ম স্বাক্ষর 'জীবন-প্রভাত'। রাজপুত জাতির বংশগত বিরোধ, পারস্পরিক শত্রুতা, আহেরিয়া, মোগল আক্রমণ, রাণা প্রতাপের যুদ্ধ, হলদীঘাট, প্রতাপের আকবরের নিকট সন্ধিপত্র প্রেরণ, পৃথ্বীরাজের দৃপ্ত কবিতা, সবই জ্ঞাত ইতিহাসের অনুসরণ। তার সঙ্গে দুর্জয়সিংহ-তেজসিংহ কাহিনী গ্রথিত করা হয়েছে। আর তেজসিংহ-পুষ্প ও ভীলকন্যার প্রণয়কথা ইতিহাসের কঠিন সংঘাতময় পটে কোমল বর্ণচ্ছটা সঞ্চার করেছে। দুর্জয় সিংহের মধ্যে রমেশচন্দ্রের পূর্বসৃষ্ট সতীশচন্দ্র, নবকুমার, চন্দ্ররাও কিয়দংশে দেখা দিয়েছে এবং ইন্দ্রনাথ, রঘুনাথ মিলেছে তেজসিংহের মধ্যে। 'আহেরিয়া' অংশে অপরিচিত যুবক কর্তৃক দুর্জয় সিংহের প্রাণরক্ষা স্কটের Bride of Lammermoor থেকে নেওয়া। পুষ্পের মধ্যে 'বিমলা'র

পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবুও রমেশচন্দ্র 'জীবন সন্ধ্যা'য় রাজপুত জীবনের ও দুর্যোগময় যুগের ইতিহাসকে যথাশক্তি সঞ্জীবিত করতে পেরেছেন। তিনি রাজস্থানের চারণ সঙ্গীতে, পৃথ্বীরাজের পত্রে যথার্থ ঐতিহাসিক রূপ দান করেছেন। রমেশচন্দ্রের 'ঐতিহাসিক কল্পনা' দুর্বল ছিল না তবে সৃষ্টিক্ষম রোমান্টিক কল্পনাশক্তি তথা কবিপ্রাণতা কম থাকায় তিনি বঙ্কিম-পর্যায়ে উঠতে পারেননি। স্কটের উপন্যাসের মত যুদ্ধবর্ণনায় তার উৎসাহ ছিল এবং সেখানে তিনি বঙ্কিমকে পরাস্ত করেছেন। অপ্রধান চরিত্রসৃষ্টিতে রমেশচন্দ্রের দক্ষতার নিদর্শন 'জীবন প্রভাত'-এর রহমৎখাঁ এবং 'জীবন সন্ধ্যা'-য় রাণা প্রতাপের মহিষী চরিত্র।

মনস্তাত্ত্বিক সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাস হিসাবে তখন 'বিষবৃক্ষ' এবং পারিবারিক সমাজ-চিত্র রূপে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' খুব নাম করেছে। রমেশচন্দ্র সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। তাদের পরিবার সে-যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক। রমেশচন্দ্র তার সংসার (১৮৮৬) ও সমাজ (১৮৯৪) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে রচনা করেছেন। 'সংসার'-এ বিধবা বিবাহ ও 'সমাজ'-এ অসবর্ণ বিবাহ সমর্থিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহসিক প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ বিল (১৮৫৬) পাস হয়, পরে তার চেষ্টায় ও ব্রাহ্ম সমাজের (ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ) উৎসাহে কয়েকটি বিধবা বিবাহ ঘটলেও হিন্দু সমাজে এর প্রচলন মন্দগতি হয়।

রমেশচন্দ্র ১৮৯৪-এ ১০ই ফেব্রুয়ারি তার জামাতা জে. এন. গুপ্তকে লেখেন :

> "on principle inter-caste marriage is a duty with us because it unites the divided and enfeebled nation and we should establish this principle (as well as widow marriage) safely and securely in our little society, so

that the greater Hindu Society of which we are only a portion and the advanced guard may take heart and follow. I cannot tell you how deeply I have felt this for years past; of my two last novels 'Sansar' goes in for widow marriage and 'Samaj' of which the first few chapters have gone to 'Sahitya', goes in for inter-caste marriage."

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সামাজিক-সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল। (সেদিনকার আদি ব্রাহ্ম সমাজও বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহের তীব্র বিরোধী ছিলেন।) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর পত্রে লিখেছেন :

"আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

আর রমেশচন্দ্রের 'সংসার'-এ শরতের মায়ের কাছে তার গুরুদেব বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছেন :

'মা বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চক নহেন, তাহার কথাটি প্রকৃত। বিধবাবিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে।'

দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে প্রগতিশীল হলেও সৃষ্টিধর্মে রমেশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উচ্চাঙ্গের সমস্যামূলক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত কিন্তু রমেশচন্দ্রের 'সংসার' ও 'সমাজ' সেকালের সমাজ-চিত্র। সমাজ ও মানবজীবনের যে-দ্বন্দ্ব, নরনারীর অন্তর-রহস্যের যে-উদ্‌ঘাটন বিষবৃক্ষ বা পল্লীসমাজে আমাদের মুগ্ধ-ব্যথিত করে রমেশচন্দ্রের উপন্যাস দুখানিতে তার একান্ত অভাব। পল্লীর সমকালীন সমাজ-চিত্র হিসাবে মূল্য থাকলেও এই উপন্যাসের আখ্যান, চরিত্র ও সমস্যা কোনটিই 'complex' পর্যায়ে ওঠে নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তব উপন্যাস বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল-এর সমৃদ্ধ ধারা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কেউই বহন করতে পারেন নি। অন্যেরা তারকনাথ-রমেশচন্দ্রের বাস্তব উপন্যাসের ধারাই বহন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১)এর আলোচনা দরকার। 'স্বর্ণলতা'-র প্রথমার্ধ (সরলার মৃত্যু পর্যন্ত) 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা-য় ১৮৭৩-এ বার হয়। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৮৭৪। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' একবছর আগের। 'স্বর্ণলতা'-র আখ্যাপত্রে হোরেস-এর একটি পংক্তি মূল ও অনুবাদসহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে—'Fictions to please should wear the face of Truth'। এ থেকেই বোঝা যায় তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "ইংরাজী ধরনের প্রণয়লীলা, চোর ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন" প্রভৃতি এ-উপন্যাসে বর্জিত হয়েও বাঙালী পাঠকের আদরের সামগ্রী হয়েছে—এ কম গৌরবের কথা নয়। ইন্দ্রনাথের কটাক্ষের লক্ষ্য অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। বিষবৃক্ষ ও স্বর্ণলতা দুটি পৃথক ধারার উপন্যাস। প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধুর ধারাই তারকনাথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রিয় গ্রন্থকার ছিলেন ডিকেন্স। ডিকেন্স এর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছিল, রিপোর্টিং-এ দক্ষতা ছিল। ডিকেন্স-এর উপন্যাসে ভালো ও মন্দ চরিত্র পরস্পর বিরোধী 'টাইপ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'স্বর্ণলতা'-য় দেখা যায় তারকনাথ যে শশিভূষণ-বিধুভূষণ-প্রমদা-শ্যামা-সরলাকে এঁকেছেন যে পারিবারিক কলহ-চক্রান্ত বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে কোথাও অতিরঞ্জন বা অ-স্বাভাবিকতা নেই। অন্যদিকে গোপাল ও স্বর্ণের কৈশোর-অনুরাগ অতি স্নিগ্ধরঙে আঁকা হয়েছে। স্বর্ণলতা মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাস নয় আবার আলালের ঘরের দুলালের মত নিছক স্কেচধর্মী ও নীতিপ্রচারী উপন্যাসও নয়। স্বর্ণলতার কাহিনী গ্রন্থিবদ্ধ, চরিত্রগুলিও অবাস্তব নয়, পাপের শাস্তি ও পুণ্যের জয়

থাকলেও অর্থাৎ 'virtue rewarded' দেখালেও গল্পের আকর্ষণ কমেনি। দীনবন্ধুর এত তারকনাথকে কার্যোপলক্ষে ঘুরে বেড়াতে হত, বহু ধরনের মানুষ তিনি দেখেছিলেন—তাঁকে কল্পনা করে কিছু আঁকতে হয়নি। তাঁর অমর সৃষ্টি—'নীলকমল' ও 'গদাধরচন্দ্র'। এই চরিত্র দুটি একেবারে classic সৃষ্টি। এরা 'টাইপ' চরিত্র নয়—সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি এবং চিরনতুন। নীলকমলের 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব' গীত, বেহালাবাদন, 'হনুমানে'র ভূমিকা অভিনয় এবং গদাধরচন্দ্রের 'ঐ চরণে ডিডি' আর্তনাদ কৌতুকহাস্যের অম্লান উৎস। পরবর্তীকালের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাসে বক্তব্য, বর্ণনা ও ভাষায় স্বর্ণলতার প্রভাব আছে।

ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাসের দিক থেকে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের এই বৃহদকায় উপন্যাস দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয় (প্রকাশের সময় গ্রন্থকারের নাম ছিল না) প্রথম খণ্ড ১৮৬৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪। প্রথম খণ্ডটি তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা' ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস নয়। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাস শিল্পধর্মের দিক থেকে 'অমার্জিত' রচনা হলেও মোগল-মগ ফিরিঙ্গী যুগের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা, তৎকালোচিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক যুদ্ধবিষয়ক বর্ণনানিপুণতায় এই উপন্যাসখানি বাংলাসাহিত্যে প্রথম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা লাভের যোগ্য। প্রথম খণ্ডে তিনি প্রতাপাদিত্যের কাহিনীকে 'দেশপ্রেম'-জড়িত করে রচনা করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের 'দেশপ্রেম'কে তাঁর গ্রন্থে প্রতিফলিত করেছেন। তার প্রতাপাদিত্য পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় কচুরায়কে ডেকে বলেছেন :

> কচু রায়, যে-ব্যক্তি যে প্রকারে হউক না কেন দাসত্বশৃঙ্খলের বন্ধন-মোচন করিতে সমর্থ, যে ব্যক্তি পরাধীনতা ঘৃণা করে ও স্বপ্নেও সেই বন্ধনমোচনে যত্নবান হয় সে আমার মান্যস্পদ—আমার প্রীতিভাজন।

> যে-ব্যক্তি পরাধীন হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হয়, সে আমার চক্ষে তত সম্ভ্রম লাভ করে না, কেননা—আমি স্ববাহুলব্ধ স্বাধীন অসভ্য কোল বা রাজবংশীকে ভক্তি করি।

সূর্যকুমারকে ডেকে বলেছেন :

> তুমি স্বাধীন রাজা। দেখ যেন মুসলমানকুহকে পড়িয়া স্বীয় আত্মার বিনিময় করিও না।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ১৮৬৯-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর প্রথম খণ্ড তার পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র প্রভাব 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এ নেই। বইখানির ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য তিনি 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' ও অন্যান্য ইতিহাস-গ্রন্থ থেকে বহু অংশ গ্রন্থশেষে উৎকলন করেছেন। চিত্র, মানচিত্র প্রভৃতিও দিয়েছেন। তিনি স্কটের উপন্যাসের অনুরাগী পাঠক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্কটের উপন্যাসের অনুকরণে তিনিই একমাত্র বৃহদকায় উপন্যাস লিখেছেন—চরিত্রে আইভ্যান হো, ব্ল্যাক নাইট প্রভৃতিকেও নিয়ে এসেছেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর সমালোচক লিখেছেন 'রেবতী' চরিত্র 'reminds one of Sir Walter Scott's Norna of the Fitful Head'. রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' এর অনুকরণে রচিত। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "বঙ্গাধিপে মোহ যদিও বিদূষক, তথাপি সে বীর ও প্রভুভক্ত, 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর রামমোহন মালের কতকগুলি গুণ ইহাতে দেখা যায়। বঙ্গাধিপের সরমা এখানে সুরমা হইয়াছে। বঙ্গাধিপে প্রতাপাদিত্য কুচরিত্র, দুরাচার, দস্যুপ্রকৃতিরূপে বর্ণিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কেবল দুরাচার মূর্তিতে দেখাইয়াছেন।"

বৌঠাকুরানীর হাটের 'রুক্মিণী'-র মধ্যে বঙ্গাধিপের 'বিমল' এর প্রভাব রয়েছে।

ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতাপচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে চলিত

রীতির গদ্যের ব্যবহার করেছেন—বোধকরি অংশতঃ কালীপ্রসন্নের সহিত বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের ফল। ঈষৎ দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

> গ্রামের চতুর্দিকে বাবলা ও পালতে-মাদারের বন, মাঝে মাঝে এক একটা তাল বা নারকেল গাছ যেন প্রহরীর মত চৌকি দিচ্চে ও মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে হাত নেড়ে শ্রান্ত পথিককে আহ্বান কচ্চে…

বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র ও তারকনাথের রচনা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা বহুলাংশে মিটিয়েছিল কিন্তু তখনকার সমাজে পঠনক্ষম পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাঠিকাদের সংখ্যাও বাড়ছিল। তাই রোমান্স ও গার্হস্থ্য উপন্যাস অসংখ্য রচিত হচ্ছিল। বাংলাসাহিত্যে এই পর্বে লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটে। এতদিন ছিলেন তাঁরা পাঠিকা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। অন্যদিকে সত্যেন্দ্রনাথের ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ ১৯৩২) 'ভারতী'-র সম্পাদনায় ব্রতী ছিলেন। তার প্রথম রচনা দীপনির্বাণ (১৮৭৬) বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের মতই দেশপ্রেম-মূলক ঐতিহাসিক রোমান্স। তার ভ্রাতারা 'হিন্দুমেলা'-র অন্যতম উদ্যোক্তা—সে হিন্দুমেলার গানে বঙ্কিমের মত বাংলা দেশকে বন্দনা করা হয়নি, হয়েছে ভারতমাতাকে। বঙ্কিমের পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন', তাদের পত্রিকার নাম 'ভারতী'। দীপনির্বাণের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫)-র মত দেশপ্রেমমূলক নাট্য রচনার কথা মনে রাখতে হবে। সেজন্যই 'দীপনির্বাণ'-এর 'উপহার' পত্রে তিনি লিখেছেন :

> আর্য অবনতি কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
> বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার,
> কেমনে হাসিতে বলি সকলি গিয়েছে চলি,
> ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
> নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙেছে কপাল

রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ'-এর পূর্বে বার হয়। স্বর্ণকুমারী এ-গ্রন্থ রচনায় রমেশচন্দ্রকে অনুসরণ করেননি, বরং বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' তাঁর 'আদর্শ'। 'দীপনির্বাণ'-এর কাহিনী পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর বিষয়। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে বীররসাত্মক কাব্য লিখে ফেলেছিলেন)—উপন্যাস হিসাবে 'দীপনির্বাণ' মূল্যবান রচনা নয়—তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারার দিক থেকে মূল্যহীনও নয়। তাঁর ছিন্নমুকুল (১৮৭৯) মিবাররাজ (১৮৮৭) ও বিদ্রোহ (১৮৯০) 'দীপনির্বাণ'-এর পরিণতি। 'মিবাররাজ' ও 'বিদ্রোহ'—উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'-র প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উভয়েই ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'স্নেহলতা' (প্রথম খণ্ড ১৮৮৯; দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯২) এবং 'কাহাকে' (১৮৯৪) উল্লেখযোগ্য। সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্র প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচয় দিলেও তার 'সংসার' ও 'সমাজ' জীবনহীন। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসগুলি তার চেয়ে ভালো। তখনকার সমাজে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসে তার প্রকাশ ঘটবে এ তো অনিবার্য। স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসে প্রথম দেশপ্রেমমূলক নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা স্নেহলতা ও চারুর প্রেমসঞ্চার এবং শেষে চারুর বিশ্বাসঘাতকতায় স্নেহলতার আত্মহত্যা উপন্যাসখানিকে যুগপৎ সমস্যাজটিল ও করুণ করে তুলেছে। 'কাহাকে' শুধু মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস নয়—যে feminine touch আমরা মহিলা-ঔপন্যাসিকের লেখায় আশা করি এ-উপন্যাসে তা পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী মহিলা-ঔপন্যাসিকদের আগমনের পথ প্রশস্ত করেছেন, ঊনবিংশ শতকের বাংলা উপন্যাসে ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুটি ধারাকেই পুষ্ট করেছেন।

এ-যুগে রোমাঞ্চকর, প্রণয়রসাত্মক, কাল্পনিক ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস অসংখ্য লেখা হয়েছিল তার দ্বারা সাধারণ-পাঠকের গল্পপাঠের আকাংক্ষা বহুলাংশে তৃপ্ত হয়েছিল। তার মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমর সিংহ', চণ্ডীচরণ সেনের 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'ঝানসীর রানী', দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'নবাবনন্দিনী' প্রভৃতির নাম করা যায়। অন্যদিকে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস লেখাও সমানে চলছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য বা significant রচনার সংখ্যা কম। তার একটি কারণ তখনকার যুগেতিহাস। কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন কিন্তু কয়েকবৎসর পরে তাঁর অতিরিক্ত বাইবেলপ্রীতি, 'কনকেসন', 'নরপূজা', 'প্রত্যাদেশ' এবং শেষে বালিকা কন্যাকে কুচবিহার-মহারাজের সহিত বিবাহদানে ও 'রাজভক্তি'-র জন্য 'আপেক্ষিক' প্রগতিশীল দলের সঙ্গে তার সংঘাত হয়। ফলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত হয় এবং কেশব সেন 'নববিধান সমাজ' গঠন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে আখ্যাত হল। কাজেই ব্রাহ্মসমাজ তখন ত্রিধাবিভক্ত। আবার কেশব সেন নির্দেশিত ১৮৭২-এ তিন আইনে বিবাহ বিল পাশ হওয়ায় 'ব্রাহ্মেরা হিন্দু নয়' এই মর্মে আদালতে ঘোষণা করায় হিন্দুসমাজ ক্রুদ্ধ হয়েছিল। হিন্দুসমাজেও এ-সময় 'নব্যহিন্দুত্ব' দেখা দিল। 'প্রচার', 'নব্যভারত', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকা তারই সাক্ষ্য। 'আস্ফালন'-এ দেশ ছেয়ে গেল। শশধর তর্কচূড়ামণি নামে একজন অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি এই নব্যহিন্দুত্বের নেতৃত্ব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ামণিকে স্বীকার করেননি। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসু চূড়ামণির প্রধান সহায় হলেন। এ-যুগ আবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগও। কেশবচন্দ্র সেন শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কুলধর্ম বৈষ্ণব ভক্তিধর্মই তাঁকে অধিকার করল। আদি ব্রাহ্মসমাজ ঔপনিষদিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্ব উপন্যাসে প্রবেশ করল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' (১৮৭৪) ব্রাহ্মদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস। 'পঞ্চানন্দ' ও 'বঙ্গবাসী'-র ইন্দ্রনাথ 'নিরপেক্ষ' satirist ছিলেন না—যদিও তিনি লিখেছেন যে ফরাসী satiristদের বই পড়ে তাঁর এই সাধ জেগেছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত-টেকচাঁদ-হুতোম ধারার লেখক। উপন্যাস হিসাবে কল্পতরু, আখ্যান বা চরিত্র, কোনদিক থেকেই সার্থক নয়। তাঁর 'ক্ষুদিরাম'-এ একই মনোবৃত্তির পরিচয়। ইন্দ্রনাথের এই ব্রাহ্ম-বিরোধী, বিদ্রূপাত্মক রচনার ধারা 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর (১৮৫৪-১৯০৫) চার খণ্ডের 'মডেল ভগিনী' উপন্যাসে রক্ষিত হয়েছে। একদিকে আধুনিকতা ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে স্থূল ও ইতর আক্রমণ অপরদিকে নব্যহিন্দুত্বের ধ্বজাবহন—এই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ শিল্পভ্রষ্ট। তাঁর 'বাঙালী-চরিত'-ও প্রতিক্রিয়াশীল সনাতনী দৃষ্টির নিদর্শন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২) অধুনা-পূর্ব যুগের হিন্দুসমাজের প্রামাণিক আলেখ্য। 'রঘুদয়াল' চরিত্রটি হুগোর 'লে মিজারেবলস'-এর জাঁ ভালজাঁর অনুসরণে পরিকল্পিত বলে মনে হয়।

অন্যদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) 'মেজ বৌ', 'যুগান্তর', 'নয়নতারা' প্রভৃতি কয়েকখানি শিক্ষামূলক 'পারিবারিক উপন্যাস' লিখেছিলেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 'সুরুচির কুটীর' এরই সগোত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের শক্তিকানন, ফুলজানি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বনাথ—ঊনবিংশ শতকের শেষে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শিলাইদহ—পাতিসর অঞ্চলে পদ্মাবিধৌত জগতে ভ্রাম্যমান। তিনি তাঁর তখনকার ছোটগল্পগুলিতে বাংলার পল্লীজীবনের হৃদ্‌স্পন্দনকে ধ্বনিত করাচ্ছেন। 'শক্তিকানন' (১৮৮৭) প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল :

> আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে। ওর মধ্যে কোন নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই।...আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক বিড়ম্বনায়

এ-যুগে রোমাঞ্চকর, প্রণয়রসাত্মক, কাল্পনিক ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস অসংখ্য লেখা হয়েছিল তার দ্বারা সাধারণ-পাঠকের গল্পপাঠের আকাংক্ষা বহুলাংশে তৃপ্ত হয়েছিল। তার মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমর সিংহ', চণ্ডীচরণ সেনের 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'ঝানসীর রানী', দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'নবাবনন্দিনী' প্রভৃতির নাম করা যায়। অন্যদিকে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস লেখাও সমানে চলছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য বা significant রচনার সংখ্যা কম। তার একটি কারণ তখনকার যুগেতিহাস। কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন কিন্তু কয়েকবৎসর পরে তাঁর অতিরিক্ত বাইবেলপ্রীতি, 'কনফেসন', 'নরপূজা', 'প্রত্যাদেশ' এবং শেষে বালিকা কন্যাকে কুচবিহার-মহারাজের সহিত বিবাহদানে ও 'রাজভক্তি'-র জন্য 'আপেক্ষিক' প্রগতিশীল দলের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয়। ফলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত হয় এবং কেশব সেন 'নববিধান সমাজ' গঠন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে আখ্যাত হল। কাজেই ব্রাহ্মসমাজ তখন ত্রিধাবিভক্ত। আবার কেশব সেন নির্দেশিত ১৮৭২ এ তিন আইনে বিবাহ বিল পাশ হওয়ায় 'ব্রাহ্মেরা হিন্দু নয়' এই মর্মে আদালতে ঘোষণা করায় হিন্দুসমাজ ক্রুদ্ধ হয়েছিল। হিন্দুসমাজেও এ-সময় 'নব্যহিন্দুত্ব' দেখা দিল। 'প্রচার', 'নব্যভারত', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকা তারই সাক্ষ্য। 'হাসামের আস্ফালন'-এ দেশ ছেয়ে গেল। শশধর তর্কচূড়ামণি নামে একজন অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি এই নব্যহিন্দুত্বের নেতৃত্ব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ামণিকে স্বীকার করেননি। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসু চূড়ামণির প্রধান সহায় হলেন। এ-যুগ আবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগও। কেশবচন্দ্র সেন শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কুলধর্ম বৈষ্ণব ভক্তিধর্মই তাঁকে অধিকার করল। আদি ব্রাহ্মসমাজ ঔপনিষদিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্ব উপন্যাসে প্রবেশ করল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' (১৮৭৪) ব্রাহ্মদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস। 'পঞ্চানন্দ' ও 'বঙ্গবাসী'-র ইন্দ্রনাথ 'নিরপেক্ষ' satirist ছিলেন না—যদিও তিনি লিখেছেন যে ফরাসী satiristদের বই পড়ে তাঁর এই সাধ জেগেছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত-টেকচাঁদ হুতোম ধারার লেখক। উপন্যাস হিসাবে কল্পতরু, আখ্যান বা চরিত্র, কোনদিক থেকেই সার্থক নয়। তাঁর 'ক্ষুদিরাম'-এ একই মনোবৃত্তির পরিচয়। ইন্দ্রনাথের এই ব্রাহ্ম-বিরোধী, বিদ্রূপাত্মক রচনার ধারা 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর (১৮৫৪-১৯০৫) চার খণ্ডের 'মডেল ভগিনী' উপন্যাসে রক্ষিত হয়েছে। একদিকে আধুনিকতা ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে স্থূল ও ইতর আক্রমণ অপরদিকে নব্যহিন্দুত্বের ধ্বজাবহন—এই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ শিল্পভ্রষ্ট। তার 'বাঙালী-চরিত' ও প্রতিক্রিয়াশীল সনাতনী দৃষ্টির নিদর্শন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২) অধুনা পূর্ব যুগের হিন্দুসমাজের প্রামাণিক আলেখ্য। 'রঘুদয়াল' চরিত্রটি হুগোর 'লে মিজারেবলস'-এর জাঁ ভালজাঁর অনুসরণে পরিকল্পিত বলে মনে হয়।

অন্যদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭ ১৯১৯) 'মেজ বৌ', 'যুগান্তর', 'নয়নতারা' প্রভৃতি কয়েকখানি শিক্ষামূলক 'পারিবারিক উপন্যাস' লিখেছিলেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 'সুরুচির কুটার' একই সগোত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের শক্তিকানন, ফুলজানি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বনাথ—ঊনবিংশ শতকের শেষে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শিলাইদহ—পতিসর অঞ্চলে পদ্মাবিধৌত জগতে ভ্রাম্যমান। তিনি তাঁর তখনকার ছোটগল্পগুলিতে বাংলার পল্লীজীবনের হৃদ্‌স্পন্দনকে ধ্বনিত করাছলেন। 'শক্তিকানন' (১৮৮৭) প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল :

> আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে। ওর মধ্যে কোন নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই।...আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক বিড়ম্বনায়

যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে নিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন।

কিন্তু পল্লীজীবনাশ্রিত উপন্যাসে হঠাৎ অস্বাভাবিক 'রোমাঞ্চকর' ঘটনা এনে শ্রীশচন্দ্র 'ফুলজানি'-কে শ্রীভ্রষ্ট করেছেন। গল্পের শেষে জোর করে ফুল ও কালীর অপহরণ তথা সিরাজদৌল্লার ঘাতকদের হস্তে উদ্ধারকারী পুরন্দরের মৃত্যু সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

সম্পূর্ণ পৃথক 'রস' আনলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর fantasy সমৃদ্ধ 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) উপন্যাসে। ঐতিহাসিক, দেশপ্রেমমূলক, সামাজিক, মনস্তত্ত্বমূলক, শিক্ষামূলক, রোমাঞ্চকর বা বিদ্রূপাত্মক—নানা ধরনের উপন্যাস উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা হয়েছে—কিন্তু 'কঙ্কাবতী' সম্পূর্ণ ভিন্ন রসের। উদ্ভট কল্পনা ও রূপকথার যাদুর সঙ্গে সরস বিদ্রূপ মিলে অপরূপ অনন্য সৃষ্টি 'কঙ্কাবতী'। গল্পবলার আদিম আর্ট রূপকথায় আছে—ত্রৈলোক্যনাথ সেই আর্টের পাকা জহুরী। ত্রৈলোক্যনাথের মেকি-বিরোধী তীক্ষ্ণ সামাজিক-দৃষ্টি ও মানবিকতার পরিচয় তাঁর 'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০০) এবং 'মুক্তামালা'-য় (১৯০১)—সেগুলি বিংশ শতকের শুরুর রচনা।

উনবিংশ শতকে অতি দ্রুত বাংলা উপন্যাস নিজেকে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ঘটনা তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। প্রথমত আমাদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় প্রার্থিত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ঘটেছে। অন্যের কথা কি, স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন। তাই নরনারীর সামাজিক মেলামেশার অভাবে প্রণয়চিত্রগুলি বেশির ভাগ পাশ্চাত্যরীতিতে বর্ণিত হয়েছে। বাল-বিধবা ভিন্ন যুবতী নায়িকার সন্ধান বাল্যবিবাহের যুগে পাওয়া কঠিন ছিল। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গির

পরিবর্তন অন্যান্য দেশে হয়েছে আমাদের দেশে তা হয়নি। তাই এই পরাধীন, ধর্মপ্রাণ দেশে রাজনীতি ও ধর্ম একদেহে মিলেছে এবং ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত 'সুরুচি' ও 'সুনীতি'-র পিউরিটানী চাপে ও ভিক্টোরীয় যুগের নৈতিকতার অনুসরণে উপন্যাসে জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেনি। বঙ্কিমচন্দ্রই ঊনবিংশ শতকের উপন্যাস সাহিত্যের সম্রাট, তিনি কাব্য ও নীতির মূল লক্ষ্য এক বলে স্বীকার করায় উপন্যাসে রক্তসঞ্চার অপেক্ষাকৃত ব্যাহত হয়েছে। আর একটি কারণ সমকালীন জাতীয়তাবাদ। দেশপ্রেম প্রচার সেদিনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাটকে, মহাকাব্যে ও সঙ্গীতে দেশপ্রেমের জোয়ার সেদিন বয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে কি নরনারী জীবনের কলধ্বনিতে কেউ কাণ পাতে?

আধুনিক কাল

ইংরেজি উপন্যাস : হার্ডির পর থেকে সাম্প্রতিক কাল

উনবিংশ শতকের শেষে ভিকটোরীয় যুগের সামাজিক ব্যবস্থা ও চিরাচরিত ধারণা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিদ্রোহ দেখা গেছে। ডিকেন্‌স্, থ্যাকারে, হার্ডির ধারায় স্যামুয়েল বাটলার (১৮৩৫-১৯০২)-এর নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা The Way of All Flesh উপন্যাসে রোমান্‌স-বিরোধী, সংশয়বাদী অষ্টাদশ-শতকী দৃষ্টির পরিচয় মেলে। ভিক্‌টোরীয় যুগের পারিবারিক মূল্যবোধ, চার্চের যুক্তিহীন সংস্কার ও বুর্জোয়া সমাজের চিন্তাদৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি চ্যালেঞ্জ পাঠিয়েছেন—তাতে তাঁকে বার্ণাড শ'এর পূর্বসূরী বলে মনে হয়।

ভিক্‌টোরীয় যুগের শেষ পাদে ইংরেজি উপন্যাস দুজন বিদেশী, হেনরি জেমস (১৮৪৩ ১৯১৬) এবং কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪)-এর দানে সমৃদ্ধ হয়। জেমস The Art of Fiction (১৮৮৪) প্রবন্ধে লিখেছেন 'A novel is in its broadest definition a personal, a direct impression of life'। তাঁর উপন্যাসে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, উদ্দেশ্যবাদ বা বাগ্মিতা নেই। তিনি যে বলেছেন 'try and catch the colour of life itself'—তার উপন্যাসগুলি ঐ মতের শিল্প সাক্ষ্য। শিল্প নির্মিতির দিক থেকে তিনি ফ্লোব্যার-এর সমধর্মা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার তিনি 'novel of incident এবং 'novel of character' এই দুয়ের মধ্যে কোনও ভেদ স্বীকার করেন নি। ইউরো-আমেরিকান নরনারীর জীবননাট্য তাঁর আখ্যানের উপজীব্য। তাঁর চরিত্রগুলির মনের সূক্ষ্মগ্রন্থি উন্মোচনের যাদুকরী কৌশল ও বর্ণনায় নাটকীয় দীপ্তি সঞ্চার পাঠকের মনকে চিরতরে অধিকার করে। আবার ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস জয়েস বা ভার্জিনিয়া উলফের রচনায় যে 'internal monologue' বা 'stream of

consciousness' পাই তার সুস্পষ্ট পূর্বাভাব রয়েছে 'The Portrait of a Lady'-র ইসাবেল আর্চারের নিঃসঙ্গ, নিভৃত, নিশীথ চিন্তায় (৪২শ পরিচ্ছেদ)।

আর রবার্ট লুই স্টিভেনসন-এর স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপ পেল কনরাড-এর উপন্যাসে। ফেনশীর্ষ সমুদ্রের পটভূমিকায় রচিত বিস্ময়কর উপন্যাসগুলি (যেমন টাইফুন) তার অভিযাত্রী জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। এখানে তিনি Romantic Realist। কিন্তু মনোজগতের শিল্পীরূপেও তিনি শ্রদ্ধার্হ—Lord Jim তার দৃষ্টান্ত। আবার সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের ঔপনিবেশিক শোষণও তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন 'নোসট্রোমো' উপন্যাসে (১৯০৪)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ঘটবার পূর্বেই বেনেট, ওয়েলস্, গলসওয়ার্দি ও লরেনস খ্যাতিলাভ করেন ঔপন্যাসিকরূপে। বেনেট (১৮৬৬-৩১) এর The Old Wives' Tale' এবং পটারি টাউন নিয়ে লেখা 'Clayhanger' তাঁর বাস্তবধর্মী দৃষ্টির পরিচয় দেয়। ওয়েলস্ (১৮৬৬-১৯৪৬) সমাজ কল্যাণকামী শিল্পী, 'বিশুদ্ধ' শিল্পবাদী নন, তাই হেনরি জেমস্‌কে জোরের সঙ্গে লিখেছিলেন—'I would rather be a journalist than an artist'. এই ক্ষেত্রে শ'-এর সঙ্গে তাঁর মিল। তার শ্রেষ্ঠ রচনা 'Tono Bungay'। তিনি মেরিডিথ-এর আদর্শে উপন্যাসকে 'vehicle of philosophy' করবার পক্ষপাতী ছিলেন। গলসওয়ার্দি (১৮৬৭ ১৯৩৩) বেনেটের মতো সমাজের ফটোগ্রাফ তোলেন নি—সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করেছেন, উত্তর খুঁজেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'দি ফরসাইট সাগা'—ফরসাইট পরিবারের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত। (রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস প্রথমে 'তিন পুরুষ' নামে বিচিত্রা পত্রিকার দুই সংখ্যায় বার হয়—রবীন্দ্রনাথ Man of Property অংশকে ঐ উপন্যাসে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন)। ফরসাইটরা নিজেদের দখলীস্বত্বের অধিকারকে আঁকড়ে ছিল, এমন কি সোয়ামেস তাঁর স্ত্রী আইরিনকে

আধুনিক কাল

ইংরেজি উপন্যাস : হার্ডির পর থেকে সাম্প্রতিক কাল

ঊনবিংশ শতকের শেষে ভিকটোরীয় যুগের সামাজিক ব্যবস্থা ও চিরাচরিত ধারণা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিদ্রোহ দেখা গেছে। ডিকেন্‌স্‌, থ্যাকারে, হার্ডির ধারায় স্যামুয়েল বাটলার (১৮৩৫-১৯০২)-এর নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা The Way of All Flesh উপন্যাসে রোমান্‌স-বিরোধী, সংশয়বাদী অষ্টাদশ-শতকী দৃষ্টির পরিচয় মেলে। ভিক্‌টোরীয় যুগের পারিবারিক মূল্যবোধ, চার্চের যুক্তিহীন সংস্কার ও বুর্জোয়া সমাজের চিন্তাদৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি চ্যালেঞ্জ পাঠিয়েছেন—তাতে তাঁকে বার্ণাড শ'এর পূর্বসূরী বলে মনে হয়।

ভিক্‌টোরীয় যুগের শেষ পাদে ইংরেজি উপন্যাস দুজন বিদেশী, হেনরি জেমস (১৮৪৩ ১৯২৬) এবং কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪)-এর দানে সমৃদ্ধ হয়। জেমস The Art of Fiction (১৮৮৪) প্রবন্ধে লিখেছেন 'A novel is in its broadest definition a personal, a direct impression of life'। তাঁর উপন্যাসে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, উদ্দেশ্যবাদ বা ব্যঙ্গধর্মিতা নেই। তিনি যে বলেছেন 'try and catch the colour of life itself'—তাঁর উপন্যাসগুলি ঐ মতের শিল্প সাক্ষ্য। শিল্প নির্মিতির দিক থেকে তিনি ফ্লোব্যার-এর সমধর্মা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার তিনি 'novel of incident এবং 'novel of character' এই দুয়ের মধ্যে কোনও ভেদ স্বীকার করেন নি। ইউরো-আমেরিকান নরনারীর জীবননাট্য তাঁর আখ্যানের উপজীব্য। তাঁর চরিত্রগুলির মনের সূক্ষ্মগ্রন্থি উন্মোচনের যাদুকরী কৌশল ও বর্ণনায় নাটকীয় দীপ্তি সঞ্চার পাঠকের মনকে চিরতরে অধিকার করে। আবার ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস জয়েস বা ভার্জিনিয়া উলফের রচনায় যে 'internal monologue' বা 'stream of

consciousness' পাই তার সুস্পষ্ট পূর্বাভাষ রয়েছে 'The Portrait of a Lady'-র ইসাবেল আর্চারের নিঃসঙ্গ, নিভৃত, নিশীথ চিন্তায় (৪২শ পরিচ্ছেদ)।

আর রবার্ট লুই স্টিভেনসন্-এর স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপ পেল কনরাড-এর উপন্যাসে। ফেনশীর্ষ সমুদ্রের পটভূমিকায় রচিত বিস্ময়কর উপন্যাসগুলি (যেমন টাইফুন) তার অভিযাত্রী জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। এখানে তিনি Romantic-Realist। কিন্তু মনোজগতের শিল্পীরূপেও তিনি শ্রদ্ধার্হ—Lord Jim তার দৃষ্টান্ত। আবার সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের ঔপনিবেশিক শোষণও তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন 'নোসট্রোমো' উপন্যাসে (১৯০৪)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ ১৮) ঘটবার পূর্বেই বেনেট, ওয়েলস্, গলসওয়ার্দি ও লরেনস্ খ্যাতিলাভ করেন ঔপন্যাসিকরূপে। বেনেট (১৮৬৬-৩১)-এর The Old Wives' Tale' এবং পটারি টাউন নিয়ে লেখা 'Clayhangor' তাঁর বাস্তবধর্মী দৃষ্টির পরিচয় দেয়। ওয়েলস্ (১৮৬৬-১৯৪৬) সমাজ কল্যাণকামী শিল্পী, 'বিশুদ্ধ' শিল্পবাদী নন, তাই হেনরি জেমস্‌কে জোরের সঙ্গে লিখেছিলেন—'I would rather be a journalist than an artist'. এই ক্ষেত্রে শ'-এর সঙ্গে তার মিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'Tono Bungay'। তিনি মেরিডিথ-এর আদর্শে উপন্যাসকে 'vehicle of philosophy' করবার পক্ষপাতী ছিলেন। গলসওয়ার্দি (১৮৬৭ ১৯৩৩) বেনেটের মতো সমাজের ফটোগ্রাফ তোলেন নি—সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করেছেন, উত্তর খুঁজেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'দি ফরসাইট সাগা'—ফরসাইট পরিবারের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত। (রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস প্রথমে 'তিন পুরুষ' নামে বিচিত্রা পত্রিকার দুই সংখ্যায় বার হয়—রবীন্দ্রনাথ Man of Property অংশকে ঐ উপন্যাসে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন)। ফরসাইটরা নিজেদের দখলীস্বত্বের অধিকারকে আঁকড়ে ছিল, এমন কি সোয়ামেস তাঁর স্ত্রী আইরিনকে

'অর্জিত সম্পত্তি' হিসাবেই দেখেছিল। তাই সে তাকে হারাল। উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর পোষিত 'আদর্শ'গুলির ভাঙন গলসওয়ার্দি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। লরেন্‌স্ এই উপন্যাস-খানিকে 'satire' হিসাবে দেখলেও এর 'sincere creative passion'-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উপন্যাসের শেষ অংশ 'To Let'-এ যেখানে সোয়ামেস ফরসাইট তার দ্বিতীয়া স্ত্রী আনেৎ-এর মেয়ে ফ্লুর-এর প্রেমের, জীবনের সার্থকতার জন্য তার ডিভোর্স করা স্ত্রী আইরিনের কাছে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত পুত্র জন্‌কে প্রার্থনা করছে দীনভাবে—সেই দৃশ্যের নাটকীয় উৎকর্ষ একমাত্র বালজাক বা তলস্তয়ের উপন্যাসে মেলে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিখ্যাত জর্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান-এর 'বুডেনব্রুক্‌স্' (১৯০১) এর কথা। অভিজাততন্ত্রের ভাঙনের সেও এক অপূর্ব আলেখ্য।

লরেনস্ (১৯৩০) এর 'সনস্ অ্যাণ্ড লাভার্স' (১৯১৩) যুদ্ধের পূর্বেই রচিত হয়। তিনি সামাজিক বাস্তবতার শিল্পী বেনেট বা গলসওয়ার্দির ধারাকে বর্জন করতে চেয়েছেন—'it is time for a reaction against Shaw and Galsworthy'। পূর্বোক্ত বইখানি বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক। পল মোরেল্ এর আবরণে লরেনস্ নিজেকেই বহুলভাবে প্রকাশ করেছেন। লরেনস্ বলেছেন তিনি এ বই লেখার আগে ফ্রয়েড পড়েন নি। অবশ্য সনস্ অ্যাণ্ড লাভার্স এর জন্য 'প্রস্তুত' (অথচ অপ্রকাশিত) একটি ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন: 'The old son-lover was Œdipus. The name of the new one is legion.' সফোক্লিসের 'ঈডিপাস'-সংস্কার তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি নিজের মাতৃকাম জীবন-অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করবার জন্যই ঈডিপাসের উল্লেখ করেছেন এবং এ সূত্রে হ্যামলেটেরও। এর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে দেখি তিনি বুদ্ধিবাদ বা বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অবিশ্বাস করেছেন। 'সনস্ অ্যাণ্ড লাভার্স'-এর মত বইও আর লেখেন নি। তিনি বিশ্বাসী হয়েছেন আদিম 'প্রবৃত্তি'র সত্যে, অবচেতনলোকের গূঢ় তমসায়—My great religion is a

belief in the blood, the flesh, as being wiser than the intellect.' তাই দেহধর্মকে চেপে রেখেছে বলে তিনি খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী হয়ে ছিলেন। তাঁর 'Lady Chatterley's Lover' (১৯২৯)-এ দেহধর্মের আদিম কামনার জয় ঘোষিত হয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পুরুষত্বহীন স্যর ক্লিফোর্ডকে পরিত্যাগ করে লেডি চ্যাটারলি মুক্ত অরণ্যভূমিতে, মৃত্তিকায়, বর্ষাধারায় আদিম নারীর মত স্বামীর 'গেম-কিপার' বা শিকার-রক্ষক নিম্নরুচি অথচ স্বাস্থ্যের আদিম রক্তে ধনী মেল্‌রস-এর কাছে দেহ সমর্পণে ও যৌনসঙ্গমে আত্মার মুক্তি খুঁজে পেয়েছে। লরেন্‌স এজন্যই এ উপন্যাসকে আদিম সভ্যতার প্রতীকরূপে 'phallic novel' আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য কোন কোন সমালোচক স্যর ক্লিফোর্ডকে দেখেন যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সমাজ, মেলর্‌সকে নতুন গণসমাজ শক্তি এবং লেডি চ্যাটারলি ও মেলরস্‌-এর ভাবী সন্তানকে আসন্ন সুস্থ সমাজের প্রতীকরূপে।

ব্যাধিগ্রস্ত বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে তার আরণ্য বিদ্রোহ এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর অম্লান আশা লরেনস্‌কে মহৎ শিল্পীর পর্যায়ে স্থান দেয়: One must speak for life and growth amid all this mass of destruction and disintegration.' মনে রাখতে হবে Sex তাঁর কাছে হোমাগ্নির মত, সেজন্য তিনি অস্‌কার ওয়াইল্ড ও মপাসাঁর নিন্দা করেছেন এবং 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' লিখবার সময় 'কাসানোভা'র আত্মকথাকে 'অশ্লীল' বলে ঘোষণা করেন।

বিংশ শতকে উপন্যাসের রূপান্তর সম্পর্কে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ১৯১৪র একটি বক্তৃতায় বলেন: On or about December 1910, human character changed. অধ্যাপক আইজাকস্‌ এর ব্যাখ্যা দেন গ্রাফটন্‌ গ্যালারিতে Post-Impressionist শিল্পী ভ্যান গগ, গগাঁ, মাতিস, পিকাসো, সেজান প্রভৃতির চিত্র প্রদর্শনী। রজার ফ্রাই ও ক্লাইভ বেল-এর মতে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এই নব্য চিত্রকলার অনুরাগী হয়ে ছিলেন। সেজন্যই তিনি বেনেট, ওয়েলস ও গলস-

ওয়াদিকে Realist বলেননি, বলেছেন Materialist এবং উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বললেন : Look within and life, it seems, is very far from being "like this"—আর "life is a luminous halo…"। সেজন্যই তিনি stream of consciousness-এর শিল্পী জেমস জয়েসকে বলেছেন 'spiritualist'। এই 'চেতনাপ্রবাহ' বহির্মুখীনতার আমূল প্রতিবাদ। পূর্বেকার উপন্যাস গড়ে উঠেছিল মুখ্যত সামাজিক উৎস থেকে, সে ছিল সর্বজন-পাঠ্য। আখ্যান, চরিত্র, পরিবেশ বর্ণনা ও সংলাপ এই চতুরঙ্গ বলে সে বলীয়ান ছিল। কিন্তু জেমস জয়েস, ডরোথি রিচার্ডসন বা ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাস সে-ধারা পরিত্যাগী, বুদ্ধিগম্য। তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও রীতি সম্পূর্ণ পৃথক। বুদ্ধিধর্মিতা, প্রতীকধর্মিতা ও চেতনাপ্রবাহতত্ত্ব—এঁদের উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায় এতদিনের উপন্যাসের সামাজিক মূল্যবোধের দিকটি সংকুচিত হয়ে গেল। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯০৯ থেকে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা তত্ত্ব প্রচারিত হতে থাকে এবং ফরাসী ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২) রচিত A la recherche du temps per du (Remembrance of Things Past) এর প্রথম পর্ব Swann's way প্রকাশিত হয় ১৯১৩এ। ঘটিকা-নির্দিষ্ট সময়ের সীমা এখানে তুচ্ছ, সময়হীনতার রাজ্যে মনের প্রবাহ এখানে সঞ্চরমান। এর পিছনে 'দার্শনিক' বের্গসঁ এর মতবাদ অবশ্যই ছিল। এই পটভূমিকায় দেখলে stream of consciousness novel-এর রূপটি বোঝা যায়। ১৯১৮-এ ডরোথি রিচার্ডসনের Pointed Roofs-এর (১৯১৫) আলোচনায় যে সিনক্লেয়ার এই সংজ্ঞাটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনিও এটি পেয়েছিলেন হেনরি জেমসের ভ্রাতা দর্শনের অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্-এর Principles of Psychology (১৮৯০) থেকে—'Let us call it the stream of thought, of consciousness or of subjective life.' ডরোথি রিচার্ডসনের সম্পূর্ণ উপন্যাসপর্বের নাম Pilgrimage (১৯১৫-৩৫)।

মিরিয়ম হেণ্ডারসন-এর অন্তর-জগতের চেতনাপ্রবাহ গ্রন্থের পর্বগুলির মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪০) তাঁর 'ইউলিসিস' উপন্যাসখানি জুরিখে ১৯১৪-১৮ কালপর্বে লেখেন। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং তখন সেখানকার বাসিন্দা। জয়েসের উপন্যাসে তাঁর মতের প্রভাব সর্বস্বীকৃত। জয়েস অবশ্য বলেছেন যে ত্রিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত Dujardin এর Les Lauriers sont coupes বইয়ে তিনি 'monologue interieur'-এর সন্ধান পান। কিন্তু ইউলিসিস শুধু 'stream of consciousness' উপন্যাস নয়—যেন প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন যুগের ব্যঙ্গ মহাকাব্য। বীর রাজা অডিসিউস বাধাবিঘ্ন জয় করে ট্রয় যুদ্ধ শেষে ইথাকায় ফিরে আসছেন, তাঁর পুত্র টেলিমেকাস ও সাধ্বী পত্নী পেনিলোপের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। আর এই যুগের 'অডিসিউস' সাধারণ সেলসম্যান আইরিশ ইহুদী ব্লুম ১৯০৪ এর ১৬ই জুন সকাল-বেলায় বেরিয়ে ক্রমান্বয়ে মাংসের দোকানে, সংবাদপত্রের আপিসে, লাইব্রেরীতে, রেস্তোঁরায়, শবযাত্রায়, চটুল মেয়ের পিছনে হাসপাতালের প্রসবাগারে ঘুরেছে। একালের 'টেলিমেকাস' শিক্ষিত, বীতবিশ্বাস স্টিফেন ডেডালাস যখন মদ্যাসক্ত হয়ে গণিকালয়ে গেছে ব্লুম তাকে পিতার স্নেহে অনুসরণ করেছে, রক্ষা করেছে শেষে বাড়ি নিয়ে এসেছে। এ-যুগের 'পেনিলোপ' ব্লুমের স্ত্রী মারিয়ান সকালবেলায় তার 'নাগর'-এর চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছে এবং ব্লুম-এর অনুপস্থিতির সুযোগে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। ব্লুম সব জেনে-শুনে রাত্রে সেই স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়েছে। উপন্যাসের শেষ অংশে মারিয়ান ব্লুমের অবচেতন মনের আত্মকথন ও যৌনসাধ—ছেদ, যতি, বিরামহীন প্রবাহে বর্ণিত হয়েছে। এলিয়ট-এর The Waste Land কাব্যে 'ইউলিসিস'-এর প্রভাব পড়েছে। কেননা এই উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধকালীন যুগের বাস্তব হতাশা ও শিক্ষিত মনের তিক্ত নৈরাশ্যকে ব্যক্ত করেছে। সামঞ্জস্যের সূত্রচ্ছিন্ন সমাজের পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের প্রতীক অক্ষম ব্লুম। তাই র‍্যাবলের সঙ্গে

জয়েসের তুলনা করে অনৈক সমালোচক ঠিকই লিখেছেন: "If Rabelais is the literary record of the birth of individualism, Ulysses illustrates its final bankruptcy—in the hopeless isolation of the individual spirit."

ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর 'Modern Fiction' প্রবন্ধে লিখেছেন যে ঔপন্যাসিক যদি স্বাধীনভাবে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারতেন তাহলে "there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted sense." তাঁর Mrs. Dalloway (১৯২৫), To the Lighthouse (১৯২৭), The Waves (১৯৩১) এই নব উপন্যাসরীতির সাক্ষ্য। তিনি প্রুস্ত ও জয়েসের উপন্যাস পড়েছিলেন। বের্গসঁ-এর গতিতত্ত্ব, জীবনপ্রবাহতত্ত্ব তার অধীত ছিল। 'মিসেস ড্যালোওয়ে' জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর অনুসরণ যদিচ হোমরীয় আখ্যানের কোনও প্রসঙ্গ এখানে নেই। এখানেও জুন মাসের একটি দিন, শ্রীমতী ড্যালোওয়ে ফুল কিনতে বার হয়েছেন তাঁর জন্মদিনের পার্টির জন্য। মাঝে মাঝে বিগবেনের ঘণ্টা বাজে, শ্রীমতী ড্যালোওয়ে, যুদ্ধ বিকারগ্রস্ত সেপটিমাস ওয়ারেন স্মিথ, পিটার ওয়ালশদের স্মৃতিচারণ বর্তমানের নির্দিষ্ট কাল পরিধিকে পার হয়ে দূরে চলে যায়। 'Simultaneity of Experience' এই উপন্যাসের সম্পদ। 'মিসেস ড্যালোওয়ে' বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্রহীন উপন্যাস নয়, আবার আগেকার যুগের মত ঠিক বাইরের জগতের উপন্যাসও নয়। এ বইখানি 'Inner Experience'-এর উপন্যাস, 'Stream of Consciousness'-এর সগোত্র। তাঁর উপন্যাসের অন্যতম সম্পদ তাঁর বুদ্ধিস্নাত কবিধর্ম ও তার প্রতীকধর্মী প্রকাশ। 'টু দি লাইটহাউস' উপন্যাসখানি 'মিসেস ড্যালোওয়ে'-র তুলনায় অনেক বেশি প্রতীকধর্মী। 'দি ওয়েভস্' উপন্যাসে 'interior monologue' কুশলী দক্ষতায় প্রযুক্ত হয়েছে। সমুদ্রের বুকে ঊষা থেকে রজনী অবধি কাল-পরিধিকে নয়টি প্রতীকধর্মী interlude এর

সহযোগে মূল উপন্যাসটিতে বাঁধা হয়েছে। তাঁর উপন্যাস পড়ে কিন্তু এ কথাই মনে হয় তিনি যত বড়ো artist ঠিক তত বড়ো নভেলিস্ট নন। ভিন্ন ধরনের উপন্যাস রচিত হল মহাযুদ্ধকে নিয়ে। সেদিন নৈরাশ্য ও হতাশায় তরুণ সাহিত্যিকদের মন ছেয়ে গিয়েছিল। এলিয়টের The Waste Land ও The Hollow Men তারই প্রতীক। বন্ধ্যাভূমি ও ফাঁপা মানুষের জগতে তিনি শেষে মুক্তি খুঁজলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মে। অন্যদিকে ১৯১৭-২১-এর রুষ-বিপ্লবের ফলে সাম্যবাদী চেতনার প্রসারও হয়েছিল—অডেন, স্পেণ্ডার, ইসার উড, ডে লুইসদের রচনায় সেদিন সাম্যবাদী প্রত্যয়ের ছাপ ছিল। অলডুয়াস হাক্সলি (জ. ১৮৮২) এ-কালের উল্লেখযোগ্য লেখক। তিনিও এলিয়টের মত সমকালীন রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, সাম্যবাদের নিন্দা করেছেন কিন্তু সুস্থ মানবসভ্যতার কোনো পরিকল্পনা দিতে পারেননি। তিনিও শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদর্শন ও যোগসাধনাকে বেছে নিয়েছেন 'শরণ' হিসাবে। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির জটিল সমস্যা-সমাধানের পথ ক্ষীণচক্ষু হাক্সলি দেখতে পাননি। মনন ও দৃষ্টির মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও হাক্সলির সঙ্গে শ'য়ের মিল আছে। শ' যেমন নাটককে করেছিলেন তার 'আইডিয়া' প্রকাশের বাহন তেমনি অলডুয়াস হাক্সলি করেছেন উপন্যাসকে। তাই দেখা যায় তাঁর Ends and Means, On the Margin, The Olive Tree প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে সেইগুলিই আবার Those Barren Leaves, Brave New World, After Many a Summer বা Time Must Have a Stop প্রভৃতি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য অনেকে তাঁকে ভলতেয়ার-এর সমানধর্মা বলে মনে করেন। কিন্তু ভলতেয়ারের দীপ্ত মানবিকতা হাক্সলি-র নেই। বরং তিনি তাঁর Antic Hay (১৯২৩) উপন্যাসের নায়িকা Mrs. Viveash-এর মতই 'disillusion after disillusion'-এর ঘোষণা করে

গেছেন। প্রাণস্পন্দিত মানব মানবী তিনি সৃষ্টি করেননি খুঁজেছেন ape অথবা saint কে। রবার্ট লিডেল বলেছেন যে ঔপন্যাসিককে humanist হতেই হবে। কিন্তু হাকস্‌লি humanist নন।

Point Counter Point (১৯২৮) উপন্যাসের পিছনে আঁদ্রে জিদ্‌-এর The Counterfeits-এর প্রভাব আছে। এখানে দেখা যাবে প্রত্যেকটি চরিত্র আত্মখণ্ডনের অভিশাপগ্রস্ত। সমস্যা হিসাবে যৌন প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। লরেন্স এ বই পড়ে লিখেছিলেন 'perhaps the last truth about you and your generation'। দুঃখের বিষয় হাকস্‌লি 'murder, suicide and rape' ভিন্ন এখানে জীবনের সার্থকতর পথ দেখতে পাননি।

বর্তমান পৃথিবী সম্পর্কে একদিকে তিক্ত অবিশ্বাস অপরদিকে সাম্যবাদী, যন্ত্রশিল্পসমৃদ্ধ সমাজ সম্পর্কে আতঙ্ক Brave New World (১৯৩২)-এ রূপকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। দেখিয়েছেন বিজ্ঞান জৈব প্রয়োজনের ও ভোগের, আরামের সমস্ত সুবিধা করে দিয়েছে কিন্তু বিসর্জিত হয়েছে সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, প্রেম, ব্যক্তিত্ব (তুলনীয় অরওয়েলের '১৯৮৪' উপন্যাস) হাকসলি স্পেংলারের মতই 'decline of the west'-এ বিশ্বাসী। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর সুস্পষ্ট রূপ তার Ape and Essence (১৯৪৯) গ্রন্থ।

উপন্যাসের শিল্পরীতির পূর্বাপর ঐতিহ্য তিনি বর্জন করেছেন তাঁর কাছে plot বা character-এর মূল্য নেই। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে 'intellectual novel' তিনি লিখেছেন এবং ঐ উপন্যাসগুলির বুদ্ধিবাদ, তির্যক ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ ভাষা ও ভঙ্গী আমাদের বিস্মিত করে। ইংরেজ উপন্যাসে সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ই. এম. ফরস্টর, গ্রাহাম গ্রীন, সমারসেট মম, জ্যাক লিনডসে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফরস্টরের 'A Passage to India' (১৯২৪) চমৎকার উপন্যাস, রুডিআর্ড কিপলিং-এর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদতত্ত্বের পূর্ণ প্রতিবাদ। গ্রাহাম গ্রীন চালালেন ইংরেজি উপন্যাসে 'sense of evil'। গ্রীন যেন

ইংরেজি উপন্যাসে ফ্রাসোয়া মরিয়ক। উভয়েই ক্যাথলিকপন্থী, উভয়েরই বিশ্বাস 'Corrupted Nature and Omnipotent Grace' অর্থাৎ মানুষের সহজাত পাপে ও ঐশ্বরিক করুণায়। The Power and the Glory' (১৯৪০) তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সমারসেট মম সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় লেখক। তিনি জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফের গোষ্ঠীভুক্ত নন। লরেন্স বা অলডুয়াস হাকস্লিকেও অনুসরণ করেননি। তিনি ফিলডিং থেকে হার্ডি পর্যন্ত ইংরেজি উপন্যাসের যে সমাজভিত্তিক মানবমুখী ধারা বয়ে এসেছে তারই উত্তরসাধক। তিনি উপন্যাসের সংজ্ঞাদান করতে গিয়ে লিখেছেন: The story the author has to tell should be coherent and persuasive; it should have a beginning, a middle and an end; and the end should be the natural consequence of the beginning. The episodes should have probability and should not only develop the theme, but grow out of the story. তার Of Human Bondage (১৯১৫) Painted Veil (১৯২৫) বা The Razor's Edge (১৯৪৪) উপন্যাসগুলি তাই আখ্যান, চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ এই চতুরঙ্গে মিলে যুগপৎ মহাকাব্য ও নাটকের ধর্মকে আশ্রয় করেছে। বামপন্থী চিন্তার উপন্যাসরূপে জ্যাক লিন্‌ডসের লেখা শ্রমিক-জীবনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের যুগ্ম আলেখ্য Betrayed Spring ও The Rising Tide স্মরণীয়। দুঃখের কথা আজ ইংরেজি উপন্যাস হতজ্যোতি নক্ষত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষস্রাবী প্রতিক্রিয়া, মার্কিন ডলারের ফাঁস, হরর-কমিকের ক্রমপ্রসার, কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষ বৃদ্ধি, নৈতিক মূল্যবোধ হ্রাস—মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের পতনের লক্ষণ। তাই উপন্যাসও মাথা তুলছে না।

ফরাসী উপন্যাস : জোলার পরবর্তী থেকে সাম্প্রতিক কাল

জোলার (১৮৪০-১৯০২) সমকালীন দোদে (১৮৪০-৯৭) মপাসাঁ (১৮৫০-৯৩) দুজনেই ছোটগল্প রচয়িতারূপে স্মরণীয় হলেও ঔপন্যাসিকরূপে বড়ো নন। বিংশ শতকের ফরাসী. উপন্যাস যাঁদের দানে সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে মার্সেল প্রুস্ত, জিদ, দ্যুহামেল, জুল রমাঁ, মরিয়ক, মালরো সার্ত্র, ক্যামু ও আরাগঁ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২৩)-এর উপন্যাস Remembrance of Things Past (অনেকের মতে প্রকৃত অনুবাদ হবে In Search of Lost Time) বইয়ের প্রথম পর্ব The Swann's Way (১৯১৩): প্রুস্ত-এর আত্মজীবন এর সঙ্গে মিশে আছে। আবাল্য হাঁপানি রোগী তিনি নিজেকে শব্দরোধী ঘরে আটকে রাখতেন। দিনে ঘুমিয়ে তিনি রাত্রে ঘুরতেন, পড়তেন, লিখতেন। বিত্তবান, বুদ্ধিমান, বাক্চতুর 'স্নব' প্রুস্ত অভিজাত মাহলাদের নিশীথ সালোঁয় অভ্যর্থিত হতেন, কিন্তু দিনের আলোয় সমস্যাকীর্ণ জগৎকে ও জীবনকে তিনি বিশেষ দেখেননি। তিনি বের্গসঁ-এর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার 'Lost Time'-এর সূত্রসন্ধান প্রচেষ্টা তারই পরোক্ষ ফল। প্রুস্ত-এর উপন্যাসে বক্তা মার্সেল। The Swann's Way খণ্ডে সে বর্ণনা করেছে তার পিতামহ ও পিতার জগত, তার বাল্য-কৈশোর-যৌবনস্মৃতি—'stream of consciousness' বহে গেছে তার মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রুস্তের উপন্যাসের সামাজিক ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য —কেননা, ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কাল অবধি ফরাসী বুর্জোয়া সমাজ, অভিজাত সমাজ ও হঠাৎ-ধনী মধ্যবিত্ত সমাজের একাংশের ওঠা-নামার, তাদের ক্রমরূপান্তরের ইতিবৃত্ত নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। মার্সেল বাল্যবয়সে দেখত দুটি পথ দুদিকে গেছে। একটি বুর্জোয়া Swann-এর জমিদারির দিকে অপরটি অভিজাত Guermantes-দের

পুরোনো কাসল্‌-এর দিকে। এই দুটি পথ প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের দুটি স্তরের প্রতীক। প্রুস্ত দেখিয়েছেন প্রথম মহাযুদ্ধের চাপে এই শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য, রক্ত-স্বাতন্ত্র্য ঘুচে গেছে। তাই দেখা যায় যুদ্ধের ফলে সদ্য অর্থশালিনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সালোঁ-চালিকা মাদাম ভের্দ্যুরিঁন তার স্বামীর মৃত্যুর পর নীলরক্তের অভিজাত গেমাঁর্তেজদের পরিবারে প্রবেশ করেছে। আর সোয়ান-এর পূর্বরক্ষিতা ওদেৎ অভিজাতবংশের এক ডিউককে প্রণয়ফাঁসে বেঁধে ফেলেছে।

প্রুস্তের উপন্যাসের রীতি উনবিংশ শতকের উপন্যাস-রীতি থেকে পৃথক। এ উপন্যাস একাধারে স্মৃতিকথা, দিনলিপি, তত্ত্বালোচনা, নানা চিন্তার সমাহৃত রূপ। ফরাসী উপন্যাসে এ-এক নতুন রাজ্য, যার প্রভাব পৃথিবীর সবদেশে পড়েছে।

জিদ (১৮৬৯-১৯৫১)-এর উপন্যাসে তাঁর ব্যক্তিজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তিজীবনে জিদ তার পরিবারের প্রোটেস্‌টাণ্ট-পিউরিটান নীতিবাদ থেকে মুক্তি খুঁজেছেন তাই তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল love-hate সম্পর্ক। তাঁর নিজের নিকট-আত্মীয়া মাদেলিন-কে তিনি বিবাহ করেছিলেন কিন্তু মাদেলিন তাঁর মায়েরই ধর্মাবলম্বিনী হওয়ায় তিনি যৌনবিকারগ্রস্ত হয়ে যান। এই সময়ে ১৯০২-এ তাঁর The Immoralist উপন্যাস বার হয়। জিদের নিজের ব্যর্থবিবাহ ও যৌনজীবনের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর Strait is the Gateও ব্যক্তিজীবনাশ্রিত। জেরোম ও অ্যালিসা প্রকৃতপক্ষে জিদ ও মাদেলিনের প্রচ্ছন্ন রূপ। The Counterfeiters (১৯২৫) পৃথক ধরনের উপন্যাস। এখানে জিদ সমাজের সর্বস্তরে 'মেকি' র ব্যবহার দেখেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে তাঁর উপর ইংরেজ দার্শনিক কবি ব্লেকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেজন্যই তিনি 'মেকি' ও 'খাঁটি' সততার স্বরূপ বিশ্লেষণে ব্রতী হন। জাল মুদ্রা চালাবার একটি পুরোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে জিদ দেখালেন সমাজের সর্বস্তরে জালিয়াতি চলছে, শিক্ষায়,

সাহিত্যসৃষ্টিতে, প্রেমে, ধর্মে। জিদের শেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'থিসিউস' তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত হয়। গ্রীক পুরাণের কাহিনীকে তিনি নতুন যুগের মত করে পরিবেষণ করেছেন। তাঁর থিসিউস রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য হীন, নৃশংস কার্য থেকে বিরত হয়নি। প্রেম তার কাছে খেলামাত্র, নারী সুখসম্ভোগের আধার। থিসিউস উপন্যাসে জিদের সাম্যবাদী রাষ্ট্রশাসনবিরোধিতা স্পষ্ট। এই 'কনফেসন'-ধর্মী আখ্যানটি থিসিউসের মুখ দিয়ে বিবৃত হয়েছে। জিদের থিসিউসের শেষে থিবস থেকে বিতাড়িত সংসারত্যাগী প্রজ্ঞাবান ঈডিপাসের সঙ্গে দেখা হল। তখন তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পেয়েছেন কিন্তু জিদের থিসিউস ঈডিপাসকে বলল, আমার পথ ভিন্ন। "I remain a child of this earth and believe that man, whatever he may be like and however tainted you consider him, should make the best of the cards he holds."—জিদের জীবনদর্শন এখানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

জিদ নিজেকে মালার্মে বা মেতারলিংকের সমান বলে ঘোষণা করলেও, ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি উঁচুদরের নন। তবে উপন্যাসের বক্তব্যে, ভাষায় ও আঙ্গিকে তিনি নতুনত্ব এনেছেন একথা স্বীকার্য। তিনি বালজাক-জোলার জগৎ পরিত্যাগ করেছেন, নতুন পথের সন্ধান করেছেন। তাঁর নায়কেরা তাঁরই মত বিত্তবান ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের লোক। তাঁরই মত তারাও অহংকেন্দ্রিক বিদ্রোহী। তাদের বিদ্রোহের পরিণতি নৈরাশ্য, হত্যা বা আত্মহত্যা। বুর্জোয়া সমাজের একাংশের অবক্ষয়ী রূপ তার উপন্যাসে ধরা পড়েছে।

মরিয়ক (জন্ম ১৮৮৫)-এর রচনার রীতি ও বিষয়বস্তু প্রসৃত ও জিদ থেকে পৃথক। তবে জিদ-এর সঙ্গে একটি জায়গায় তাঁর মিল। জিদ-এর প্রটেসটাণ্ট-পিউরিটান ধর্মানুশাসন থেকে অহংমুখী নিষ্ক্রমণ-প্রয়াস ও দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে সুস্পষ্ট। মরিয়ক কাথলিক ধর্মের

জ্যানসেনিস্ট শাখাভুক্ত। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে সেই মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। জ্যানসেনিস্টরা প্রত্যেকটি মানুষের আদিম জন্মগত পাপে স্থিরবিশ্বাসী। তাই তাকে 'sinner' হতেই হবে এবং পাপ-প্রবৃত্তি ও পাপাচারের ফলে তার পতন (Fall) অনিবার্য। অথচ তার মুক্তি (Salvation) তার নিজের চেষ্টায় ঘটবে না। শেষ পর্যন্ত তার শান্তি আসবে ঈশ্বরের (Grace) অযাচিত করুণা ধারায়। তাই মরিয়ক-এর উপন্যাসগুলিতে সর্বত্রই একটি নিরীহ, শান্ত, 'প্রধান' চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়, যে-সর্বদাই উৎপীড়িত 'Victim', সেই খ্রীষ্টীয় 'Lamb'-এর প্রতীক। তিনি নিজে লিখেছেন:

> "I am a metaphysician who works in the concrete. Thanks to a certain gift of atmosphere I try to make perceptible, tangible and odorous the Catholic Universe of evil. I make incarnate that sinner of whom the theologians give an abstract idea."

এক দিকে এই 'পাপ সম্ভব' জ্যানসেনিস্ট ধর্ম অপর দিকে তাঁর পরিচিত সমকালীন বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত সমাজের আচরিত ও পোষিত 'আদর্শ' সম্পর্কে অবজ্ঞা ও বিদ্রোহ—তাঁর উপন্যাসে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। তাঁর A Kiss for the Leper, The Desert of Love, The Enemy, Therese উপন্যাসগুলি পূর্বালোচিত মন্তব্যের সাক্ষ্য। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি জিদ্-এর চেয়ে অনেক বড়ো 'creative artist'। নিপুণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং ফরাসী নাট্যকার র‍্যোসিনকল্প কুশলী নাট্যরীতির প্রয়োগ তাঁর রচনাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। কিন্তু তবুও, যেহেতু তিনি অ্যাকুইনাস-এর শিষ্য না হয়ে প্যাস্কাল-এর একলব্য, তাই তাঁর রচনায় অন্যান্য ক্যাথলিক ঔপন্যাসিকদের মত হিংসা, রিরংসা ও পাপ পূর্ণরূপে দেখা দিয়েছে।

মরিয়ক শক্তিশালী শিল্পী কিন্তু অবক্ষয়ের শিল্পী, সবুজ প্রাণের

সন্ধানী মন। জিদ ও মরিয়কের উপন্যাসে দেখা যায় ঔপন্যাসিকেরা 'দার্শনিক' হয়ে উঠেছেন এবং নিজেদের পোষিত দর্শনের আলোকে উপন্যাসকে গড়েছেন। সার্ত্র্‌র, ক্যামুর রচনাও একই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেজন্যই এঁদের উপন্যাস অনেক বেশি বুদ্ধিধর্মী ও অহংমুখী। বালজাক, ফ্লোব্যার বা জোলার মত দিগন্ত-ছড়ানো জীবনের ইন্দ্রধনুচ্ছটা নেই, বাস্তবধর্মী সমস্যা নেই। অনেক বেশি সংশয় ও আত্মজিজ্ঞাসা এ-যুগের উপন্যাসে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আরেক দিকে ছিলেন রম্যাঁ রলাঁ, জ্যুল রম্যাঁ, দ্যুহামেল। তাঁরা সমাজমুখী ধারার শিল্পী। তাঁদের রচনায় বলিষ্ঠ মানবিকতা ও প্রগতিশীল ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা বালজাক, ফ্লোব্যার, জোলার ধারাকে বহন করেছেন। রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৮-১৯৪৪) ঔপন্যাসিকরূপে তত যশস্বী হননি, যত হয়েছেন ঋষিকল্প মানুষরূপে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ চিরদিন ধ্বনিত হয়েছে। তিনি তাঁর প্রসারিত চিত্তে লেনিন, তলস্তয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন। বিটোভেন ও মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতি তাঁর শিল্পী মনের শ্রদ্ধা তিনি রেখে গেছেন তাঁদের চরিতগ্রন্থে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস জঁা ক্রিসতফ্‌ (১৯০৪-১২) প্রকৃতপক্ষে এক মহৎ মহাকাব্য। সুরশিল্পী ও জীবনরসিক ক্রিস্‌তফ্‌ তাঁর মধ্যে বহন করে চলেছেন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে নবপ্রভাতের স্বপ্ন— 'I am the day to be born.' এই উপন্যাসের ক্রমানুসরণ চলেছে 'The Soul Enchanted'-এ (১৯২২-৩০)। জ্যুল রম্যাঁ এবং দ্যুহামেল আত্মকেন্দ্রিক মনোবিশ্লেষণের পরিবর্তে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ইতিবৃত্ত রচনায় বিশ্বাসী। উনবিংশ শতকের মানবিক মূল্যবোধকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন। জ্যুল রম্যাঁর প্রত্যয় ঐশ্বরিক বিধানে নয়, কল্যাণকামী সমাজবাদে। তাই সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা ও মতবাদকে তিনি পরিহার করেননি, ব্যবহার করেছেন। তিনি humanist, তাই পরিষ্কার গলায়

বলেছেন যে তাঁর উপন্যাসে 'political and social preoccupations' স্থান পেয়েছে কেননা 'since political and social anguish has been our daily fare.' বালজাক-জোলার অনুসরণে তিনি সাতাশ খণ্ডে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'The Men of Good Will'. এই উপন্যাসে ফ্রান্সের ১৯০৮-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৩এর অক্টোবর পর্যন্ত সমগ্র যুগেতিহাস চিত্রিত হয়েছে। এ-কোনও ব্যক্তি বা 'নায়ক'-এর ইতিহাস নয়, একটি যুগ ও জাতির ইতিবৃত্ত, Brave New World-এর স্বপ্নদর্শন।

দ্যুহামেলও (জ. ১৮৮৪-) এই ধরনের 'chronicle novel' রচনার প্রয়াস করেছেন। 'Salavin' তাঁর বিখ্যাত রচনা। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক অবধি যুগ তাঁর বিবৃত আখ্যানের পটভূমি। তিনি জুল রমাঁ্যার মত একই 'পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণীজাত এবং এই শ্রেণীই ফ্রান্সের তৃতীয় রিপাবলিকের যুগে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়েছিল। এই শ্রেণীর সবলতা-দুর্বলতা সবই তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তাঁর উপন্যাস পড়তে পড়তে গলস্‌ওয়ার্দির কথা মনে হয়।

মাল্‌রো (জ. ১৯০১-) এঁদের পরবর্তী এবং তাঁর উপন্যাসের পটভূমি সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনায় আকীর্ণ। তাঁর উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপন্যাস, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি যে ক্রমশঃ একসূত্রে গাঁথা হচ্ছে মাল্‌রোর উপন্যাস তারই সাক্ষ্য। প্রুস্ত, মরিয়াক, জিদ থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে চীনা সাম্যবাদী বিপ্লব (১৯২৬) স্পেনীয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধ (১৯৩৬) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ফরাসী (১৯৩৯-৪৫) বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধী লড়ায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে ফরাসী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তা ও চেতনা স্থান লাভ করে। মাল্‌রো-র চীনা

সাম্যবাদী বিপ্লবের পট-ভূমিকায় রচিত The Conquerors (১৯২৮) Storm in Shanghai (১৯৩৩) এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধের পট-ভূমিকায় রচিত Man's Hope (১৯৩৭) রাজনৈতিক উপন্যাস হলেও মানবিক জীবনবোধ সেখানে অনুপস্থিত নয়। মাল্‌রোর উপন্যাস নতুন ধরনের উপন্যাস, তার সঙ্গে সাংবাদিকতায় যোগ আছে সত্য কিন্তু সেই সাংবাদিকতাই 'শিল্প', যা শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকে। মাল্‌রোর উপন্যাস আত্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহ বা ক্যাথলিক পাপবোধের পরিবর্তে মানুষের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। জঁা পল সার্ত্র (জ. ১৯০৫-) উপন্যাসে সামাজিক দায়িত্বকে স্বীকার করেছেন। শিল্পীর কর্তব্য হিসাবে তিনি ফ্যাসিজম্‌-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এবং ফ্লোব্যার ও গকুঁরেরা জাতীয় দুর্যোগের দিনে অত্যাচারের প্রতিবাদ করেননি বলে তাঁদের নিন্দা করেছেন। সার্ত্র কিন্তু নাট্যকার ও Existentialism এর প্রবক্তারূপেই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু ঔপন্যাসিকরূপেও সার্ত্র-এর স্থান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফল তাঁর Roads to Freedom উপন্যাস। এই সুবৃহৎ উপন্যাস এখনও শেষ হয়নি। এর প্রথম খণ্ড Age of Reason ১৯৪৫-এ বার হয়। হিটলার-এর কাছে ইঙ্গ-ফরাসী গোষ্ঠীর আত্মবিক্রয় ঘটে মিউনিক চুক্তিতে। তার অব্যবহিত পূর্বের ফরাসী জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই খণ্ডের বক্তব্য। মিউনিক চুক্তির পরবর্তী পর্ব বর্ণিত হয়েছে The Reprieve-এ। ১৯৪০-এ আকস্মিক নাৎসী আক্রমণে ম্যাজিনো লাইনের পতন এবং ফরাসী স্বাধীনতার সূর্যাস্ত বর্ণিত হয়েছে Troubled Sleepএ (১৯৪৯)। (এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইলিয়া ইরেনবুর্গের লেখা বৃহৎ উপন্যাস Fall of Paris—যেখানে Popular Frontএর ব্যর্থতা দেখানো হয়েছে।) এ উপন্যাসকে রাজনৈতিক বা ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস বললে চলবে না। রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে গভীর মনন ও চিন্তার, রাজনৈতিক মতবাদ বিশ্লেষণের যে পরিচয় পাই তার দ্বারা আমরা যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত।

ক্যামুর (১৯১৩-১৯৬০) দান ফরাসী সাহিত্যে স্মরণীয়। কামু প্রথম জীবনে নেতিবাদী 'অস্তিত্ববাদ'-এ বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাঁর 'The Outsider' উপন্যাসে দেখা যায় কোনও সুস্থ জীবনবোধ নেই, নারীসম্ভোগ, গুলি, হত্যার পালা। নায়ক প্রকৃতপক্ষে জীবন থেকে পলাতক একজন 'outsider'। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্যামু অন্যান্য প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রতিরোধবাহিনীভুক্ত হয়ে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন এবং এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিনি নেতিমূলক অস্তিত্ববাদ থেকে সরে এলেন অর্থময় অস্তিত্ববাদে। তাঁর The Plague উপন্যাসখানি জর্মান-অবরোধ পর্বে লেখা হয়। প্লেগাক্রান্ত নগরী ফ্যাসিস্টবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ ফ্রান্সের রূপক। সেই প্লেগাক্রান্ত নগরীতে Dr. Rieux (যিনি উপন্যাসে আখ্যানের বর্ণনাকারী) বললেন : "What interests me is to live and die because of what one loves." তাই আমরা শুনি : "There is more to admire than to despise in man."

ক্যামুর পরবর্তী রচনা 'The Fall' আত্মকথনের রীতি-আশ্রয়ী। এর সঙ্গে দস্তয়েভসকির Notes from the Underground-এর সাদৃশ্য আছে। Jean Baptise Clamence প্যারীর খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী। বিধবা ও অনাথদের পক্ষ নিয়ে তিনি অনেক লড়েছেন। উদারমনা ও সর্বতোভদ্ররূপে তিনি খ্যাতিমান। তিনি মনে করে এসেছেন যে জ্ঞানতঃ কোনও অন্যায় তিনি করেননি, তিনি নিষ্পাপ। হঠাৎ একদিন সীন্ নদীর সেতু পার হবার সময় তিনি তাঁর পিছনে একটি ব্যঙ্গোক্তি শুনলেন। তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ ? বিবেকের হাসি ক্লামেঁসোকে যেন তাড়া করে ফিরতে লাগল। সেই তাঁর fall-এর শুরু। মনে পড়ল তিন বছর আগে একটি ডুবন্ত স্ত্রীলোককে তিনি জল থেকে তুলবার চেষ্টা করেননি। এ ঘটনা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন কিন্তু এবার নিজের জীবনের পৃষ্ঠা উলটে দেখতে লাগলেন নতুন দৃষ্টিতে। ক্রমে ক্রমে তাঁর মনে

নিজের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে জাগল ঘৃণা। তাঁর মনে হল তাঁর ঐ সব দয়া, উদারতা, ভালোবাসা সবই ফাঁকির ভিতে গড়া— তার মধ্যে ছিল উপরে উঠবার স্বার্থসিদ্ধি। এই নিদারুণ আত্মানুশোচনায় তিনি কি ভগবদ্ করুণার স্পর্শ পেলেন?

ক্যামু তাঁর L'Homme revolte প্রবন্ধে লিখেছেন মানুষ মূলত 'পাপী' নয় আবার সে পুরোপুরি 'নিষ্পাপ'ও নয়। তাঁর মতে 'Those who go beyond it and affirm there total innocence end in the fury of definite' ক্লামেঁসো এই ভুল করেছিলেন।

ক্যামুর আলোচিত তিনখানি উপন্যাস তিনটি স্বতন্ত্র রীতির। বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখা যায় ক্যামু নেতিমূলক অস্তিবাদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং মানবিক মূল্যবোধের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। The Fall-কে উপন্যাস বলা কঠিন। কিন্তু দার্শনিকতাই তো এ যুগের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

আরাগঁ (জ. ১৮৯৭) মূলত কবি। তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে বাস্তবতাবিরোধী, আত্মকেন্দ্রিক, বুদ্ধিবিলাসী Dadaist ও Sur realist গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৩০এ তিনি মার্কসবাদী হন। পরা-বাস্তব (Sur-realist) জগতের পরিবর্তে এবার ঐতিহাসিক বাস্তবতার জগতে তিনি প্রবেশ করলেন ও রচনা করলেন জ্যুল রম্যাঁ ও দ্যুহামেলের মত period novel—উনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তাদের সময় সীমা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় তিনি রচনা করেছেন The Communists উপন্যাস। ঐতিহাসিক দৃষ্টি, রাজনৈতিক চেতনা ও তার সঙ্গে কবিধর্মের যোগে এই উপন্যাসখানি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আরাগঁ ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী। তাঁর The Century Was Young (১৯৪২) উপন্যাসে এই শ্রেণীসংঘাত উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু উপন্যাসের ধর্ম হারায়নি।

ফরাসী উপন্যাস এই শতকে মার্তিন দ্যু গর, স্যাঁৎ একস্যুপেরি, আলিঁ ফুর্ণিয়ে প্রভৃতির লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই আজ ফ্রাসোয়া সাগেঁর বইয়ের যত কাটতিই হোক আশা করি সে-দৌর্বল্য কাটিয়ে উঠবে ফরাসী উপন্যাস।

বিংশ শতক : রুষ উপন্যাস

বিংশ শতকের রুষ উপন্যাসের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক পটভূমি অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। উনবিংশ শতকে পুশকিন, গোগল, তুর্গেনেভ, দস্তয়েভস্‌কি, তলস্তয় যে ঐশ্বর্যময় যুগ রচনা করেছেন বিংশ শতকের রুষ উপন্যাস তার ঐতিহ্যানুসারী হয়েও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। ১৯০৫-এর রুষ-জাপান যুদ্ধ, রুষিয়ার পরাজয়, জার-বিরোধী গণবিপ্লবের আপাত ব্যর্থতা, ১৯১৪এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ, ১৯১৭এর গণবিপ্লবের সার্থকতা এবং পরে মেনশেভিক ও বলশেভিকদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও শেষে ১৯২১এ লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদলের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগঠন এ-যুগের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। তারপর থেকে রুষদেশের জনসাধারণ বুর্জোয়া বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে নিজেদের জীবন ও চিন্তাকে পরিচালিত করেছে। ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে জাতীয় সম্পদ এখন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যৌথসমবায়ের ভিত্তিতে বণ্টিত হচ্ছে। সেখানে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীশোষণ বিলুপ্ত, বিভিন্ন অনুন্নত জাতিগুলির 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশা ধ্বনিত, স্ত্রী-পুরুষের সমান অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে—অজ্ঞানতার অন্ধকার জ্ঞান-বিদ্যুতে অপসৃত হয়েছে।

আমরা দেখেছি রুষ উপন্যাস চিরদিনই বাস্তবতাধর্মী এবং 'rooted to the soil' এবং এই মৃত্তিকা-আসক্তি হেতু দেখা যায় যে-সব সাহিত্যিক রুষ গণবিপ্লবের পর স্বদেশ ত্যাগ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা এই মৃত্তিকা-চ্যুতির জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ

উনবিংশ শতকের সকল ঔপন্যাসিক দেশবাসীর উপর জারতন্ত্রের অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন, উপন্যাসে তাকে প্রতিফলিত করেছেন, কারাবরণ বা নির্বাসন স্বীকার করেছেন। তাঁদের উপন্যাসে সেজন্য শিল্প ও 'উদ্দেশ্য' এমনভাবে জীবনায়িত হয়েছে যা অন্য দেশের উপন্যাসে দেখা যায়নি। .বিংশ শতকেও তার ঐতিহ্য হারিয়ে যায় নি। ১৯১৭এ দ্বিতীয় নিকোলাস-এর রাজ্যকাল (১৮৯৪-১৯১৭) বিপ্লবের আগুনে ছাই হয়ে গেল, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত শুধু যে রাজনৈতিক কর্মীরা সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত বা কারারুদ্ধ অথবা নিহত হয়েছেন তাই নয়—সাহিত্যিকেরাও লাঞ্ছনা বরণ করেছেন।

বিংশ শতকের রুষ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ম্যাকসিম গোর্কি, আইভান বুনিন, কুপরিন্, মিখেইল শোলোকভ, অ্যালেকসাই তলস্তয়, অস্ত্রোভসকি, গোরবাটভ ও ইলিয়া ইরেনবুর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ম্যাকসিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) 'গোর্কি' শব্দটি তাঁর ছদ্মনাম। বাল্যকাল থেকে তিনি জীবনের পেয়ালায় অমৃত নয়, তিক্তরস পান করেছিলেন তাই লেখক-নামে আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে বসিয়ে দিলেন 'গোর্কি'। গোর্কি অবশ্য ছোটগল্প ও নাটক রচয়িতা রূপে বেশি পরিচিত তাঁর Twenty-six Men and a Girl, A Man Is Born বা Malva গল্প এবং Lower Depths নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অকুণ্ঠ 'সংস্কার' মুক্ত বাস্তবধর্মিতা, উপেক্ষিত নরনারীর বিশ্বস্ত জীবন চিত্রাঙ্কন, নির্ভীক কণ্ঠ ও মানুষের অধিকারে অটল আস্থা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম বার হয় Foma Gordeyev (১৮৯৯)। তারপর বার হতে থাকে Three of Them (১৯০১), The Mother (১৯০৭), A Confession (১৯০৮) প্রভৃতি বই। এগুলি সবই ১৯১৭-এর সফল বিপ্লবের পূর্বে লেখা—এরাই বিপ্লবের পটভূমি রচনা করতে সাহায্য করেছে। গোর্কির "মা" উপন্যাস ত বিশ্ববন্দিত। বিপ্লবোত্তর যুগে গোর্কি

চিরদিনই বিপ্লবের বন্ধু ছিলেন। পশ্চিমী Formalism বা রীতি সর্বস্বতাকে বর্জন করে Socialist Realism বা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' অনুসরণই যে শিল্পীর কর্তব্য সে কথা গোর্কিই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সোভিয়েট-পর্বে গোর্কি আবার উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত The Artamonov Business (১৯২৫)।

আইভান বুনিন (১৮৭০-১৯৫৩) উনবিংশ শতকের শেষ দশকে গোর্কির সঙ্গে পরিচিত হন এবং গোর্কির পরিচালিত Znanie পত্রিকায় দশ বছর ধরে নিয়মিত লেখেন। কিন্তু গোর্কির সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল, বুনিন ঝুঁকেছিলেন 'ন্যাচারালিজম'-এর দিকে এবং গোর্কির বৈপ্লবিক চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। (সেজন্যই যখন বিপ্লব এল ১৯১৭-এ, বুনিন ১৯১৮-এ দেশত্যাগ করে চলে গেলেন এবং বিদেশে থেকে চিরদিনই সোভিয়েট ইউনিয়নের শত্রুতা করেছেন।) অনেকে বুনিনকে তুর্গেনেভ-এর উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন। কিন্তু সে ভ্রান্তি মাত্র। জমিদার বংশের সন্তান দুজনেই, দুজনের রচনায় গীতিকবিতার পুষ্পিত স্পর্শ। কিন্তু তুর্গেনেভের চোখে ছিল বিপ্লবের স্বপ্ন আর বুনিনের চোখে ছিল তার দুঃস্বপ্ন। তুর্গেনেভের জীবনধর্মিতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টি বুনিনের মধ্যে নেই। বুনিনের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'দি ভিলেজ' (১৯১০) রুষিয়ার গ্রামাঞ্চলের চাষী ও স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ীদের দারিদ্র, অজ্ঞতা ও বর্বরতার অতি রূঢ় চিত্র। 'ন্যাচারালিজম'-এর যে-শক্তি জীবনবিমুখ হয়েও বর্ণনার বিস্ময়কর চমৎকারিত্বে পাঠককে চকিত করে তোলে 'দি ভিলেজ' উপন্যাসে তাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু উপন্যাসখানি তীব্র নৈরাশ্যের খাদে সমাপ্ত। বুনিনের 'ড্রাই ভ্যালি' (১৯১১) সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন খ্রুশ্চভ-পরিবারের ক্রম-ধ্বংসের, দারিদ্রের এক করুণ কাহিনী। বুনিনের The Gentleman from San Francisco (১৯১৫) ঠিক উপন্যাস না হলেও উল্লেখযোগ্য গল্প। তলস্তয়ের The Death of Ivan

Ilyich (১৮৮৬)-এর ধারার গল্প। একজন আমেরিকান কোটিপতি সারা জীবন অর্থ সঞ্চয় করে জীবনের শেষে জীবনকে 'উপভোগ' করতে চেয়েছে কিন্তু নিয়তির পরিহাসে 'ক্যাপ্রি' দ্বীপে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। এই 'irony of death'ই গল্পটির বৈশিষ্ট্য। বিদেশে গিয়ে বুনিন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কিছু রচনা করেননি। সহানুভূতিহীন, জীবনবিমুখ অথচ শক্তিশালী এই শিল্পী বিপ্লব-পূর্ব রুষিয়ার দরিদ্র, হিংস্র ও মূঢ় 'মুঝিক'দের যে ছবি এঁকে গেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

কুপ্রিন (১৮৭০-১৯৩৮) বিচিত্র বৃত্তির জীবন যাপন করেছেন, সেখানে গোর্কির সঙ্গে তাঁর কিছু মিল আছে। সৈনিক, গায়ক, অভিনেতা, ডাক্তার, মজুর, সাংবাদিক—এবং শেষে ঔপন্যাসিক কুপ্রিন তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বহুলাংশে তার উপন্যাসে ভরে দিয়েছেন। কুপ্রিন গোর্কির Znanie পত্রিকায় বাস্তবধর্মী গল্প লিখতে থাকেন। তলস্তয় তাঁর সম্পর্কে একবার বলেছিলেন: "Kuprin is the only man of the rising generation who writes with truth and sincerity." তার প্রথম উপন্যাস 'The Duel' সৈনিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত, সমকালীন সৈনিক জীবনের কুশ্রীতা ও ব্যর্থতা ভাবপ্রবণ দৃষ্টিতে বর্ণিত। ১৯০৫-এর রুষ-জাপান যুদ্ধে রুষের পরাজয়ের পর এই উপন্যাস খুব বিক্রী হয়েছিল। কুপ্রিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় বই Yama The Pit (১৯০৯-১৫)। ওডেসার গণিকাপল্লীর জীবনের 'বাস্তব' বর্ণনা। গোর্কির গল্প ও নাটকে চোর, ভবঘুরে, মাতাল, গণিকা সবই এসেছে। কিন্তু গোর্কির জীবনের অভিজ্ঞতা, সুতীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টি ও মানবিক প্রগতিশীল দৃষ্টি তাঁর রচনাগুলিকে যে-মূল্য দান করেছে কুপ্রিনে তা নেই। একথা সত্য কুপ্রিন গোর্কির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তলস্তয়ের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতি গভীর কোন দৃষ্টি ছিল না, ঐতিহাসিক চেতনা ছিলনা। তাই তিনি জ্যাক লণ্ডনের মত রোমাঞ্চকর রচনা পদ্ধতিকে অনুকরণ

করেছেন, গোর্কিকে করেন নি। Yama the Pit অবশ্য বিপ্লবপূর্ব জারতন্ত্রী যুগের সমাজের এক দুষ্ট ক্ষত উদঘাটন করেছে কিন্তু প্রত্যয়হীন শিল্পীর অনিবার্য ব্যর্থতায় তাঁর উপন্যাস বরণীয় হতে পারেনি। বিপ্লবের শুরুতে কুপ্রিন বুনিনের মত দেশ ত্যাগ করলেন কিন্তু ১৯৩৬এ আবার ফিরে গেলেন তাঁর পিতৃভূমিতে—সব দেখলেন, নব-ব্যবস্থায় খুশি হলেন, কিন্তু তখন তিনি ক্যানসারাক্রান্ত। নতুন রুষিয়ার রূপদান তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না।

বিপ্লবের সময়ে ও বিপ্লবোত্তর যুগের প্রথম পর্বে স্বভাবতই Art বা শিল্পকে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার বা বিপ্লবের অগ্নিক্ষর মশালরূপে স্বীকার করা হয়েছিল। বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, বুদ্ধিজীবীদের সংশয়, অর্থনৈতিক সংকট, সবমিলে সেদিন সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে সেই দারুণ সঙ্কটের সমাধান হয়। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হল মার্কসবাদ। মার্কসবাদী অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে নব মূল্যায়ন অবশ্যম্ভাবী। নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদে সাহিত্যের রূপবদল স্বাভাবিক। সেই রদ-বদলের দিনে যা কিছু প্রাচীন তাকে 'বুর্জোয়া' বলে বর্জন করবার অত্যুৎসাহ তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। লেনিন কিন্তু বলেছিলেন যে পুশ্‌কিন, নেক্রাসভ্‌কে বুঝলে তবেই মায়াকভস্‌কিকে বোঝা যায়। তিনি Prolet-cult-এর অত্যুৎসাহকে সমর্থন করেন নি। রুষ উপন্যাসকে এই পর্বে ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি, ফরাসী বা আমেরিকান উপন্যাস থেকে পৃথক হতেই হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের তীব্র, তিক্ত হতাশা ও নৈরাশ্য সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের কখনও ধর্মের দিকে বা যৌনতত্ত্বে, আত্মকেন্দ্রিক চেতনা প্রবাহে কিংবা পাপবোধে ঠেলে দিয়েছে। সে-উপন্যাসের সঙ্গে বিপ্লবজাত রুষিয়ার সমাজবাদী উপন্যাস মিলবে না। একদিকে আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিগামী অহংবাদ, অন্যদিকে জনারণ্যে অহংএর বিলোপ। নতুন রুষিয়ার সাহিত্যে অনিবার্য ভাবে

রাজনীতি, ইতিহাস ও মানবজীবন মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। এই পর্বে স্মরণীয় সৃষ্টি মিখেইল শোলোকভ-এর And Quiet Flows the Don (১৯২৮), Don Flows on Back to Sea এবং Virgin Soil Upturned. যথার্থ শক্তিশালী এই লেখকের হাতে 'ডন্' কাহিনী বিপ্লব-যুগের কসাক-জীবনের ও সমকালীন রুষিয়ার মহাকাব্যের রূপ ধরেছে। Virgin Soil Upturned (১৯৩২-৩৩) উপন্যাসে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যুগের যৌথ খামার পরিকল্পনা প্রশংসনীয় শিল্পরূপ লাভ করেছে।

অ্যালেকসাই তলস্তয় (১৮৮৩-১৯৪৫) লিও তলস্তয়ের শুধু গোত্রজ নন তিনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর অনুগ। যদিচ তিনি প্রথমে বলশেভিকদের অবিরোধী ছিলেন না, কিন্তু শেষে তাঁর মতের পরিবর্তন হয় এবং ১৯২৩এ তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রে ফিরে আসেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ত্রিপর্বিক উপন্যাস Ordeal (অন্য অনুবাদে Road to Calvary ; Way Through Hell)। প্রথম মহাযুদ্ধ, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রুষদেশের নরনারীর জীবনেতিহাস যে-ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তার মহাকাব্যিক পরিচয় এই উপন্যাসে বিধৃত। তলস্তয়ের ধারায় তিনি তাঁর এই উপন্যাস রচনা করেছেন সেখানে অগ্নিপুচ্ছ ইতিহাসের আলোকে নরনারী জীবনের ইতিহাস ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বর্ণনাধর্মী, ইতিহাসাশ্রিত, জীবনস্পন্দিত উপন্যাস রচনাই রুষ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য শোলোকভের উপন্যাসে, ইলিয়া ইরেনবুর্গের 'প্যারীর পতন'-এ। অ্যালেকসাই তলস্তয়ের অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস Peter I (১৯২৯-৪৫) তাঁর ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও শিল্পবোধের স্বাক্ষর।

বোরিস গরবোটভ (১৯০৮-৫৪)-এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জর্মান অবরোধ ও রুষপ্রতিরোধের কাহিনী The Unvanquished স্মরণ করিয়ে দেয় গোগলের বিখ্যাত উপন্যাস Taras Bulba. এ-পর্বের আরেকজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক অস্ত্রোভস্কি (১৯০৪-৩৬)। তাঁর 'How the Steel was Tempered' (অন্য অনুবাদে

নাম: 'The Making of a Hero') খুব জনপ্রিয় উপন্যাস। দরিদ্রের সন্তান প্যাভেল কোর্চাগিন কিভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন মানুষে, নতুন জীবনাদর্শে রূপান্তরিত হল তার এক বিশ্বস্ত কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। প্যানোভা-র (১৯০৫) 'The Train' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা চমৎকার উপন্যাস। যুদ্ধ রুষিয়ার জীবনে জলপ্রপাতের মত, অগ্নিবর্ষী প্রলয়ের মত এসেছিল। কাজেই যুদ্ধ তাদের জীবনে বাইরের কিছু নয়—কাজেই যুদ্ধ ও মরণপণ প্রতিরোধের কাহিনী তাদের উপন্যাসে মুখ্য স্থান পাবেই। সেখানকার যুদ্ধে শত শত সাহিত্যিকও যোগ দিয়েছে, প্রাণও দিয়েছে। তাই এ-পর্বে যুদ্ধই তার সাহিত্য। ইলিয়া ইরেনবুর্গের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যিক মাল্‌রোর কিছু সাদৃশ্য আছে। উভয়েই সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও শিল্পী। উভয়ের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা প্রখর। ইরেনবুর্গের বিস্ময়কর প্রচেষ্টা The Fall of Paris (১৯৪১)। ১৯৩৫-৪০ কাল পর্বে ফরাসী 'বুর্জোয়া' সমাজের 'তথাকথিত' গণতান্ত্রিক নীতি, নাৎসী বিরোধী 'পপুলার ফ্রন্ট' গঠন ও ব্যর্থতা, অভিজাত সমাজে অবক্ষয়ের চোরাবালি, নিষ্ঠাবান সততার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে অথচ গল্পের রস কোথাও হারায়নি, চরিত্রগুলি নিষ্প্রভ হয়নি। ইরেনবুর্গ দীর্ঘকাল ফ্রান্সে বাস করেছেন, তাঁর সাংবাদিক-রাজনীতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি ফরাসা রাজনৈতিক ইতিহাসের ফাঁকি ধরতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৩৫-৪০ যুগের এক অমর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্যারীর পতন'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ইরেনবুর্গ লেখেন 'The Storm' বা ঝড় (১৯৪৮)। রুষ উপন্যাসের সঙ্গে সাম্প্রতিক পশ্চিম ইউরোপের উপন্যাসের পার্থক্য মৌলিক। এখানে উপন্যাস নতুন পথে যাত্রা করেছে। তার 'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন' বিভাব সমাজতান্ত্রিক দেশ ও তার নতুন মানুষ।

বিংশ শতক : বাংলা উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন 'চোখের বালি' নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বার হল 'চোখের বালি'। বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক, সমস্যাজটিল ও বাস্তবপন্থী উপন্যাসের পথপ্রদর্শক 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'চোখের বালি'র বক্তব্যে ও গঠনে ঐ উপন্যাস দুখানির প্রভাব সুস্পষ্ট। কারণ বাংলা উপন্যাসে জটিলতাধর্মী বা complex প্লট বঙ্কিমই গড়েছেন। Form বা Structureএর জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিব্রত হতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র ভূমিকায় লিখেছেন :

> 'সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালিতে'।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের পথ অনুসরণ করেও মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রকে রূপগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে প্রসারিত করেছেন। বিনোদিনীর তীর্থযাত্রা সে যুগের রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র এই উপসংহার নিয়ে উত্তরকালে ক্ষোভ করেছেন, কিন্তু তিনি ভিন্ন-রবীন্দ্রনাথ, পরের যুগের রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র গ্রন্থনে শিথিলতা আছে, গল্পের ঘটনাগুলি 'convincing' হয়নি। কমলার শেষাংশকে প্রগতিশীল সমালোচকেরা স্বীকার করতে নারাজ হয়েছেন কিন্তু ১৯০৩-০৫এর রবীন্দ্রনাথ ঐ 'সংস্কার'কে সত্য বলেই জেনেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> 'এ সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।'

নৌকাডুবির কমলা হয়ত 'প্রগতিশীল' নয় কিন্তু সাহিত্যে সে 'রিয়াল'। ১৯০৯-এ 'গোরা' রচনা শেষ হয়। কাহিনী বিন্যাসে, গঠনে, ভাষায় তখনও তিনি বঙ্কিম যুগবর্তী, কিন্তু এই উপন্যাসেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে বিংশ শতকের পটভূমিকায় স্থাপন করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক মুখ্যত এর পটভূমি। গোরা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম মহাকায় ও সার্থক উপন্যাস। উনবিংশ শতকের শেষভাগ তার totality নিয়ে এই উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। গোরা চরিত্র কল্পিত হয়েছিল সিস্টার নিবেদিতার আদর্শে, সেজন্যই গোরা আইরিশ, স্বদেশপ্রেমিক, ভারতস্বপ্নে বিভোর। তবে রেণেসাঁসের সঙ্গে আমাদের দেশে যে Revivalism-ও মাথা তুলেছিল, যার প্রভাব থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষী বা রবীন্দ্রনাথের মত মুক্ত-দৃষ্টির মানুষও তখন সরে আসতে পারেননি—'গোরা' চরিত্রের প্রথমাংশে সেই Revivalism-এর জয়গান। কিন্তু শেষাংশে সকল জাতীয়ত্ব ও সম্প্রদায়গত ধর্মসংস্কার থেকে তার মুক্তি ঘটেছে। এ-মুক্তি প্রকৃত-পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই মুক্তি। গোরা-য় রবীন্দ্রনাথ শুধু artist নন, তিনি thinker-ও। এখানে তাঁর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে অনেকদূর এগিয়ে দিল। এর পর রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন উপন্যাস লেখেন নি। লিখলেন প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত সবুজপত্রে ১৯১৪-এ, চারটি গল্প হিসাবে, পরে নাম দিলেন 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)।

বিংশ শতকের প্রথম দশক 'স্বদেশী' আন্দোলনের যুগ। এ যুগে স্বভাবতই গান ও নাটকের প্রাধান্য ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের দেশাত্মবোধক নাটক তখন জনচিত্তে সাড়া জাগাচ্ছে আর উপন্যাসে দেখি সামাজিক, বিদ্রূপাত্মক, উপদেশক অথবা রোমাঞ্চক-এর যুগ চলেছে। ত্রৈলোক্যনাথের 'ফোক্লা দিগম্বর', 'মুক্তামালা', 'ময়না কোথায়' কিম্বা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' অথবা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী'র নাম এই

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এলেন 'বড়দিদি' (১৯১২) নিয়ে। তারপর দ্রুতগতিতে এল 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭)। শরৎচন্দ্র সাহিত্যে গুরুবাদ মেনেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধনা তাঁর উপন্যাসে নেই। তিনি পরিচিত সমাজ ও মানুষের কাহিনী নিপুণ কথকের মত বলেছেন সহজ ভাষায়। কিন্তু তাঁর রচনাকে 'স্বর্ণলতা' বা 'সমাজ', 'সংসার' অথবা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'-এর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানো চলেনা। শরৎচন্দ্র বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টি নিয়ে এসেছিলেন সত্য। তিনি নারীর মূল্য নতুনভাবে বিচার করলেন :

> 'সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারীজীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।'

কিন্তু তবুও বলতে হবে তিনি কিরণময়ীকে পাগল, রমাকে কাশীবাসিনী ও বিরাজকে কুষ্ঠরোগিনী করেছেন এবং ষোড়শী ও অন্নদাদিদির মধ্যে সংস্কারাবদ্ধ সতীত্বকে অতিমাত্রায় idealize করেছেন। শরৎচন্দ্র আমাদের উপন্যাসের পরিধিকে প্রসারিত করেছেন কিন্তু তাঁর 'experience' wide হলেও রবীন্দ্রনাথের মত deep ছিল না। এবং বহুক্ষেত্রে তিনি তার range বা অভিজ্ঞতার গণ্ডি থেকে সরে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করেছেন। তিনি ভাবপ্রবণ social novel লিখবার প্রেরণা বোধ করেছিলেন, কিন্তু কোনদিনই সুউচ্চ স্তরে উঠতে পারেননি। শিল্পী হিসাবে তার আরেকটি ত্রুটি আগে 'চরিত্র' (character) ঠিক করে নিয়ে পরে তদনুযায়ী আখ্যান সাজানো।'

তখন সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রপন্থী ও রবীন্দ্রবিরোধীর দ্বন্দ্ব 'সবুজ-পত্র' ও 'নারায়ণ পত্রিকা দুটিকে আশ্রয় করে ঘটছিল। 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথ, খাঁটি "রাবীন্দ্রিক উপন্যাস" রচনা করলেন। 'চতুরঙ্গ' (১৯১৫) প্রথম পৃথক পৃথক চারটি গল্প হিসাবে প্রকাশিত হলেও চারটি রেখার সমবায়ে অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের মত নরনারী জীবনের রূপক্ষেত্র

রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পজিটিভিজম্, নব্যভক্তিপন্থী আন্দোলন ও ঔপনিষদিক সাধনার তিনটি স্তরই এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে। বর্ণনার ঘটার পরিবর্তে আলোকিত সঙ্কেত, বুদ্ধিধর্মিতা ও কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনার প্রাধান্য এখানে দেখা দিল। এর পিছনে সমকালীন ফরাসী ও ইংরেজি উপন্যাসের interior monologue রীতির প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ এবার বিধবা বিবাহের সংস্কার মুক্ত হলেন, দামিনার বিবাহ দিলেন। পরের উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। 'ঘরে-বাইরে' নিখিল-সন্দীপ-বিমলার আত্মকথনের টেকনিকে লেখা। এখানে নিখিলেশ-সন্দীপ চরিত্রে তাঁর ও বিপিনচন্দ্র পালের ছায়া আছে। তবে সন্দীপ চরিত্র চিত্রণে তিনি শক্তির পরিচয় দিলেও তাকে খর্ব করবার জন্য অন্যায়ভাবে মসীলিপ্ত করেছেন। এই সন্দীপ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ আনলেন problem of evil।

'ঘরে-বাইরে'র পর অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লেখেন নি। এই সময় শরৎচন্দ্র লেখেন 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), দেনা-পাওনা (১৯২৩)। এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা 'গৃহদাহ'। বোধ করি তলস্তয়ের 'অ্যানা কারেনিনা' শরৎচন্দ্র পড়েছিলেন। কিন্তু দুটির মধ্যে তুলনা করা অসঙ্গত। কেননা দুইয়ের সমস্যা ঠিক এক নয়। শরৎচন্দ্র এ পর্যন্ত প্রধানত নারীর মাতৃরূপ ও ভগিনীরূপই এঁকেছেন। কিন্তু চরিত্রহীনের 'কিরণময়ী' ও গৃহদাহের 'অচলা' শুধু 'নারী'রূপেই স্বপ্রতিষ্ঠ।

ইতিমধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে রূপান্তর ঘটেছে। একদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ, জালিওয়ালানবাগ, অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন, গান্ধীজির নেতৃত্ব। অন্যদিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত স্বাধীনতাকামী যুবকদের ভিন্ন পথ গ্রহণ। ১৯১৭-২১শের রুষ বিপ্লব ও বলশেভিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুব-সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। কিন্তু কথা সাহিত্যে এ যুগের

মানসিকতার সুদৃঢ় ছাপ বিশেষ পড়ল না। এই সময়ে দুটি প্রবণতা তরুণ মনকে পরিচালিত করেছিল—একটি যৌনবিদ্রোহ, অপরটি সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি আকর্ষণ।

আলোচ্য পর্বে তিনজন কবি মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে পাঠকমনকে যুগপৎ চকিত ও মুগ্ধ করেছিলেন। মোহিতলালের দেহাত্মবাদ, যতীন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত মানবপ্রেমী দুঃখবাদ ও নজরুলের উদার সাম্যবাদ সেদিনকার বাংলা কাব্যক্ষেত্রে রথচক্রচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এই 'বিদ্রোহী'-যুগের সঙ্গে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নাম সংযুক্ত। ১৯২৩-এ 'কল্লোল' পত্রিকা বার হয়। কল্লোলের সঙ্গে পূর্বোক্ত তিনজন কবির সম্পর্ক ছিল। কল্লোলে ফ্রয়েড প্রচারিত মনোবিকলনতত্ত্ব ও যৌনতত্ত্ব সাগ্রহে গৃহীত হয়। এর কিছু পূর্বে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনায় যৌনবিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়। কল্লোলের সুর মূলত রোমান্তিক, নঙর্থক বিদ্রোহের সুর। তাঁরা কবিতায় ও ছোটগল্পে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু উপন্যাসে দিতে পারেননি। যে-গভীর সমাজচৈতন্য থাকলে তাঁরা বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে দেশের মানুষের হৃদয়রহস্যে ডুব দিতে পারতেন, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে অবহিত হতেন—সেই সমাজ-চৈতন্য তাদের ছিল না। তাই তাঁদের দৃষ্টি সমাজনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অহং-কেন্দ্রিক, রোমান্তিক স্বপ্নাতুর। তাঁরা রুষ উপন্যাসের দিকে ঝোঁকেননি, ঝুঁকেছিলেন 'ন্যাচারালিজম'-এর দিকে হ্যামসুন, জোলা ('জারমিনাল' ব্যতীত), লরেন্স-এর দিকে। একটা 'বোহেমিয়ানী' রোমান্তিক বিদ্রোহ তাদের উপন্যাসে আছে কিন্তু মৃত্তিকার দৃঢ়সম্পর্ক তার সঙ্গে নেই। ১৯২১-এর গান্ধী আন্দোলনের ব্যর্থতা, অমৃতসরে ও কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, তীব্র বেকারসমস্যা, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের একাংশে গভীর নৈরাশ্য, হতাশা এনে দিয়েছিল। সে যুগের

ছোটগল্পে তার সার্থক শিল্পরূপ ঘটেছে। ভারসাম্যচ্যুত মধ্যবিত্ত-জীবনের সেই বিপর্যয় যুগ উপন্যাসে রূপায়িত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এ লিখলেন 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'। যোগাযোগ'-এর পিছনে গলসওয়ার্দির 'দি ফরসাইট সাগা'-র প্রথম খণ্ড 'Man of Property'-র প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাস ও মধুসূদনকে ভাঙন-ধরা ভূস্বামী অথচ উন্নতরুচি শ্রেণী (landed aristocracy) এবং মধুসূদনকে হঠাৎ-উঠতি বণিক্‌ধনী অথচ নিম্নরুচি শ্রেণীর (mercantile capital) প্রতীকরূপে ধরেছেন। কিন্তু তিনি 'ঘরে-বাইরে'-র মত এখানেও শিল্পীর কাম্য 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। চেহারা থেকে শুরু করে কোথাও তিনি মধুসূদনকে একটুও উজ্জ্বলবর্ণে আঁকেননি। ফলে চরিত্রগত ও ঘটনাগত সম্ভাব্য জটিলতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ কুমুর মধ্যে নারীত্বের স্বাধীন মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েও শেষপর্যন্ত শকুন্তলার আদর্শে তাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে যুগপ্রবণতার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর 'চার-অধ্যায়' বা 'শেষের কবিতা' কোনটিই ভালো উপন্যাস হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটায় বাংলাসাহিত্যে মহিলা-ঔপন্যাসিকদের পদক্ষেপ লক্ষিত হয়। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, গিরিবালা দেবী প্রমুখ শক্তিময়ী লেখিকারা বিংশ শকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে দেখা দেন। তাঁদের মধ্যে ব্রণটি ভগ্নিদ্বয়ের মত সীতা দেবী ও শান্তা দেবী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। কাজেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনার সঙ্গে স্বভাবতই অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী বা শৈলবালা ঘোষজায়ার সৃষ্টিতে পার্থক্য থাকবে। অনুরূপা দেবীর 'মা', 'গরীবের মেয়ে', 'পথহারা'; নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি', 'শ্যামলী'; শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেখ আন্দু', 'বিপত্তি'; সীতা দেবীর 'বন্যা'; শান্তা দেবীর 'জীবনদোলা' বাংলা-উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই পর্বের আরেকটি ধারা মননধর্মী উপন্যাস রচনা। বাংলা-সাহিত্যে 'গোরা' এই ধারার উল্লেখযোগ্য পথিকৃৎ। ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রতীক প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-কে কেন্দ্র করে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, সাহিত্য ও দর্শনতত্ত্ব সর্ববিষয়ে আলোচনায় মেতেছেন। উপন্যাসে সবুজপত্রীদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমারের মনের পরশ (১৯২৬), রঙের পরশ (১৯৩৪), অন্নদাশঙ্করের ছয়খণ্ডে বিধৃত সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২), ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী-উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা' (১৯৩৫-৪৩) এই ধারার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'ও এই পর্যায়ভুক্ত। এই উপন্যাস-গুলিতে সমকালীন ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রভাব লক্ষণীয়। নরনারীজীবনের আখ্যান রচনার চেয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা দার্শনিক যে-সব তত্ত্ব ও মতবাদ সে-যুগের বুদ্ধিজীবী মনকে আলোড়িত করছিল সেগুলিকে উপন্যাসের আধারে পরিবেশন করাকে এই গোষ্ঠীর ঔপন্যাসিকেরা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। বুদ্ধিজীবী মন নিছক গল্পরসে বা চরিত্রায়নে তৃপ্ত হয় না। 'চতুরঙ্গ'-'ঘরে-বাইরে' থেকেই দেখা যায় বাংলা উপন্যাস ইউরোপীয় উপন্যাসের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পারছে।

একদিকে এই মননশীলতার প্রকাশ যেমন ঘটেছে অপরদিকে বাংলার গ্রামীন রূপ, তার সহজ রূপ, সাধারণ মানুষ, নতুন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে কুঁড়ির মত চোখ-মেলা শিশুমন ও নিসর্গ জীবনের রহস্যময় অন্তরঙ্গতা আর তার সঙ্গে মন্দস্রোতা ইছামতী নদীটির মত গ্রামীন জীবনের হাসিকান্নার স্রোত আশ্চর্য অকৃত্রিমতায় ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্করের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে ময়ূরাক্ষী, লাল, রুক্ষ, কর্কশ মাটির রাঢ় অঞ্চল।

ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীন জমিদার, জোতদার, আধিয়ার আর আউরি, বাউরি, সাঁওতাল শ্রমজীবীশ্রেণী। যে-বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ঔপন্যাসিকের সম্পদ, তারাশঙ্কর তার অধিকারী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে তিনি দুখানি অপূর্ব Saga ধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। সরোজকুমার রায়চৌধুরী মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বাউল-বোষ্টম জীবনের বরণীয় কথাকার। তাঁর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতা' ও 'সোমলতা' মিলে ত্রিবেণীসঙ্গম। তাঁর উপন্যাসে নাটকীয়তা নেই, গল্পকথনে আড়ষ্টতা নেই, নদীর স্রোতের মত সে বহে গেছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিয়ে গেলেন পদ্মার চরে, তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রয়োগিত হল ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বে। তার 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আমাদের সাহিত্যে 'ক্লাসিক' সৃষ্টি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> "ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি, কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বাস্তবতার অভাব মিটিয়েছি।"

ঔপন্যাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকার ও প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> "বিজ্ঞানচর্চা না করেও এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও ঔপন্যাসিক খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

অন্যদিকে গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসে প্রুস্ত ও ভার্জিনিয়া উলফের রীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের বক্তব্য ও বাহনে অনেক রূপান্তর ঘটছে। নতুন বক্তব্যের মধ্যে এসেছে রাজনৈতিক ঘটনা, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টি, বামপন্থী আদর্শ, ঐতিহাসিক বোধ, গণজীবন, 'একজিস্টেন্‌সিয়াল দর্শন' প্রভৃতি। ১৯৩০-এর পর থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত তরুণ মনে সহিংস গোষ্ঠীবিদ্রোহ ও

অহিংস গান্ধীপন্থী আন্দোলন উভয়ের প্রতি বিশ্বাস হ্রাস পায়। তার পরিবর্তে মার্কসীয় মতবাদ সেই শূন্যতা পূরণ করে। গোপাল হালদার, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতির রচনায় তার পরিচয় আছে। বনফুলের 'স্থাবর' উপন্যাস নৃতাত্ত্বিক-ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত। রাজনৈতিক ঘটনার দিক থেকে ১৯৩৯-৪৫-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগান্তরকারী ঘটনা। এই যুদ্ধের সঙ্গে এসেছিল অগাস্টবিদ্রোহ (১৯৪২)। এই অগাস্ট-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত শিল্পসার্থক উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'। ১৯৪৩-এর মহাদুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক পট রূপায়িত হয়েছিল তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর'-এ। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তি, উদ্‌বাস্তুসমস্যা সব মিলে মধ্যবিত্ত সমাজ বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস নানা দিকে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যাত্রা করেছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগে, গজেন্দ্রকুমার মিত্র সিপাহীবিদ্রোহে, প্রমথনাথ বিশী কেরীসাহেবের কালে, অমিয়ভূষণ মজুমদার নীল-ভুঁইয়ার জগতে, প্রাণতোষ ঘটক ও বিমল মিত্র ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পোর্তুগীজের পদসঞ্চারে। মধ্য-বিত্তের পরিচিত জগৎ ও জীবনের সীমানা ছাড়ানো দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি আত্মীয়তার ভাব তারাশঙ্কর, মাণিকের রচনায় আছে। তাকে আরও দূর দূর দেশে নিয়ে গেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ (চর কাশেম), সমরেশ বসু (গঙ্গা), মনোজ বসু (জল-জঙ্গল), প্রফুল্ল রায় (পূর্ব-পার্বতী), চাণক্য সেন (রাজপথ-জনপথ) গুণময় মান্না (জুনাগড় স্টীল) এবং আরও অনেকে। মুসলমান জীবন নিয়ে লেখা 'আনোয়ারা' ও 'আবদুল্লাহ' রচনার পর পাওয়া গেল গোলাম কুদ্দুসের 'বাঁদী'। উদ্‌বাস্তু জীবন নিয়ে লেখা 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প', সৈনিক জীবন নিয়ে রচিত 'রংরুট', কয়েদী জীবন নিয়ে লেখা 'লৌহকবাট' প্রভৃতি উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি' চেতন-

অবচেতনের টানা-পোড়েনে গাঁথা মনোবিকলনধর্মী উপন্যাস। তাঁর রচনায় 'একজিস্টেনসিয়াল' দর্শনের ছাপ আছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস মধ্যবিত্ত জীবনের মনোজগতের সমস্যা-সংঘাত সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলা উপন্যাসে গভীর চিন্তা, নিবিড় অনুপ্রবেশ বা বিশ্বস্ত জীবনবোধের পরিচয় বেশি পাওয়া যায়না। তার কারণ যুগের অর্থনৈতিক সংকট এবং মধ্যবিত্ত সমাজের ভারসাম্যচ্যুতি। চলচ্চিত্র ও সাময়িক পত্রিকা তথা সিনেমা পত্রিকার প্রাধান্য তারই ফল। যুদ্ধের পর থেকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে তেমন পাঠকস্ফীতি হয়েছে—যে-পাঠকের প্রধান চাহিদা cheap সাহিত্য-সৃষ্টি। বাংলা উপন্যাসে সাম্প্রতিক কালে বিষয়-বৈচিত্র্য বেড়েছে, উপন্যাসের অবয়ব নিয়ে পরীক্ষা চলেছে, বিন্যাস-রীতিতে রদবদল ঘটছে। এ সবই আশার কথা। কিন্তু মধ্যবিত্ত-সমাজে দেশের মাটি ও মানুষের জীবনতটিনীতে অবগাহন করে অভিজ্ঞতার মুক্তা সংগ্রহে অবিচল আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না—সেখানেই উপন্যাসের সঙ্কট।

আমেরিকার সাহিত্য : বিংশ শতক

আমেরিকার নাম 'নিউ ওয়ার্লড্'। ইউরোপের বাণিজ্যক্ষুধা ও ধনলিপ্সা সমুদ্রমন্থন করে একদা তাকে লাভ করেছিল। সে দেশে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারী এসেছে, দ্বীপান্তরে পাঠানো কয়েদী থেকে আফ্রিকান, ক্রীতদাস ভাগ্যান্বেষী বণিক সকলেই এসেছে। শেষ পর্যন্ত যখন নতুন উপনিবেশরূপে গড়ে উঠেছে তখন সে হয়েছে ইংরেজের। কিন্তু এই পর্বে সেখানে দেখা দিয়েছে ফ্রাঙ্কলিন্, টমাস্ পেইন, জেফারসন্, ডিকিনসন্ প্রভৃতি গণ-তান্ত্রিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ মনীষীদের গদ্যরচনা। গদ্যরচনার সঙ্গে রাজ-নীতির অচ্ছেদ্য যোগ। আঠারোর শতকের আমেরিকার সাহিত্য ঐতিহাসিক কারণে রাজনীতিমুখ্য। ঐ শতকের ইংরেজি গদ্যসাহিত্য বক্তব্যে, দৃষ্টিভঙ্গিতে ও প্রকাশরীতিতে ঐশ্বর্যবান। সেই ধারায়

আমেরিকার গদ্যসাহিত্য বহুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এই শতকের শেষে রিচার্ডসন, স্টার্নের অনুসরণ আমেরিকার কথাসাহিত্যে লক্ষিত হয় কিন্তু তার স্থায়ী মূল্য নেই। অন্যান্য দেশে উপকথা, রোমান্স স্তর পার হয়ে আসে নভেল, কিন্তু আমেরিকার ইতিহাস ফিউদাল থেকে রূপান্তরের পথে আসেনি, তার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ভিন্নরূপে—বিশেষত উত্তরাঞ্চলে, একবারেই নাগরিক সমাজে। সেখানে মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িক সাহিত্য, মধ্যবিত্ত সমাজ ও গদ্যরীতি সবই একসঙ্গে এসেছে। এই আমেরিকা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, ক্রীতদাস প্রথা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছে। তার সাহিত্যে মুক্তির আকাংক্ষা প্রবল।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়েছে থরোউ, এমার্সনের উদারনৈতিক প্রবন্ধাবলী, হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র Uncle Tom's Cabin (১৮৫২), হুইটম্যানের Leaves of Grass (১৮৫৫) কাব্য। এই সময় কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য রচনা ন্যাথানিয়েল হথর্নের The Scarlet Letter (১৮৫০) ও হারমান্ মেল্‌ভিলের Moby Dick (১৮৫১)। হথর্ন-এর উপন্যাসের মূলে একদিকে পিউরিটানী original sin বা sense of guilt অর্থাৎ 'পাপবোধ' অপরদিকে সফোক্লিসের নিয়তিবাদ। হথর্ন রোমান্স লেখেননি, 'নভেল' লিখেছেন, তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত পিউরিটানী মহিমার প্রকাশ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিরুদ্ধে, ব্যক্তির, নারীর বিদ্রোহই এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। সেখানেই হথর্ন 'আধুনিক'। তরুণী হেস্‌টার প্রৌঢ়-ধূসর রজার চিলিংওয়ার্থের বিবাহিতা হলেও সে দেহদান করেছিল পিউরিটান যাজক ডাইমেস্‌ডেলকে—যার ফলে জন্ম নিল শিশু-কন্যা পার্ল। হেস্‌টার কিন্তু ঘোষণা করেছে তারা পাপী নয়, পাপী ঐ ধূসর-প্রৌঢ়, কেননা সে 'violated in cold blood the sanctity of human heart.'

মেল্‌ভিলের 'মবি ডিক্' adventurous নভেলের পর্যায়ভুক্ত।

তবে শ্বেততিমির নিষ্ঠুর দন্তাহত ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধমূলক অভিযান প্রকৃতপক্ষে যেন নির্মম করাল 'প্রকৃতি'-র বিরুদ্ধে মানুষের যুগযুগান্তরের বলিষ্ঠ অভিযানের রূপক। সামুদ্রিক অভিযানের বিভিন্ন পর্বে নাটকীয় শ্বাসরোধকারী বর্ণনা, শক্তিমান ভাষারীতি 'মবি ডিক্'-কে কালজয়ী হতে সাহায্য করেছে।

হথর্ণ ও মেল্‌ভিলের রচনা ভিন্নপন্থী। হথর্ণ অন্তর্জগতের ও মেল্‌ভিল বহির্জগতের চিত্র অঙ্কিত করে আমেরিকার কথাসাহিত্যকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি এনে দিয়েছেন। এই উনবিংশ শতকের শেষে (১৮৭০-৮০) আমেরিকার যন্ত্রসভ্যতা প্রসারিত হয়েছে। ফলে শিল্পোন্নতি, ধনস্ফীতি, নাগরিক ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের আকস্মিক সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, আর তার সঙ্গে এসেছে ধনলালসা, জুয়া আর ফাটকা-বাজি। এই যুগ তাই মার্ক টোয়েনের মতে 'The Gilded Age'—'সোনার পাতে মোড়া যুগ'। ১৮৭৭-এ সি. ডি. ওয়ার্নার-এর সহযোগিতায় তিনি রচনা করলেন 'The Gilded Age'—মুখোশ খুলে দিলেন ধনে-মানে প্রতিষ্ঠিত উচ্চস্তরের অসাধু মানুষের। তাই এ যুগে রোমান্টিকতা নেই, আছে Antiromantic দৃষ্টি। একদা সারভেনটিস মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের কুঠার হেনেছিলেন, এবার হানলেন মার্ক টোয়েন তাঁর A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (১৮৮৯)। এই কাল্পনিক রূপকটিতে দেখা যায় এক ইয়াংকি শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগের রাজার 'নাইট' দের জয় করেছে, সাধারণ মানুষের কল্যাণকর এক 'new deal'-এর ব্যবস্থা করেছে এবং যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, অবিচার, শোষণ থেকে মুক্ত করেছে। মধ্যযুগের ফিউদাল পর্বের রাজ-তন্ত্র, অমাত্যতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই antiromantic অথচ মানবপ্রেমী দৃষ্টির জন্য মার্ক টোয়েনকে অভিনন্দন জানাতে হয়। তিনি যদিচ হাস্যরসশিল্পী নামে পরিচিত কিন্তু তাঁর humour-এর পিছনে রয়েছে "not joy but sorrow. There is no humour in heaven." এখানেই তিনি বড়ো। হেমিংওয়ে একবার,

বলেছিলেন, আমেরিকার সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে মার্ক টোয়েন থেকে শুরু। এ যেন গোগলের 'ওভারকোট' গল্পসম্পর্কে দস্তয়েভসকির মন্তব্য। 'The Gilded Age'-এ যার শুরু 'The Man that Corrupted Hadleyburg' (১৯০৪) এবং 'What is Man?' (১৯০৬)-এ তারই পরিণতি। প্রথম বইখানিতে তিনি দেখিয়েছেন দুরন্ত স্বর্ণতৃষ্ণার কাছে ঘোর নীতিবাগীশরাও কত সহজে ধর্ম, নীতি সবকিছুকে বিসর্জন দিতে পারে। দ্বিতীয়খানিতে তাঁর বিদ্রূপ আরও কঠোর। আমেরিকার কথাসাহিত্য মূলত বিদ্রোহী সাহিত্য—তাকে প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন মার্ক টোয়েন। ফরাসী 'ন্যাচারালিজম্'-এর বিশেষত জোলা-র প্রভাব স্বাভাবিকভাবে ঊনবিংশ শতকের বাস্তবপন্থা উপন্যাসে দেখা দিয়েছিল স্টিফেন ক্রেন, হওয়েলস-এর রচনায়। হওয়েলস-এর The Rise of Silas Lapham (১৮৮৪) ফরাসী ও রুষ বাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রভাবের সাক্ষ্য দিলেও এর মধ্যে আমেরিকার সমকালীন বণিকতন্ত্রী সমাজের সংকট রচনায় তিনি নিপুণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। স্টিফেন ক্রেনের Maggie নিশ্চিতভাবে জোলা-র L'Assommoir-এর অনুসরণ। আর দুজন লেখকের নামও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য, ফ্রাঙ্ক নরিস এবং জ্যাক লণ্ডন। ফ্রাঙ্ক নরিস প্যারিতে দু-বছর থেকে মনে-প্রাণে জোলানুগামী হয়ে দেশে ফিরলেন। তাঁর 'The Octopus' এবং 'The Pit' সেই দৃষ্টির ফল। জ্যাক লণ্ডন তাঁর রচনায় রূপ দিলেন ডারউইনের 'survival of the fittest' মতকে। 'The Iron Heal'এ নীটস্-এর প্রভাব বা রোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা থাকলেও তিনি মানুষের ভাবী কল্যাণে বিশ্বাসী। কিন্তু যার নাম বিংশ শতকের জন্মের সঙ্গে জড়িত সেই 'Hindenburg of the novel' থিওডোর ড্রাইজার (১৮৭১-১৯৪৫) বস্তুবাদী দৃষ্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে। বিংশ শতাব্দীর আমেরিকার উপন্যাস জাত-বিদ্রোহী। ড্রাইজার, আপটন্ সিনক্লেয়ার, সিনক্লেয়ার লুইস, টমাস্ উলফ, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সকলেই sociological realism-এ

বা সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতায় বিশ্বাসী, সকলেরই দৃষ্টি বলা যায় materialistic অর্থাৎ বস্তুবাদী। তাঁরা সকলেই পিউরিটানী গোঁড়ামির, কুবের-সভ্যতার, পরিশেষে যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরোধী। এই বিরোধিতার অস্ত্যর্থকদিক মানবস্বীকৃতি। ড্রাইজারের 'সিস্টার ক্যারী'-র (১৯০০) মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি নারীর পিউরিটানী সংস্কারবর্জন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ও শক্তিবলে অর্জিত নিউ-ইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী জীবনের মধ্যে পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার আনন্দ। ইবসেনের প্রভাব ড্রাইজারের উপর পড়া সম্ভব এবং মনে হয় গিসিং-এর প্রভাবও পড়েছে। ডারউইনের 'survival of the fittest' তত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগও এখানে লক্ষণীয়। তার The Financier (১৯১২) এবং The Titan (১৯১৪) উপন্যাস দুটিতে ধনতন্ত্রী আমেরিকার বক্ষদের জীবনের রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেখানে 'ন্যাচারালিজম' ধারারই সাক্ষ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ড্রাইজার লেখেন যৌনসমস্যামূলক 'The Genius' (১৯১৫)। এক তরুণ চিত্রশিল্পীর জীবনের আখ্যানে তিনি নির্বিকারভাবে যৌনসমস্যা উপস্থাপিত করলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা মনে হয় যুদ্ধোত্তর যুগের 'An American Tragedy' (১৯২৫)—তিনি এখানে এই উপন্যাসের নায়ক ক্লাইড গ্রিফিথস্-এর জীবনের ট্রাজেডিকে কোনো একটি ব্যক্তির ট্রাজেডিরূপে দেখেননি, তিনি অণুবীক্ষণী দৃষ্টি ফেলে জেনেছেন 'An American Tragedy'। এ ট্রাজেডি সমকালীন পেটি বুর্জোয়া জীবনের অনিবার্য ট্রাজেডি। ক্লাইভ গ্রিফিথস্ ধনী কাকার ফ্যাক্টরিতে কাজ করেও মনে মনে ভেবেছে সে ঠিক 'শ্রমিক' নয়, অথচ তার কামনার পাত্রী হয়েছে ফ্যাক্টরির মেয়ে রোবার্তা। সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, অথচ গ্রিফিথস্ তখন ধীরে ধীরে 'সমাজে' উঠেছে, তার পক্ষে রোবার্তাকে বিবাহ করা আর সম্ভব হয় না। কিন্তু তার ধর্মবোধ তাকে বাধা দেয় মেয়েটিকে পরিত্যাগ করতে। এরই অনিবার্য পরিণতিতে আসে মানসিক বিকার। তাই একদিন

নৌকা থেকে হঠাৎ সে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিল মেয়েটিকে—দাঁড়াল এসে নারীহত্যার আসামীরূপে। ১৯২৭-এ ড্রাইজার রাশিয়ায় যান। ফিরে এসে লেখেন Tragic America (১৯৩২)। এ উপন্যাসে এ যুগের 'বাস্তব' সংকট আরও বেশি প্রকাশ পেয়েছে এবং পরবর্তীদের পর প্রভাব বিস্তার করেছে।

যে 'নতুন' দৃষ্টিভঙ্গি আমরা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আমেরিকার উপন্যাসে দেখি সেটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এজরা পাউণ্ড ও টি. এস. এলিয়টের কাব্যে এবং ইউজিন ও' নীল-এর নাটকেও তার প্রকাশ ঘটেছে এবং এবার আমেরিকার সাহিত্য ইউরোপকে জয় করেছে।

আপটন সিনক্লেয়ারের রচনায় অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিপর্যয়ের দিকটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর The Jungle (১৯০৬) আমেরিকার উপন্যাসে প্রথম বামপন্থী উপন্যাস। তাঁর King Coal (১৯১৭) ও 100% (১৯২০) বা Oil (১৯২৭) প্রভৃতি উপন্যাসে যুদ্ধোত্তর যুগের আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মধ্যবিত্ত জীবনের নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। রুষ উপন্যাসের প্রভাব এখানকার সাহিত্যে বিশেষ করে পড়েছে ১৯২১-এ বলশেভিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। এ-যুগের উপন্যাসে যে 'social protest' দেখা দিয়েছে তার পিছনে রয়েছে টমাস পেইন, হুইটম্যান, মার্ক টোয়েনের ঐতিহ্য, যুদ্ধোত্তর কালের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংকট এবং মধ্যবিত্ত তরুণ সাহিত্যিকদের বিশ্বস্ত সমাজনিষ্ঠ চেতনা। তিরিশের যুগের আমেরিকার উপন্যাসকে 'prolotarian novel'-এর যুগ বলা হয় —কেননা যশস্বী ঔপন্যাসিকেরা প্রায় সকলেই কুবের-সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এ-পর্বের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৩০) শিল্পী সিনক্লেয়ার লুইস (১৮৮৫-১৯৫১) তাঁর Main Street (১৯২০), Babbitt (১৯২২), Arrowsmith (১৯২৫), Dodsworth (১৯২৯), উপন্যাসে পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শিল্পীজীবন শুরু

করেন এইচ. জি. ওয়েলস্ ও আপটন্ সিনক্লেয়ারের অনুসরণে। তাঁর 'ব্যাবিট্' উপন্যাস 'মেন স্ট্রীট' ধারার বিদ্রূপাত্মক রচনা। আমেরিকার ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতীক মিস্টার ব্যাবিটের জীবনের সর্বাত্মক সমস্যার নিখুঁত রূপ তিনি এখানে ফুটিয়ে তুললেন। ব্যাবিটের বৈশিষ্ট্য যে 'not only is Babbit a warning, he is also a friend.' একথা মনে রাখতে হবে যে এই উপন্যাসগুলিতে স্বভাবতই সাংবাদিক সুলভ তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ ঘটেছে এবং তথ্য সমাকীর্ণ এই উপন্যাসগুলি মানবস্বীকৃতির মন্ত্র-দীক্ষিত। ডডসওয়ার্থ এ বণিকী ব্যবস্থাজাত সংকট স্যাম ডডসওয়ার্থের দাম্পত্য-জীবনে সম্প্রসারিত হয়েছে। সিনক্লেয়ার লুইস্ যুগপৎ ন্যাচারালিস্ট ও 'রিয়ালিস্ট'—তার সঙ্গে অবশ্য ডিকেনসএর মিলও লক্ষণীয়। টমাস উলফ (১৯০০-৩৮) এ পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের প্রথম পর্বে রোমান্টিক গীতিকবি মনের প্রকাশ, শেষ পর্বে সামাজিক দায়িত্বশালী শিল্পীর। এই দুই দিক যুক্ত করে দেখলে তাঁর শিল্পবৃত্তটি ধরা পড়বে। উল্ফ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, তিনি ইংরেজি রোমান্টিক গীতিকবিতার অনুরাগী হয়েছিলেন, ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষকতাও করেছিলেন। তাঁর মন ভরে ছিল তাঁর বাল্য কৈশোরের ইতিহাস। তার Look Homeward Angel উপন্যাসখানি তাঁর আত্মজীবন স্মৃতিময়। স্মৃতির জগৎ চিরদিনই রোমান্টিক। তাঁর এই উপন্যাসে তার বাবা-মা, ভাই-বোন, নর্থ ক্যারোলিনার অ্যাসভিল শহর, পাহাড়ী দৃশ্য, তার মানুষ সবই স্মৃতিবর্ণ রঞ্জিত। অবশ্য এই স্মৃতিবর্ণন প্রুস্ত-এর Remembrance of Things Past-এর সগোত্র স্মৃতিমন্থন নয়—Search for Lost Time নয়। বের্গসঁ এর দৃষ্টিও উলফের নয়। তবে জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর প্রভাব এখানে আছে। তাঁর নিজের ঔপন্যাসিক জীবনের ধারা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: I began life as a lyrical writer···I began to write with an intense and passionate concern with the designs and

purposes of my own youth; and like many other men, that preoccupation has now changed to an intense and passionate concern with the designs and purposes of life." শেষের সাত বছর (১৯৩১-৩৮) তিনি 'সামাজিক' শিল্পী। তার পিছনে ছিল প্রথম মহা যুদ্ধোত্তর যুগের আমেরিকার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সংকট-পর্ব। ব্রুকলীন-এ বাস করবার সময় তিনি দেখলেন সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃসহ অপমান। তিনি লিখেছেন: "during these years I saw the evidence of an incalculable ruin and suffering··· universal calamity had somehow struck the life of almost everyone I knew." এখানে তিনি আপটন্ সিনক্লেয়ার, সিনক্লেয়ার লুইস, হেমিংওয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাই তিনি কোনদিন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। উল্ফের উপন্যাসের নামগুলির মধ্যে তাঁর কবি-স্বভাবের দীপ্তি প্রকাশিত হয়েছে 'Look Homeward, Angel', 'Of Time and The River', 'From Death to Morning'। গভীর আবেগ, ব্যাকুলতা ও ধ্যান-কল্পনা উল্ফের ভাষায় অপূর্বতা পেয়েছে, কখনো কখনো তাকে যেন বাইবেলের ভাষার মত মনে হয়। কখনও সে ভাষা ব্যঞ্জনাময় মিস্টিক কবিতার মত। হেমিংওয়ে (জ. ১৮৯৮) প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, অ্যামবুলেনস্ ড্রাইভার হিসাবে যুদ্ধরত থাকাকালীন তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তার A Farewell to Arms (১৯২৯) যুদ্ধভিত্তিক রচনা (যুদ্ধ বিরোধীও বটে)। আত্মকথার ঢঙে লেখা এই উপন্যাসে বোমা-বারুদের উর্ধ্বে 'Natural Man' হেনরি ও নায়িকা নার্স ক্যাথরিন বার্কলের প্রেম জয়ী হয়েছে। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ক্যাথরিন মারা গেল—ট্রাজিক সুরে উপন্যাসটি সমাপ্ত। এখানে দেখতে পাই দৃশ্য ও সংলাপ রচনায় হেমিংওয়ে আমেরিকার উপন্যাসে নতুনত্ব আনলেন। পরবর্তী কালে ১৯৩৬-এ স্পেনে গণতন্ত্রী ও ফ্যাসিস্টপন্থীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে International Brigade তৈরী

হয়েছিল। হেমিংওয়ে এই যুদ্ধের পটভূমিকায় রচনা করেন For Whom The Bell Tolls (১৯৪০)। রবার্ট জর্ডন গণতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিল একটি সেতু উড়িয়ে দেবার কাজে। তিনটি দিন গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে থাকবার সময় সে এবং ঐ বাহিনীর সদস্যা মারিয়া পরস্পরের প্রতি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হয়। শেষে জর্ডান সেতু উড়িয়ে দিল, তার দলের সবাই নির্বিঘ্নে সরে গেল, আহত হয়ে প্রতিরোধ চালাতে চালাতে জর্ডন মৃত্যুবরণ করল। ইতিহাসনিষ্ঠ সমালোচকেরা অবশ্য বলেন যে হেমিংওয়ে স্পেনের এই গৃহযুদ্ধকে বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত করতে পারেননি। উপন্যাস ইতিহাস নয়—এক্ষেত্রে এই যুক্তি অচল। সমকালীন যুগের বিপরীতমুখী রাজনৈতিক আদর্শবাদ যেখানে যুদ্ধের কারণ, সেখানে ইতিহাসকে ঠিকভাবে না দেখানো অসততা। হেমিংওয়ে, তাঁদের মতে রোমান্তিক 'বোহেমিয়ানী' আদর্শকে মেনে এসেছেন তাই এখানে জর্ডনচরিত্র সচেতন বিপ্লবী কর্মীরূপে অঙ্কিত হয়নি। হেমিংওয়ের সাম্প্রতিক কালের রচনা The Old Man and the Sea (১৯৫২) ভিন্ন ধরনের উপন্যাস। এর নাতিদীর্ঘ অবয়ব, চরিত্রবিরল আখ্যান, গীতিধর্মী স্বগত ভাষণ, স্বচ্ছ বর্ণনা ও প্রতীকধর্মী আবেদন, A Farewell to Arms ও For Whom the Bell Tolls-এর জগত থেকে পৃথক। সান্টিয়াগো একজন বৃদ্ধ কিউবান মৎস্যশিকারী। সে দিনের পর দিন ঘুরে একটিও মাছ পায়নি, কিন্তু দূরসমুদ্রে Gulf Stream-এ সে একদা বৃহৎ মেলিন মাছ গাঁথল। কিন্তু তাকে সে নিরাপদে নিয়ে আসতে পারল না—পথে হাঙরেরা মাছটিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে নিল। সান্টিয়াগো তাদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করল, জয়ী হলো কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঁচাতে পারল শুধু মাছটির শিরদাঁড়াটা। তীরে এসে ক্লান্তিতে নিশ্চিন্তে সে ঘুমোল। ক্রুর নিয়তির বিরুদ্ধে, মানুষের দৃপ্ত সংগ্রাম, জরার বন্ধন ঠেলে জীবনের প্রতিরোধ—এই উপন্যাসে যেন ব্যঞ্জিত হয়েছে। আপটন সিনক্লেয়ার বা সিনক্লেয়ার লুইসের ধরনে উপন্যাস

তিনি লেখেননি। সেদিক থেকে তিনি তাঁদের মতো 'খাঁটি আমেরিকান' ঔপন্যাসিক নন।

পার্ল বাক (১৮৯২) আমেরিকান হলেও বাস করেছেন চীনে এবং যশস্বিনী হয়েছেন চীনের সাধারণ মানুষের জীবনের অসংখ্য আলেখ্য রচনায়। গ্রামীণ সমাজের নরনারীর 'ছোটসুখ ছোটদুঃখ' সহজ স্বচ্ছন্দ রীতিতে বর্ণিত হয়েছে The Good Earth-এ। আবার পুরোনো সংস্কার থেকে নতুন প্রগতির পথযাত্রা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে East Wind: West Wind উপন্যাসে। চীনের বুকে জাপানী হামলার সার্থক রূপায়ণ Dragon Seed-এ। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে তিনি উপন্যাসের পথে হেঁটেছেন এবং এক স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারিণী হয়েছেন। তিনি গঠনের বা বক্তব্যের দিক থেকে হয়ত "আধুনিক" নন কিন্তু আখ্যান বর্ণনার যাদু তাঁর করায়ত্ত—সেখানে আখ্যান, চরিত্র, ঘটনার রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে গেছে।

এঁদের সকলের থেকে পৃথক হলেন গারট্রুড স্টেইন। তিনি (১৮৭৪-১৯৪৬) হার্ভার্ডএ হেনরি জেমসের ভাই উইলিয়ম জেমসের ('stream of consciousness' সংজ্ঞাদাতা) কাছে দর্শন পড়েছিলেন। পরে তিনি প্যারীতে যান (১৯১২) এবং ফ্রয়েডীয় অবচেতনতত্ত্বের আলোকে তাঁর উপন্যাসের বক্তব্যে ও বাহনে 'অভিনব' রূপ গড়ে তোলেন। বাস্তবতার পরিবর্তে সমকালীন ফরাসী সাহিত্যের প্রতীকধর্মিতা তার ভাষা ও প্রকাশরীতিকে প্রভাবিত করেছে।

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক হিসাবে স্টেইন বেক, ডস্ প্যাসস, রিচার্ড রাইট, ক্যাল্ডওয়েল, ফকনর, ফার্স্ট বিশেষ আলোচনার দাবি রাখেন। স্টেইন বেক (জ. ১৯০২-) তিরিশের যুগের গণ-সাহিত্য স্রষ্টাদের অন্যতম, তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস The Grapes of Wrath দক্ষিণাঞ্চলের দরিদ্র কৃষিজীবীদের নিয়ে লেখা। মধ্যবিত্ত সমাজের আলেখ্য থেকে এখানে উপন্যাস চলে

এসেছে কৃষিজীবীদের জীবন দর্পণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হয় তাঁর The Moon is Down। সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা ও ঘটনা তার উপজীব্য। সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা দেখা দিয়েছে তাঁর Of Mice and Men উপন্যাসে।

ডস্ প্যাসস্ (জ. ১৮৯৬-) প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের বিশিষ্ট লেখক। তিনি বিপ্লবী সাকো-ভ্যান্‌জেটির পক্ষে আমেরিকার সরকারের বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন, গ্রেফ্‌তার হন এবং কারাভোগ করেন। এই কারাবাসকালে বামপন্থী পত্রিকা 'New Masses'-এর সম্পাদক মাইকেল গোল্‌ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মতো তিনিও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট হন। তার Three Soldiers (১৯২১) প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভিত্তি করে রচিত—হেমিংওয়ের A Farewell to Arms বা ফকনরের Soldier's Pay প্রভৃতির মত। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি U. S. A. তিরিশের যুগের আমেরিকার মহাকাব্য। The 42nd Parallel, 1919 এবং The Big Money এই ত্রয়ী মিলে U. S. A. মহোপন্যাস গ্রথিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের টেকনিক (Camera eye') তাঁর উপন্যাসে বহুল ব্যবহৃত। আবার জেমস জয়েসের stream of consciousness রীতিও তিনি গ্রহণ করেছেন।

ফক্‌নরও (জ. ১৮৯৭-) প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে আহত হন—রেমার্ক ও হেমিংওয়ের মত তিনিও প্রথম লিখেছিলেন Soldier's Pay (১৯২৬)। (গারট্রুড স্টেইন এই গোষ্ঠীর নাম এজন্যই দিয়েছিলেন Lost Generation।) ফক্‌নর-এর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা The Sound and the Fury, (১৯২৯)। তিনি এই উপন্যাসের ভাষ্যস্বরূপ লিখেছেন যে এই উপন্যাসখানি 'lost innocence'-এর কাহিনী। দক্ষিণের একটি খানদানী পুরোনো পরিবারের অর্থনৈতিক ও নৈতিক পতনের কাহিনী। ফক্‌নরের এই উপন্যাসে দস্তয়েভস্কির ও জেমস জয়েসের stream

of consciousness-এর প্রভাব পূর্ণ লক্ষণীয়। ড্রাইজার-আপটন সিনক্লেয়ার-সিনক্লেয়ারলুইস-ডস্ প্যাসস্-হেমিংওয়ে প্রমুখের জগত তাঁর নয়। এখানে তাঁর জগত মুখ্যত অসুস্থ মনোবিকারের তথা যৌনবিকারের জগত। যুদ্ধ-পূর্ব যুগের সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয় এই উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ফক্‌নর-এর বহুখ্যাত উপন্যাস Sanctuary (১৯৩১) আধুনিক আমেরিকার অবক্ষয়ী তরুণ-তরুণীর জীবনের এক দুঃসহ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছে। হত্যা, ধর্ষণ, মৈথুন, গণিকালয় কিছুই এখানে অনুপস্থিত নেই। সেকালের 'গথিক' উপন্যাস বা একালের গ্রাহাম গ্রীণের উপন্যাসের 'horror'-এর সঙ্গেই এর মিল। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, sensationalism এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। ফক্‌নরের শেষ দিকের উপন্যাসে তিনি পূর্বের sensationalism, অতি নাটকীয়তা, ভাষাগত জটিলতা পরিত্যাগ করেছেন—সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজেছেন। ১৯৪৯-এ নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করবার সময় তিনি বলেছিলেন :

"I decline to accept the end of man…I believe that man will not merely endure : he will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance. The poet's, the writer's, duty is to write about these things." এই মহৎ মানব-স্বীকৃতি তাঁর পূর্বের উপন্যাসে দেখা যায় না।

আপটন সিনক্লেয়ার বা সিনক্লেয়ার লুইসের উপন্যাসে যে 'রিয়ালিজম' দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে ফক্‌নরের মিল নেই। তাঁর বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা, রূপক, অবয়ব সবই স্বতন্ত্র। তাঁর মুখ্য বিষয়বস্তু শ্বেত-কৃষ্ণ অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চল, 'Yoknapatawpha', তারই saga তিনি রচনা করেছেন Absalom, Absalom এবং

The Hamlet-এর অন্তর্গত Flem, Eula, The Long Summer ও The Peasants জোড়-খাওয়া কাহিনী চতুষ্টয়ে। 'বস্তুবাদী' দৃষ্টি তাঁর নয়, চরিত্রগুলিও বহুলাংশে রূপকাশ্রিত। তাঁর ভাষায় লোক-উৎস থেকে শুরু করে জেমস জয়েসের প্রভাব, সবই আছে। মার্ক টোয়েনের ঐতিহ্য তাঁর নয়—বরং অ্যালান পো, হথর্ণের ঐতিহ্যই তিনি স্বীকার করেছেন।

এরস্‌কিন ক্যাল্‌ডওয়েলের God's Little Acre এবং Tobacco Road (১৯৩২) দরিদ্র জীবনের সংগ্রামের দিকে ঝুঁকেছে—সেখানে তিনি naturalistic দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর Trouble in July (১৯৪০) আমেরিকার বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত আঘাত। কিন্তু শ্বেত-কৃষ্ণ বর্ণবৈষম্যের ক্ষেত্রে অমর সৃষ্টি নিগ্রো লেখক রিচার্ড রাইটের উপন্যাস Native Son। নিজেদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবিতে উচ্চশির বিদ্রোহী নিগ্রোর জবানবন্দী এই উপন্যাসে উচ্চারিত। ল্যাংটন হিউজের গল্পেও তার বলিষ্ঠ রূপ ধরা পড়েছে। যে-বিদ্রোহী নিগ্রো সাহিত্য বিংশ শতকের শুরু থেকে মাথা তুলছিল তার পরিপূর্ণতা রাইটের Native Son-এ। রাইট দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে দরিদ্র শ্বেতকায় মানুষের সঙ্গে দরিদ্র কৃষ্ণকায়ের বিরোধ নেই। নিগ্রো Bigger Thomas-এর জীবনের ট্রাজেডি আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। আর মনে পড়ে মার্ক টোয়েনকে, যিনি বহু পূর্বে রচনা করেছিলেন Huckleberry Finn।

হাওয়ার্ড ফাস্ট শক্তিশালী লেখক। তিনি নিগ্রোদের পর কু-ক্লুক্স-ক্লানদের বর্বর অত্যাচারকে দেখিয়েছেন তাঁর Freedom Road উপন্যাসে। তাঁর My Glorious Brothers এবং Spartacus উপন্যাস দুখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনীর নবভাষ্য। দুহাজার বছর পূর্বের মক্কাবি বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত হয়েছে My Glorious Brothers। আর রোম সাম্রাজ্যের পতনকালে যে ক্রীতদাসবিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে, তারই

জ্বলন্ত আলেখ্য রচিত হয়েছে Spartacus-এ। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তার কারণস্বরূপ বলেছেন: "I wrote it to give hope and courage to those who would read it, and in the process of writing it, I gained hope and courage myself."—ফাস্ট এই উপন্যাসে সেকালের রোম সাম্রাজ্যের আসন্ন পতন—ক্রীতদাস বিদ্রোহের রক্তাক্ত সংগ্রাম বর্ণনায় যে অবিস্মরণীয় শক্তির ও ঐতিহাসিক পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বেশি মেলেনা।

আমেরিকার উপন্যাস সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের এবং তার বাস্তবপন্থী, তথ্যনিষ্ঠ documentary বা ন্যাচারালিস্ট রূপায়ণই আমেরিকার উপন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। জীবনের গভীরে সত্য-সন্ধান বা মনোজগতের রহস্য-উদঘাটন কিংবা হৃদয়ের কোনও ব্যাকুল ক্রন্দন আমেরিকার উপন্যাসে বিশেষ শোনা যায় না। সেখানে কোনও অ্যানা কারেনিনা, জুড দি অবস্কিওর বা ওল্ড গরিঅ রচিত হয়নি। রচিত হওয়া কোনদিনই সম্ভব ছিল না। তার ইতিহাস তার জন্য দায়ী।

দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিককালের আমেরিকার উপন্যাস নভোকভের Lolita নিয়ে অবক্ষয়ের পথে যাত্রা করেছে—সেখানে মহৎ চিন্তার প্রকাশ লক্ষিত হচ্ছে না।

স্ক্যানডিনেভিয়ার উপন্যাস

ইউরোপ-আমেরিকার কথা-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে স্ক্যানডিনেভিয়ার কথা-সাহিত্য বিশেষ সমালোচনার দাবি রাখে। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও আইস্ল্যাণ্ড নিয়ে স্ক্যানডিনেভিয়া। এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নরওয়ের স্থান সর্বাগ্রে। বিয়র্ণসন, বোয়ার ও হ্যামসুন এই তিনজনই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। ঐতিহাসিক তথা ভৌগোলিক কারণে স্ক্যানডিনেভিয়ার স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে। তার অনুন্নত অর্থনীতি, অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, তার সাক্ষ্য। তাই তার কথা-সাহিত্য যদিও উনবিংশ শতকের শেষভাগে আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু তার সঙ্গে ইংরেজি, ফরাসী বা রুষ উপন্যাসের ঠিক মিল নেই। প্রতি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জন-মানসের প্রবণতা সে-দেশের কথাসাহিত্যকে প্রভাবিত করে। সেজন্য নরওয়ের সাহিত্য বা গোটা স্ক্যানডিনেভীয় অঞ্চলের Saga সাহিত্যের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, রুষিয়ায় বা আমেরিকায় যেখানে যে উপন্যাস গড়ে উঠেছে তার পিছনে রয়েছে মুখ্যত সেই দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি তথা নিজস্ব মানসিক প্রবণতা। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যখন বিয়র্ণসন (১৮৩২-১৯১০) আবির্ভূত হলেন তখন আর একজন মহৎ নাট্যকার ইবসেনও (১৮২৮-১৯০৬) দেখা দিয়েছেন। ইবসেন নাটকে যে তীব্র সমাজ-জিজ্ঞাসা ধ্বনিত করলেন তাঁর A Doll's House, Ghosts, An Enemy of the People নাটকগুলিতে, সমগ্র পৃথিবী তাতে কেঁপে উঠেছে। সেক্সপীয়রের যুগের বক্তব্য থেকে সে-বক্তব্য কত পৃথক—'Who is right ? Society or I ?' ইবসেন ও বিয়র্ণসন শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বকে স্বীকার করেছেন। বিয়র্ণসন একাধারে কবি নাট্যকার গল্প ও উপন্যাস লেখক। তিনি তাঁর রক্তে বহন করেছিলেন গভীর দেশপ্রীতি। দেশের স্বাধীনতা, সর্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়-ঐক্য প্রতিষ্ঠা তার স্বপ্ন ছিল। সেই গভীর দেশপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংবাদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও সৃষ্টিক্ষমতা এই ত্রিধারায় তাঁর কথাসাহিত্য সঞ্জীবিত। নরওয়ের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে, উজ্জ্বল করে তুলতে হবে এই প্রেরণা তিনি বোধ করেছিলেন, আত্মিকযোগ অনুভব করেছিলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। ১৮৬০-এ রোম ভ্রমণ এবং ১৮৮০-৮১-এ আমেরিকা দর্শন তাঁর দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করেছে। ১৯০৩-এ তিনি লাভ করেন নোবেল পুরস্কার। বিয়র্ণসনের গল্প-উপন্যাসে রয়েছে নরওয়ের সেই native realism—সেই লোকবৃত্তের ধারা,

যার পরিচয় পাই The Fisher Maiden (১৮৬৮), The Heritage of the Kurts (১৮৮৪), In God's way (১৮৮৯) বইগুলিতে। তিনি তাঁর যুগ ও সমাজের জাতীয় সমস্যাকে উপন্যাসে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। ন্যুট হ্যামসুন (১৮৫৯-১৯৫২)-এর 'হাঙ্গার' (১৮৯৯) এই ধারার রচনা নয়। এ-উপন্যাস সমাজমুখী নয়, অহং-মুখী। হ্যামসুন প্রথম জীবনে বিবিধ বৃত্তি বহন করেন। সেই ভবঘুরে জীবনের ছাপ 'হাঙ্গার' ও 'ভ্যাগাবণ্ড' উপন্যাসে স্পষ্ট মুদ্রিত। শিল্পী জীবনের দারিদ্র্য, নেতিমূলক রোমান্টিক যৌনবিদ্রোহ ও বোহেমিয়ানী খামখেয়ালে—তিনি ইবসেন-বিয়র্ণসনের সমাজমুখী ধারা (১৮৮০-৯০) থেকে সরে এসেছেন, বরং সেখানে তিনি নীট্‌শে পন্থী। কিন্তু তাঁর Growth of the Soil (১৯১৭) ফিরে এসেছে Saga ধর্মিতায়। 'Saga' নরওয়েজীয় তথা আইসল্যাণ্ডীয় জীবনের দীর্ঘ গদ্যকাহিনীর রূপ। মধ্যযুগীয় এই লোক-কথার ধারা Growth of the Soil-এ নবরূপ লাভ করেছে। আইজাক-ইঙ্গরের প্রথম সংসারপত্তন যেন সৃষ্টির প্রথম নরনারী আদম-ইভের জগত—আশ্চর্য সহজতায় বর্ণিত হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সেই আদিমকল্প গ্রামীণ জীবনে লেগেছে নগর-জীবনের যন্ত্র-সভ্যতার স্পর্শ—জীবন-বৃত্ত কত জটিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষে হ্যামসুন দেখিয়েছেন মাটির মানুষের শাশ্বত জয়। ইংরেজি, ফরাসী বা রুষ কিংবা আমেরিকার উপন্যাসে ঠিক এই ধরণের গ্রামীণতা, এই আদিমতার (primitiveness) দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। এ জোলা-র naturalism নয়, যদিও তার সঙ্গে মিল কিছু আছে। বাইবেলের কথিকা বর্ণনার মত বলে চলেছেন হ্যামসুন, ভালো-মন্দে মেশানো আইজাক, ইঙ্গার, অ্যাক্‌সেল-বারব্রোর জীবনের বিস্ময়কর সাগা। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ নিশ্চয়ই এক নতুন আবির্ভাব—rural naturalism।

বোয়ারও (১৮৭২-) জীবনে নানা বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, ধীবর বৃত্তি থেকে বিজ্ঞাপনের কপিলেখক অবধি। ইবসেন ও স্ট্রীণ্ডবার্গের যুগে তিনি বড়ো হয়েছেন, ইউরোপে ঘুরেছেন

তারপর ১৯০৭-এ ফিরেছেন নরওয়েতে। লেখক-জীবনের প্রথমে তিনি ইবসেনের An Enemy of the People-এর মতোই মানুষের প্রীতির পর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর The Great Hunger-এ (১৯১৬: অনুঃ ১৯১৯) সেই অ-বিশ্বাস দূর হয়েছে, মানুষের নিজশক্তির, শুভশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। পূর্বে বোয়ারের রচনায় দেখেছি 'আদর্শবাদী' মন তার বিরুদ্ধ শক্তির পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করছে, হারছে কিন্তু The Great Hunger-এ মানুষের জয় ঘোষিত হয়েছে। অনাথ পীয়ের বড়ো হতে চেয়েছে, মানুষ হতে চেয়েছে সকল প্রতিবন্ধকতাকে ঠেলে ফেলে। বড়ো সে হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বশে যখন অর্থ, সম্পত্তি, কন্যা সবই চলে গেছে, যারা আর ফিরবে না, তখন পীয়ের বন্ধু ক্লাউস্‌কে চিঠি লিখেছে মানুষের জয় জ্ঞাপন করে। যে-প্রতিবেশীরা তাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছে, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে আদরের মেয়েটিকে হত্যা করেছে সে সেই শত্রুর জমিতে বীজ বুনেছে, ঠিক খ্রীষ্টীয় দয়াধর্মবশে নয়—যে-হিংস্র শক্তি মানুষকে ধ্বংস করতে চায় তার বিরুদ্ধে মানুষের জয় ঘোষণার জন্য। সে লিখেছে: "Blind fate can strip and plunder us of all and yet something will remain in us at the last, that nothing in heaven and earth can vanquish···I went out and sowed corn in my enemy's field, that God might exist···Honour to thee, O spirit of man."

হ্যামসুনের 'হাঙ্গার'-এর সঙ্গে 'দি গ্রেট হাঙ্গার'-এর বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি, গঠন বা ভাষা কোন দিক থেকে মিল নেই। 'দি গ্রেট হাঙ্গার'-এ প্রকাশিত হয়েছে মহত্তর জীবনের পিপাসা। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রশংসা করেছিলেন বোয়ারের। 'দি গ্রেট হাঙ্গার'-এর পরের রচনায় তিনি প্রীতিধর্মকেই মুখ্য স্থান দিয়েছেন। আইসল্যাণ্ডের কবি-ঔপন্যাসিক ল্যাক্সনেস (জ. ১৯০২) তার Independent People-এ

নতুন Saga রচনা করেছেন—নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৫৫-এ। তাঁর জন্ম কৃষিজীবীবংশে, গ্রামের নামে তাঁর নাম। প্রথম যৌবনে তিনি এক্সপ্রেসানিজম্-এর দিকে ঝুঁকেছিলেন, রোমান ক্যাথলিকধর্মের প্রতিও আস্থা তাঁর ছিল। ফরাসীয় স্যুর-রিয়ালিজমের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। কিন্তু ১৯২৭-৩০-এর দীর্ঘ ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের শেষে তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাস নিয়ে দেশে ফিরলেন। আত্মকেন্দ্রিক শিল্পাদর্শ ছেড়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে গ্রহণ করলেন। তাঁর Salka Valka, Independent People, The Light of The World—গণসাহিত্য সৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাঁর Independent People আইসল্যাণ্ডের চাষী ও পশুচারক জীবনের নিখুঁত বাস্তব রূপ। এর নায়ক বিয়রতুর মুক্তিপাগল। সে বলে 'Independence is the most important thing of all in life. I say for my part that a man lives in vain until he is independent'. কুসংস্কার, পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযানকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন ল্যাকস্‌নেস—প্রবহতী নদীর মত এই উপন্যাসে। হামসুনের Growth of the Soil-কে primitivistic উপন্যাস বলা হয়েছে কিন্তু ল্যাকস্‌নেসের Independent People সে-পর্যায়ের নয়। এখানে প্রথম মহাযুদ্ধ, আইসল্যাণ্ডের জীবনে তার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া, রুষবিপ্লব ও জারের পতন, নৌ-জেটির শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি ঘটনাকে উপন্যাসখানির দ্বিতীয়ার্ধে স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। তাই শেষের দিকে দেখি ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত বিয়রতুর ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে নিজের ছেলেকে গুলিবিদ্ধ হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও রেখে এসেছে। কেননা ধর্মঘটীরা তারই মত অন্য এক মুক্তির সাধনা করছে। অভিজ্ঞতা, ঐতিহাসিক-চেতনা ও সহানুভূতির মিলনে ল্যাকস্‌নেসের শিল্পী-মানস রচিত হয়েছে। তাই এই উপন্যাসে কোথাও কৃত্রিমতা বা প্রচারধর্মিতা নেই।

কথা সাহিত্যে নবদিগন্ত : টমাস মান্

বিংশ শতকের উপন্যাসে একটি নতুন জগতের স্রষ্টা টমাস মান্ (১৮৭৫-১৯৫৫)। তাঁর উপন্যাসকে 'intellectual novel' বা 'problem novel' বললে ঠিক-ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি বড়ো বুর্জোয়া ঘরের সন্তান, মানসিক আভিজাত্য তাঁর সহজাত। কিন্তু তাঁর জীবনদর্শনে এক অদ্ভুত আকর্ষণ দেখা যায় অবক্ষয়, বিবর্ণ জীবন ও রোগ-পাণ্ডুরতার প্রতি। তাঁর খণ্ডোপন্যাস টোনিও ক্রোগার বা ডেথ ইন ভেনিস তার দৃষ্টান্ত। মান্-এর Buddenbrooks (১৯০১) লুবেক শহরের ধনী বুডেনব্রুক পরিবারের ক্রমধ্বংসের আলেখ্য। এর সঙ্গে স্বভাবতই গল্‌স্‌ওয়ার্দির The Forsyte Saga ও প্রুস্তের Remembrance of Things Past-এর কথা মনে হবে। কিন্তু মান্-এর বই এদের বহু পূর্বে প্রকাশিত। চার পুরুষের কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত, তার শুরু ১৮৩৫ থেকে। উপন্যাসের এই ধরনের পরিকল্পনা ফরাসী 'ন্যাচারালিস্ট'দের বিশেষত জোলা-র কাছ থেকে তিনি নিয়ে থাকবেন। তবে চরিত্রসৃষ্টির সূক্ষ্ম উপস্থাপনায় এবং হৃদয়াবেগের প্রকাশে তিনি 'ন্যাচারালিস্ট'দের বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছেন—সেখানে তিনি তলস্তয়ের অনুগামী। মান্ যৌবনের প্রথমেই জর্মান দার্শনিক শোপেনহউয়েরের 'দুঃখবাদী' মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, সে-আকর্ষণ তাঁর সমগ্র শিল্পী-জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বুডেনব্রুকদের এই ধ্বস নামার মধ্যে মান্ দেখতে পেলেন শিল্পীর আশ্চর্য জন্ম লগ্ন। পূর্বে লিখেছি যে রোগপাণ্ডুর, বিবর্ণ জীবনের প্রতি মান্-এর অদ্ভুত আকর্ষণের কথা আর তিনি এরই মধ্যে খুঁজে পান জীবনের স্ফূর্তি ও শিল্পের জন্ম। তাই দেখি হান্‌স ক্যাস্ট্রোপ যখন যক্ষ্মা-ব্যাধিগ্রস্ত তখনই তার কামনার তীব্রতা ও দেহসঙ্গমের আনন্দবোধ জন্মেছে। লুভরকুন সিফিলিসে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গীতসৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের শিল্পক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। মান্-এর কাছে তাই দাঁড়িয়েছে সুস্থ জীবন ও সৃষ্টিধর্মী শিল্প যেন পরস্পরের antinomy, বিরোধী।

তাঁর The Magic Mountain উপন্যাস এ-যুগের অন্যতম মহৎ সৃষ্টি। এ উপন্যাসখানি বুডেনব্রুকস্ ধারার নয়। বুডেনব্রুকস্ ঊনবিংশ শতকের ফরাসী-রুষ উপন্যাসের ধারাকে অনুসরণ করেছে চরিত্র সৃষ্টি ও গঠনের দিক থেকে। কিন্তু 'দি ম্যাজিক মাউনটেন' ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের ধারাবাহী নয়, বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ-পূর্বক্ষণের পশ্চিমী সভ্যতার সর্বাত্মক বৈবর্ণ্যের রূপকধর্মী মহাভাষ্য। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এই উপন্যাসখানি দীর্ঘ বারো বছর (১৯১২-২৪) ধরে মান্ লিখেছিলেন। যক্ষ্মাগ্রস্তদের এক স্যানাটোরিয়মের পটভূমিকায় এই মহোপন্যাস রচিত। (একদা মান্ তাঁর স্ত্রীকে টি. বি, স্যানাটোরিয়ম-এ দেখতে যান—সেখানেই হয়ত এই উপন্যাসের বীজ।) হান্স ক্যাস্ট্রোপ এখানে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন পশ্চিমী সভ্যতার প্রত্যেকটি চিন্তাশাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছে। সেই পরিচয়স্পৃষ্ট মননের আত্মপ্রকাশ এই উপন্যাসে। এ উপন্যাস একদিকে ক্যাসট্রোপের ব্যক্তি-মন ও মননের অভিব্যক্তির ইতিহাস অপর দিকে সমকালীন পশ্চিমী চিন্তাধারার রূপক। প্রচলিত অর্থে এখানে প্লট বা চরিত্র পাওয়া যাবে না। মান্-এর সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর চিন্তাপ্রসূত ধারণা ও সিদ্ধান্তই এখানে সমাহৃত হয়েছে। প্রেম, মানবীয়তা, মিস্টিকবাদ, মনোবিকলনতত্ত্ব—সমকালীন বিজ্ঞান, দর্শন ও মানবতত্ত্বের বিভিন্ন দিকগুলি এখানে 'দার্শনিক' দৃষ্টিতে আলোচিত হয়েছে। এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে চিন্তার বিরাটত্বে আমরা বিস্মিত হই। এ-জাতীয় উপন্যাসকে 'Novel of Thought' বা 'Philosophical Novel' বলাই ভালো।

মান্-এর আর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস 'ডক্টর ফস্টাস' (১৯৪৭)। গ্যেটের ফাউস্টের নতুন ব্যাখ্যা। গ্যেটের ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ নারী শার্লট বফকে নিয়েও মান্ একটি চমৎকার ছোট উপন্যাস লিখেছেন: Lotte in Weimar। তারপর যেগুলি লিখেছেন Confessions

of Felix Krull বা The Black Swan—সবগুলিই অত্যধিক morbid রচনা।

শেষ কথা

একদা ইতালীতে 'নভেলা'র জন্ম হয়েছিল কিন্তু আধুনিক কালে নভেল তাকে বহু শতযোজন পিছনে ফেলে কত বিচিত্র পথে যাত্রা করেছে তার পরিমাপ করা অসম্ভব। সেজন্য নভেল বা উপন্যাসের চিরস্থায়ী বা সর্বজনগৃহীত একটি সংজ্ঞা হয়না। যে-সংজ্ঞায় ফিলডিং-এর 'টম জোনস্' উপন্যাস, সে-অর্থে ভার্জিনিয়া উলফ-এর 'দি ওয়েভস্' উপন্যাস নয়। অথবা স্তাঁদালের 'স্কারলেট অ্যাণ্ড ব্ল্যাক' আর ক্যামু-র 'দি ফল' কি একাসনে বসানো চলে? কিংবা সিনক্লেয়ার লুইসের 'ব্যাবিট' আর হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'-কে কি একসূত্রে বাঁধা যায়? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' কি এক মাপকাঠিতে মাপা যায়? যায় না। দেশভেদে নয় একই দেশের যুগেতিহাসের ভেদে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার রদ বদলে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির ও চিন্তাধারার যে-পরিবর্তন লক্ষিত হয় তার ফলে উপন্যাসের বক্তব্যে ও দেহে অনিবার্য রূপান্তর ঘটে। তাই উপন্যাসের আলোচনায় ঐতিহাসিক পর্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত, এক দেশের উপন্যাস নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ নয়। কেননা একদা ইংরেজি উপন্যাস ফরাসী, রুষ বা স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ার সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

একদা স্তাঁদাল মনস্তত্ত্বমূলক বাস্তবতা (psychological realism) এনেছিলেন উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে (১৮৩০)। আর বিংশ শতকে psychology এখন psycho-analysis-এ পরীক্ষিত। ফ্রয়েড, অ্যাডলার-ইয়ুং প্রভৃতির গবেষণার ফলে ফলিত-মনোবিজ্ঞান অনেক সূক্ষ্মস্তরে পৌঁছে দিয়েছে মানুষের দৃষ্টিকে।

প্রসৃত-জয়েস-উলফ-ডরোথি রিচার্ডসন-গারট্রুড স্টেইন-ফকনর্-মাণিক প্রভৃতির রচনা তারই সাক্ষ্য। এখানে চরিত্রের সবটা দেখা যায় না —সমুদ্রের মগ্নশিলার ঈষৎ বহিরস্তিত্বের মত।

এখানে বলা দরকার উনবিংশ শতক ইউরোপের সাহিত্যে মুখ্যত রিয়ালিজম্-এর যুগ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধনতন্ত্রের ও নাগরিক-বুর্জোয়া সভ্যতার প্রসার, ভাববাদী দৃষ্টির বিরুদ্ধে বুদ্ধির সংগ্রাম, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি প্রচেষ্টা সব মিলে উপন্যাস বাস্তবধর্মী ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাই শুধু 'প্লট' বা 'চরিত্র' নয় পটভূমি-রচনা ও পরিবেশ-বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করল। বালজাক, জোলা, তলস্তয়, ডিকেনস্ বা হার্ডির উপন্যাস তারই সাক্ষ্য। বিংশ শতকের স্ক্যানডিনেভিয়ান বা আমেরিকান উপন্যাসেও এই গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

Illusion ও Reality শব্দ দুটির অর্থ-বৈপরীত্য মনে রেখে আমরা বলব উচ্চাঙ্গের উপন্যাসে ফুটে ওঠা চাই Illusion of Reality—সেখানেই সে বড়ো শিল্প। এই প্রসঙ্গে মপাঁসার একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "The realist if he is an artist will seek to give us not a banal photographic representation of life, but a vision of it that is fuller, more vivid and more compellingly truthful than even reality itself." মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক যে-কোন বাস্তবতার শিল্পী হোন এই শিল্পদৃষ্টি সব বড়ো শিল্পীকেই অর্জন করতে হয়েছে।

উপন্যাসের ইতিবৃত্ত আলোচনা করে দেখা গেল যে, একদা মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শক্তিরূপে নাগরিক সমাজ, বুর্জোয়া-মধ্যবিত্তশ্রেণী, যন্ত্র সভ্যতা, যুক্তিবাদী দর্শন, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সেই নতুন যুগের কথাশিল্প এই উপন্যাস। সেই কথাশিল্প বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত সমাজের সুস্থ জীবন প্রহরে যে-উজ্জ্বলরূপ লাভ করেছিল, ঐ শ্রেণীর অর্থনৈতিক

সামাজিক অবক্ষয়ে তার সৃষ্ট উপন্যাসও বিবর্ণ, বিকারগ্রস্ত হয়েছে। মনে রাখতে হবে ডেফো-র রবিনসন ক্রুশো অডিসিউসের মতো যুদ্ধ থেকে ঘরে ফেরেনি, ঘর থেকে যুদ্ধে গেছে, অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধে। তাই নবযুগের ডেফো 'ইলিয়ড' কাহিনীকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি, হেলেন-উদ্ধারকে rescue of a whore ছাড়া ভাবতে পারেননি। আর এ-যুগে জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস'-এ ব্লুম, ডেডালস, মারিয়ান ব্লুমের মধ্যে অবক্ষয়িত যুগ ও জীবনের ট্রাজিক ওডিসি। একদা ভলতেয়ার-স্তাঁদাল-বালজাক ফরাসী সাহিত্যে যে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা ধ্বনিত করেছিলেন, যে-জীবননিষ্ঠ দিগন্ত প্রসারিত করেছিলেন তার শোচনায় পরিণতি সার্ত্র-এর উপন্যাসে। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। আজ জীবনের বিশ্বস্ত গভীর প্রকাশ কথা-সাহিত্যে যে ঘটছেনা তার জন্য দায়ী বহুলাংশে আমাদের সাম্প্রতিক-কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের বিন্যাসগত বৈষম্য, পৃথিবীব্যাপী 'ঠাণ্ডা লড়াই'। তবু উপন্যাসকে অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হবে এবং সেজন্য সেসিল্ ডে লুইসের মন্তব্যটি স্মরণ করতে হবে—প্রত্যেক সৎ শিল্পীকে: "Every poet must bite off as much life as he can chew."